উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র

নিবন্ধমালা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ডিসেম্বর ২০২২

সম্পাদক
এম. মতিউর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধমালা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড
ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশক
পরিচালক
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: manabvidya@yahoo.com

মুদ্রণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: press@du.ac.bd

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

Price: Tk. 150.00 only

[নিবন্ধমালায় প্রকাশিত মতামত ও তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকের]

Nibandhamala (Collection of Research Aritcles), Vol. XXIII), Published by Director, Centre for Advanced Research in Humanities, University of Dhaka, December 2022, E-mail: manabvidya@yahoo.com

ভূমিকা

উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৮৪ সালের ৩১ মে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বক্তৃতা, বিশেষ বক্তৃতা, বিশেষ সেমিনার, স্মারক বক্তৃতা, ডিন্‌স লেকচার ও গবেষণা প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি নিয়মিত হয়ে আসছে। সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধসমূহের সংকলনরূপে 'নিবন্ধমালা' প্রকাশিত হয়ে আসছে সূচনা থেকেই। কেন্দ্রের ধারাবাহিক নিয়ম অনুসারে কেন্দ্রের এই 'নিবন্ধমালা : ত্রয়োবিংশ খণ্ড : ২০২২' প্রকাশিত হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, কোভিড অতিমারির কারণে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে আমরা বাধ্য হয়েই ঘরবন্দি ছিলাম। তাইজন্য ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রে আমরা কোনো সেমিনারের আয়োজন করতে পারিনি। এ কারণে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে নিবন্ধমালা প্রকাশিত হয়নি।

উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র মূলত একটি মৌলিক ও সৃষ্টিশীল গবেষণাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত, গবেষক, অধ্যাপক ও সুধীজন এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনায় যেমন প্রবন্ধগুলো সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সেমিনারগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত এবং লেখকের গবেষণা কর্মকাণ্ডেও উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে থাকে। এছাড়া কেন্দ্র থেকে নিয়মিত যে সকল 'মানববিদ্যা বক্তৃতা', 'ডিন্‌স লেকচার', 'নূরুন্নাহার স্মারক বক্তৃতা', ও 'বিশেষ বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়, সে সকল অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধগুলোও পরবর্তীতে সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমান নিবন্ধমালায় মোট ১০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু বহুমুখী ও আকর্ষণীয়। প্রবন্ধগুলোর উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ।

সংকলন-গ্রন্থটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের প্রয়োজন মিটাতে সহায়তা করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের নিয়মিত কার্যক্রমে যারা সূচনালগ্ন থেকে সাহায্য-সহযোগিতা ও বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন আমি তাঁদের সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। মূলত তাঁদের প্রেরণা ও উৎসাহে কেন্দ্র এগিয়ে চলছে। কেন্দ্রের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর মেধা-মনন দিয়ে কেন্দ্রের কার্যক্রমকে আরো উন্নত পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন। আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কেন্দ্রের চুক্তিভিত্তিক দায়িত্বে নিয়োজিত আবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল সচিব মো. শাহাবুদ্দিন মিয়া (চুক্তিভিত্তিক দায়িত্বে নিয়োজিত) দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে কেন্দ্রের

কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করছে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কেন্দ্রের পিয়ন মো. সেলিম কেন্দ্রের নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে আমরা গত মার্চ মাসের এক সড়ক দুর্ঘটনায় হারিয়ে ফেলি, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। নতুন পিয়ন মো: লিমন সবেমাত্র কেন্দ্রে যোগদান করে কাজ করছে, তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

কেন্দ্রের কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষক-গবেষকসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করি এবং সকলের জন্য রইল শুভ কামনা।

উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
৪৩৪, লেকচার থিয়েটার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ ডিসেম্বর, ২০২২

এম. মতিউর রহমান
পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভাষার সীমানা ও ভাষাতীত-এর ধারণা : লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন ১
প্রিয়ম্বদা সরকার

জারিগান ও মনিরুদ্দিন মোড়ল ১৫
দেবপ্রসাদ দাঁ

মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের হিন্দু দেবদেবী প্রসঙ্গ ২৫
কালিদাস ভক্ত

চলচ্চিত্রের গানে নজরুল ৬১
ফারহানা রহমান কান্তা

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮৯
মুহম্মদ মনিরুল হক

বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা ১২৯
বিশ্বজিৎ ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ : গুরুশিষ্য সমাচার ১৫৩
চন্দনা রাণী বিশ্বাস

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন ১৭১
আনিসুজ্জামান

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রসঙ্গে ১৮৭
প্রমথ মিস্ত্রী

আত্মার পরিশুদ্ধি ও জ্ঞান : ইমাম গাযালির মতের পর্যালোচনা ২১৩
আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস

লৌকিক উপাদান : 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এ ২৪৩
সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষার সীমানা ও ভাষাতীত-এ ধারণা: লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন

প্রিয়ম্বদা সরকার *

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হলেন লুডভিগ জোসেফ জোহান ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১)। তরুণ বয়সে লেখা তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *ট্যাক্টেটাস-লজিকো-ফিলোসফিকাস* ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্‌স্* আজ সারা বিশ্বে দর্শনের আকর গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। যুগান্তকারী বৈপ্লবিক এই বই দু-খানি পরস্পরবিরোধী বলেই দর্শনের জগতে আখ্যাত।

ট্যাক্টেটাস-এ আমরা দেখি যে তিনি জগৎ, চিন্তন ও ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে এক অসামান্য পূর্বতঃসিদ্ধ দর্শন রচনা করেছেন। অপরদিকে *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্‌স্*-এ ভাষা আমাদের দৈনন্দিনের দৈশিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই পার্থক্য আমাদের বোঝায় যে, তরুণ ভিটগেনস্টাইনের ভাষা সম্পর্কিত পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা পরিণত বয়সে কতটা পরিবর্তিত হয়েছিল !

শুধু তাই নয় আমরা আরো লক্ষ করি, দার্শনিক সমস্যার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে যে মত তিনি প্রথম জীবনে অবিসম্বাদিত সত্য হিসেবে মেনেছেন, পরবর্তী কালে তিনি সেই মতকে দূরে ঠেলেছেন, আর জীবনের শেষে যে মতকে গ্রহণ করেছেন–– তা তাঁর আগের মতের বিরুদ্ধ মত না হলেও বিপরীত মত তো বলাই যায়। ট্যাক্টেটাস-এ আমরা দেখি যে তিনি বলেছেন: সমাধানহীন দার্শনিক সমস্যাগুলির আসলে ভাষার যুক্তিকে ঠিক ঠাক বোঝার মাধ্যমেই সমাধান সম্ভব।

---

* ড. প্রিয়ম্বদা সরকার, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

এখন প্রশ্ন হলো 'ভাষার যুক্তি' বলতে ভিটগেনস্টাইন কী বুঝেছেন? মনে রাখা দরকার এই প্রসঙ্গে যে *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্*-এ তিনি দার্শনিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভাষা ও তার যুক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, বলেছেন ভাষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, যদিও ভাষার ধারণাটি এই দুই গ্রন্থে একেবারেই ভিন্ন।

যাইহোক, *ট্যাক্টেটাস*-এ তাঁর যে চিন্তাটি গুরুত্ব পেয়েছে, তা হল ভাষায় নিহিত যুক্তিকে অনুধাবন করা মানেই হল–– ভাষাতে আমরা অর্থপূর্ণভাবে, স্পষ্টভাবে কী বলতে পারি–– তার সীমা নির্দেশ করা। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ভিটগেনস্টাইনের মতে, 'কিছু বলা যায়' মানেই হল, 'তা যুক্তিসম্মতভাবে চিন্তা করা যায়'। তাই কেউ যদি ভাষার স্বরূপ যথাযথভাবে অনুধাবন করে, সে উপলব্ধি করে যে অর্থপূর্ণ ভাষার সীমা ও চিন্তার সীমা শেষ অব্দি এক সমে এসে মিলে যায়। আর অর্থপূর্ণভাবে সীমার বাইরে যা পড়ে থাকে–– তা সবই হয় অর্থহীন। ট্র্যাক্টেটাসের তাৎপর্য তাই লেখক সূত্রাকারে এভাবেই দিয়েছেন:

যা কিছু বলা সম্ভব–– তা স্পষ্ট করেই বলা সম্ভব। যা বলা সম্ভব নয়–– তা সর্ম্পকে চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়।[১]

অর্থাৎ যা বলা যায়, তা স্পষ্ট করে বলা যায়। তার থেকে যা বলা যায় না–– তাকে আলাদা করা দরকার। স্পষ্টভাবে, অর্থপূর্ণভাবে যা বলা সম্ভব আর যা বলা সম্ভব নয়–– তার মধ্যে একটা সীমারেখা টানা দরকার। বস্তুত ভিটগেনস্টাইন ট্র্যাক্টেটাসে এই কাজটাই করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ ভাষার সীমানা টানতে চেয়েছেন ট্র্যাক্টেটাসে–– তাই সীমানার অপর প্রান্তে যে ভাষাতীতের অবস্থান–– তাকে কেন্দ্র করেই তাই ভাষ্যকারদের মধ্যে কূটতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আজকে আমরা 'ভাষার সীমানা' ও ভাষাতীতের প্রতি ভিটগেনস্টাইনের মনোভাব কী ছিল যা তার জীবনের দুই পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে–– তা নিয়েই আলোচনা করবো। তাই এই প্রবন্ধটি দু-টি পর্বে বিভক্ত–– প্রথম পর্বে আমরা ট্র্যাক্টেটাসের ভাষার সীমানা ও ভাষাতীত সম্পর্কে ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করবো আর দ্বিতীয় পর্বে দেখবো *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্*-এ তিনি কীভাবে এ বিষয়গুলিতে নিজের আগেকার অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

প্রথম পর্ব

ট্র্যাক্টেটাস ও ভাষার সীমানা: ট্র্যাক্টেটাসে তিনি ভাষাতে অর্থপূর্ণতার সীমানা টেনে অর্থপূর্ণতা ও অর্থহীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন–– যা আমরা নিচের ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তুলে ধরছি:

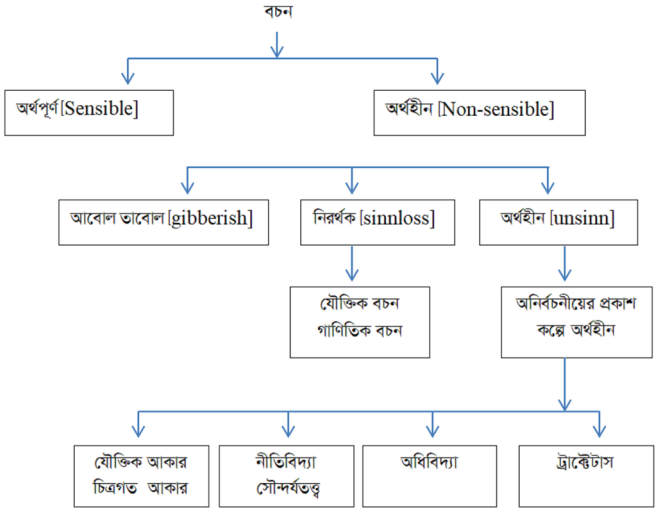

ট্র্যাক্টেটাসীয় অর্থতত্ত্ব অনুসারে আমরা সেই বচনকেই অর্থপূর্ণ বলবো যে বচন জগতের কোন তথ্যকে প্রতিবিম্বিত করে। যদি সে বচন জাগতিক ঘটনাকে যথাযথ ভাবে প্রতিবিম্বিত করতে পারে, তবে তা সত্য বচন আর যদি সে তা না পারে, তা মিথ্যা বচন। এবারে আসি সীমানার ওপারে যে ভাষাতীত, তার আলোচনায়। যৌক্তিক বচন বা গাণিতিক বচনের ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি, ভিটগেনাস্টাইন Sinnloss কথাটি ব্যবহার করেছেন, যাকে বাংলা ভাষায় নিরর্থক বলা যেতে পারে। এই বচনগুলি নিরর্থক এই কারণে যে, তারা জাগতিক কোন ঘটনার চিত্ররূপ নয়, তবুও কিন্তু তারা ট্র্যাক্টেটাসীয় বিচারে গুরুত্বহীন নয়। এই যৌক্তিক বা গাণিতিক বচনগুলি চিন্তন, ভাষা ও জগতের যৌক্তিক আকারের মিলটুকুকে দেখায়–– তাই এরা নিরর্থক হলেও গুরুত্বপূর্ণ।

যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অর্থাৎ যা অর্নিবচনীয় বা ভাষাতীত, তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে যে ধরনের অর্থহীনতার উদ্ভব হয়, তা 'উনসিন' (Unsinn)। আমরা আগেই দেখেছি যে, ট্র্যাক্টেটাসের অর্থপূর্ণ ভাষা স্বরূপতই বর্ণনাযোগ্য–– জাগতিক কোন কিছুর বর্ণনাই ভাষায় অর্থপূর্ণতার মানদণ্ড।

কিন্তু এই মানদণ্ড স্বীকার করে নিলে নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এমনকি ট্র্যাক্টেটাসের বচনগুলিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ প্রকৃতই তারা বর্ণানামূলক বচন নয়। শুধু তাই নয়, এই বচনগুলি (অর্থাৎ নৈতিক, নন্দনতাত্ত্বিক, আধিবিদ্যক এবং একই সঙ্গে ট্র্যাক্টেটাসের বচনগুলি) শুধু যে কিছুই বর্ণনা করে না, তাই নয়–– বচনগুলির বক্তব্য বিষয় এমনই যা কখনো বর্ণনযোগ্য হয় না। তাই তারা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ করতে চায়–– তা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই বচনগুলি অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করা, ভাষাতীত যে অব্যক্ত, তাকে ভাষায় ব্যক্ত করার এক অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। এই অক্ষম প্রচেষ্টাগুলি এই বিশেষ ধরনের অর্থহীনতার পরিবেশক।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখানে 'অর্থহীন' শব্দের অর্থ অ-গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এগুলি যে তাঁর বিচারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে লুডভিগ ফন ফিকার কে লেখা একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন––

> ট্র্যাক্টেটাসের প্রস্তাবনায় আমি একটি বাক্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলাম, সেটি এখন প্রকাশিত পুস্তকে নেই, বা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেটি আমি তোমার জন্য লিখছি। কারণ সেই বাক্যটি হবে তোমার ট্র্যাক্টেটাসের রহস্যভেদের চাবিকাঠি। যা আমি লিখতে চেয়েছিলাম, তা হল–– আমার কাজ মূলত দু-টি অংশ দ্বারা গঠিত–– একটি অংশ হল, যা আমি লিখেছি এই বইতে আর অপর অংশটি হল–– যা আমি লিখতে পারিনি, এবং যা আমি লিখতে পারিনি, সেটাই আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই বই যেন ভিতর থেকে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রের সীমারেখা টেনেছে এবং আমি স্থির নিশ্চিত যে এই সীমা টানার এটাই একমাত্র কঠোর উপায় বা রাস্তা। সংক্ষেপে, আমি বিশ্বাস করি যে আমি এই সব বিষয় সম্বন্ধে চুপ থেকে বা কোন মন্তব্য না করে–– আমি আমার বই এর সবকিছু ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে পেরেছি। তোমাকে আমি এই বই এর প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তটুকু পড়তে বলবো- কারণ সেখানেই এই বই এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত আছে।[২]

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে এটুকু পরিস্কার যে, যে বচন জাগতিক তথ্যমূলক বিবৃতি নয়, সে বচন বা অবধারণ ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী তাৎপর্যহীন, যদিও তাদের তাৎপর্যহীনতা তাদের গুরুত্বকে কম করে দেয় না। ভিটগেনস্টাইন ট্র্যাক্টেটাসের মুখবন্ধ ও সিদ্ধান্ত পড়তে বলেছেন। মুখবন্ধে তিনি চিন্তার তথা ভাষার সীমারেখা টানার কথা বলেছেন আর সিদ্ধান্তে জানাচ্ছেন যে ট্র্যাক্টেটাস বইটিও তার নিজস্ব মানদণ্ডের প্রেক্ষিতেই অর্থহীন বা Unsinn।

একটু নজর করলেই বোঝা যায় যে, যৌক্তিক দর্শনের এই আকর গ্রন্থটিতে Unsinn বা অনির্বচনীয়ের প্রকাশকল্প অর্থহীন যে বিষয়গুলি, সেগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রায় নেই বলেই চলে। বইটির শেষের দিকের ৫/৬ পাতায় এর বিক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আলোচনার মূলবক্তব্য হলো ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী এ জগৎ হল তথ্যসমুদায়। অথচ প্রকৃত অর্থে নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব –– সবেরই আলোচ্য বিষয় তথ্য-অতিবর্তী, সে কারণেই তথ্যসমুদায়ের যে জগৎ–– তারও অতিবর্তী। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ভিটগেনস্টাইন এখানে প্লেটোর মতো তথ্য-অতিবর্তী অতিরিক্ত কোনও জগৎ মেনেছেন, যেখানে নৈতিকতা, নান্দনিকতা ও ঈশ্বরের অবচলিত অধিষ্ঠান। না, তিনি সেরকম কোন জগৎ মানেননি।

বস্তুত এ প্রসঙ্গে তরুণ ভিটগেস্টাইনের বক্তব্যকে বুঝতে গেলে আমাদের যে চিঠিতে ভিটগেনস্টাইন রাসেলের ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তার শরাণাপন্ন হতে হবে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন:

> তুমি কিন্তু আমার বই এর মূলবক্তব্যটি ধরতে পারোনি। যৌক্তিক বচন সংক্রান্ত আলোচনা আমার বই এর মূলবক্তব্যের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। আমার মত 'যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় আর যা প্রকাশ করা যায় না–– অর্থাৎ যা বলা যায় আর যা বলা যায় না- তার মধ্যে পার্থক্য করাটাই হল দর্শনের প্রধান সসম্যা।[৩]

এই বইটি প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু লুডভিগ ফন্ ফিকারকে বলেন–– 'ট্র্যাক্টোটাসের মূখ্য নির্দেশ হল নৈতিক'–– অর্থাৎ ভাষ্যকারেরা যে এটিকে যৌক্তিক দর্শন বা বিশ্লেষণী দর্শনের গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন–– তা গ্রন্থকারের মনঃপূত ছিল না। তিনি বলতে চেয়েছেন বইটি হল নীতিতত্ত্ব বিষয়ক। অদ্ভুতভাবে তিনি নীতিতত্ত্ব ও ধর্মভাবনাকে এক গোত্রীয় বা একই মনে করে থাকেন। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কেউ বলতে পারেন–– তবে তো বইটির মুখ্যার্থ হল নন্দনতাত্ত্বিক বা ঈশ্বরতাত্ত্বিক। অথচ এ বিষয়গুলি সর্ম্পকে তিনি এই গ্রন্থে বিশেষ বাক্যব্যয় করেননি। এ ধোঁয়াশা কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে যদি এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রথম চিঠিটির উপদেশ অনুযায়ী আমরা বইটির মুখবন্ধ ও সিদ্ধান্তের বক্তব্যটা বিশদ করি। বইটির মুখবন্ধে ও সিদ্ধান্তে আমরা দেখি তিনি একই কথা লেখেন–– 'যা বলা যায় তা স্পষ্ট করেই বলা যায়- আর যা বলা যায় না–– সে সম্বন্ধে চুপ করে থাকাটাই ভালো।'

অর্থাৎ এই বইটিতে তিনি যে সব বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেননি, সেই গুলিই তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রকাশ আমরা ভিয়েনা

চক্রের আলোচনা সভায় প্রত্যক্ষ করি। মরিৎজ শ্লিকের আমন্ত্রণে যখন তিনি ভিয়েনা চক্রের আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন, তখন সেখানে তিনি ট্র্যাক্টেটাস সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার পরিবর্তে শ্রোতাদের দিকে পিছন ফিরে উদাত্ত কণ্ঠে বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করতেন।

ভাষ্যকার রেমঙ্ক বলেছেন যে হয়তো এভাবেই তিনি ভিয়েনা চক্রের দার্শনিকদের কাছে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে তাঁর কাছেও 'যে কথাগুলো বলা গেল না'–– সেগুলিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং 'যে কথা বলা যায় না, সে কথা না বলাই ভালো'। অবশ্যই যা বলা যায় না- তা কিন্তু দেখানো যায় অর্থাৎ যা দেখা যায় তার মধ্য দিয়েই যত না বলা কথা আত্মপ্রকাশ করে।

ভিটগেনস্টাইন-পূর্ববর্তী দার্শনিকের 'যা বলা যায় না'- তার সম্বন্ধেই বেশি বলেছেন। ভিটগেনস্টাইনের মতে, তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে যা প্রকাশ করতে চান, তা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়–– অর্থাৎ এই বচনগুলি অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করার, অব্যক্তকে ব্যক্ত করার অক্ষম প্রচষ্টা মাত্র। ভিটগেনস্টাইনের মতে, এই অক্ষম প্রচেষ্টাই অর্থহীনতার উদ্রেক করে থাকে। আর একটু গুছিয়ে বলি। নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা–– এই ধরনের অর্থহীনতার আওতায় পড়ে কারণ এখানে ব্যবহৃত বাক্যগুলি তথ্যজ্ঞাপক নয়। তাদের বক্তব্য বিষয়গুলি অতিপ্রাকৃত, যেহেতু আমাদের ভাষা কেবল প্রাকৃতকে বর্ণনা করতে পারে, তাই অতিপ্রাকৃতকে ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও যে দার্শনিকেরা ভাষা ব্যবহার করে এগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন–– আর আমরা যে বোঝাবার চেষ্টা করেছি- এই সমস্ত প্রচেষ্টাই তাই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাই অর্থহীনতার পরিচায়ক, ভিটগেনস্টাইন অবশ্য আমৃত্যু এই অর্থহীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন–– যেসব মানুষেরা নীতিবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, অধিবিদ্যা বা ধর্ম সম্বন্ধে বলতে বা লিখতে চান, তাঁদের মধ্যে ভাষার সীমা লঙ্ঘন করার এক প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং তিনি নিজে উপলব্ধি করেন যে তিনি নিজেও এর ব্যতিক্রম নন। এই সীমা লঙ্ঘন করার প্রবণতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তিনি কখনো একে উপহাস করতে পারেন না।

এই পটভূমিকায় আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কেন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশ্চর্য সংযমী ও বলা যায় প্রায় নীরব। এই নীরবতা প্রসঙ্গেই ভিটগেনস্টাইন ভাষ্যকারেরা মূলত দু-টি ভাগে বিভক্ত। (এক) একদল ভাষ্যকারেরা মনে করেন নীরবতার অর্থ হলো সেখানে সরব হবার মত

কিছুই নেই। যা আছে তা নিতান্তই অর্থহীন, এদের পাঠকে বলা হয় Resolute Reading বা অটল পাঠ। এঁদের মধ্যে আছেন জেমস্ কোনান্ট, কোরা ডায়মন্ড, মেরী ম্যাকগিন এবং অন্যান্যরা, যাঁরা মনে করেন এই নীরবতা গর্ভবতী নীরবতা নয় অথবা এই নীরবতা অর্নিবচনীয়ের পবিত্রতা রক্ষাকারী নীরবতা নয়। এটির সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি কারণ এখানে বলার মতো কিছু নেই। অন্যদিকের ভাষ্যকারেরা মনে করেন অবশ্যই তেমন কিছু আছে, যা আমাদের প্রাত্যহিকের ভাষা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। এই দলের ভাষ্যকারদের মধ্যে আছেন G.E.M. Anscombe, A. Kenny, Norman Malcom প্রমুখ। আবার এই দু-ই দলেরই অর্থহীনতা ও নীরবতা সম্বন্ধীয় মন্তব্যগুলিকে আপাত-বিরোধী বলে দেখিয়েছেন অসকারী-কুজেলা।

যাইহোক এই ভাষ্যকারদের বির্তকে না ঢুকে আমরা এবার দেখি। P1 তে তিনি ভাষা, ভাষার সীমানা ও ভাষাতীতকে কীভাবে দেখেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্ ও ভাষার সীমানা

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো ভিটগেনস্টাইনের ভাষার সীমানা ও ভাষাতীতের ধারণা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে পরবর্তীকালের রচনায়। আমরা দেখেছি ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী ভাষার সীমানা নির্ধারিত হয় ভাষার যৌক্তিক পরমাণু যে নাম, সেই নাম সমন্বিত মৌল বচনের সমষ্টি দিয়ে। আমার কাছে সকল মৌল বচনের মানেই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ভাষার উপস্থিতি। তাই মৌল বচন সমুদায় দিয়েই রচিত হয় ভাষার সীমানা। মৌল বচনগুলি যেমন নামের সমষ্টির দ্বারা সীমায়িত হয়, তেমনই তথ্য সীমায়িত হয় ট্র্যাস্টেটাসীয় বস্তুশৃঙ্খলের দ্বারা। আর সেই তথ্য সমুদায়ই নির্ধারিত করে দেয় জগতের সীমানা। জগতের সীমানার উল্লেখ করা এখানে এ কারণেই প্রয়োজন যেহেতু তরুণ ভিটগেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে ভাষার সীমা আর জগতের সীমা একই জায়গায় এসে মিলে যায়। এবং ট্র্যাক্টেটাসে পূবর্তঃসিদ্ধ যুক্তির আলোকে এই মিলকে দেখানোই ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য।

পরিণত ভিটগেস্টাইন-এ আমরা লক্ষ করি যে পূবর্তঃসিদ্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব–– এ ধারণা তিনি পরিত্যাগ করেছেন। পরিত্যাগ করেছেন যৌক্তিক পরমাণুর ধারণা–– যার সাথে নাম ও মৌলবচন একদিকে আর অন্যদিকে বস্তু ও আনবিক তথ্যের ধারণাও পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই ভাষার ধারণা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সীমানার ধারণাও পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন

দেখি পরিণত ভিটগেস্টাইন ভাষা নিয়ে কী ভেবেছেন–– এ পর্যায়ে তিনি ভাষাকে বুঝতে পরতঃসাধ্য পদ্ধতিতে ভাষার দৈনন্দিনের ব্যবহার ও ভাষা-ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর জীবন-যাপনের বিশ্লেষণকেই হাতিয়ার করেছেন। অবশ্য ভাষা ও তার কার্যকলাপের বিশ্লেষণ যে দার্শনিক সমস্যা সমাধানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ–– সে বক্তব্য থেকে তিনি সরে আসেননি। তিনি বলেছেন––

> দার্শনিক সমস্যাগুলো আভিজ্ঞাতিক বা অভিজ্ঞতাবিধায়ক সমস্যা নয়, ভাষার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের দিকে সঠিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে তবেই এই সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।[৪]

অর্থাৎ পরিণত ভিটগেনস্টাইনও মানছেন দার্শনিক সমস্যাগুলো সমাধান ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে এই বিশ্লেষণের প্রকৃতি ট্র্যাক্টেটাসের পূর্বতঃসিদ্ধ যৌক্তিক বিশ্লেষণের থেকে একদমই আলাদা। এখানে তিনি দৈনন্দিনের ভাষা ও তার কার্যকলাপের দিকে নজর দিতে বলেছেন, বলেছেন কীভাবে একটি শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হতে হতে অর্থকে অর্জন করে- কীভাবে বিনা ব্যবহারের শব্দ অর্থহীন হয়ে পড়ে তার দিকে নজর দিতে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন সময়ের ধারণা- এই ধারণা নিয়ে দার্শনিক মহলের সমস্যার অন্ত নেই।

এই 'সময়' শব্দটি 'রাম', 'শ্যাম', টেবিল', 'চেয়ার' ইত্যাদি যাদের নির্দিষ্ট দ্যোতক বাহ্যবস্তু আছে–– তাদের থেকে আলাদা–– কারণ সময়ের দ্যোতক কোন বাহ্যবস্তু জগতে নেই।

তবু কিন্তু সময় সংক্রান্ত আলাপচারিতা- যেমন ট্রেনটি কোন সময়ে ছাড়বে? পরীক্ষার দিন কবে স্থির হলো? ইত্যাদি আমাদের ভাষায় যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব, কারণ এই প্রশ্নগুলি কিছু বাস্তব ও কিছু সম্ভাব্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই তোলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ও সাম্ভাব্য পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যদি প্রশ্ন তোলা যায় 'সময় কী?' তবে তার জবাব আর মেলে না। এ প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইন অগাস্টিনের লেখার উল্লেখ করেছেন––

> সময় কী? কে একে চট করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারে? কে সময় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলতে পারে? অথচ সময় সম্পর্কে সত্যিই কি আমরা কিছু জানি না? যখন আমরা এ নিয়ে কথা বলি, তখন বুঝি, যখন অন্যেরা বলে, আমরা শুনি, তখনো বুঝি, তবু 'সময় কী?'— এই প্রশ্ন আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা না করে, তবে আমি জানি, যদি জিজ্ঞাসা করে ও ব্যাখ্যা চায়–– তবে আমি জানি না।[৫]

কিন্তু কেন আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না? কারণ যিনি প্রশ্ন করেছেন, তিনি সময়কে সব পরিস্থিতির ঊর্ধে কল্পনা করে, সকল সাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রশ্ন তুলেছেন–– তাই তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। আর এভাবেই যখন কোন দার্শনিক শব্দকে তার স্বাভাবিক সঞ্চারের পরিস্থিতি থেকে দূরে সরিয়ে এনে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুরু করেন, তখনই দার্শনিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

ভাষায় শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত হয়–– তার দ্বারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার অর্থ নির্ধারিত হয়–– এই ধারণাই তাঁর ট্র্যাক্টেটাসের ভাষার সীমানার ধারণার মূলে আঘাত করে। আমরা দেখেছি ট্রাক্টেটাসে ভাষার সীমানা নির্ধারিত হয় প্রাথমিক পর্যায়ে মৌল বচন সমূদায় ও পরবর্তী পর্যায়ে ভাষার যৌক্তিক পরমাণু 'নাম' এর সাথে জগতের যৌক্তিক পরমাণু 'বস্তু'র মেলবন্ধনে। এখানে তিনি দেখাচ্ছেন–– নাম সবসময় বস্তুকে নির্দেশ করে না এবং না করলেই যে সে অর্থহীন তাও নয়।

দ্বিতীয়ত বাক্য হতে গেলে যে নামপদ সমাহার হতে হবে–– তাও ঠিক নয়। একপদী বাক্যও সম্ভব। ট্র্যাক্টেটাসে তিনি বলেছেন, নামের সারমর্ম যেমন বস্তুকে নির্দেশ করা, তেমনি বাক্যের সারমর্ম হ'ল ঘটনার বর্ণনা দেওয়া। *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস্* এসে পরিণত ভিটগেনস্টাইন মনে করেছেন ভাষার কাজ শুধু বর্ণনা দেওয়া নয়, তার আরো অনেক কাজ আছে। সে সকল কাজই বাক্য দ্বিধাহীনভাবে সম্পন্ন করে থাকে। আর ভাষার অসংখ্য অজস্র কাজের ভিড়ে ঘটনার বর্ণনা দেওয়াটা একটা সামান্য কাজ মাত্র। তাকেই কাজ বললে ভাষার অনেকান্তিক স্বরূপ উন্মোচন কখনোই সম্ভব হবে না। আর একে সারসত্য বলে বাক্যের সংজ্ঞা দিলে তা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে।

অবশ্য পরিণত ভিটগেনস্টাইন একথা বলেছেন না যে, বাক্য কখনো ঘটনার বর্ণনা করে না। তিনি বলতে চাইছেন যে দৈনন্দিনের ভাষা-ব্যবহারকে খুঁটিয়ে দেখলেই তার মধ্য দিয়েই ভাষার অনেকান্তিক সত্য উদ্ভাসিত হয়। তিনি এ পর্যায়ে যুক্তি দিয়েছেন; 'চরমতম সরল' বা 'চরমতম জটিল'–– এই বাকাংশ অর্থহীন। কারণ এগুলির সাথে কোন প্রসঙ্গ বা কোন প্রেক্ষিত উল্লিখিত হয়নি। তাঁর মতে, 'চূড়ান্ত সরল' বা 'চূড়ান্ত জটিল' কথাগুলি অর্থপূর্ণ হবে তখনই যখন কার প্রেক্ষিতে জটিল বা কার প্রেক্ষিতে সরল–– সে বিষয়ের উল্লেখ থাকবে; প্রসঙ্গত প্রেক্ষিতের উল্লেখ না থাকলে ভাষাতে এগুলি অর্থবহ চিহ্ন রূপে গণ্য হবে না। তাই যদি হয় তবে ট্র্যাক্টেটাস অনুযায়ী ভাষার যৌক্তিক পরমাণু হিসেবে চূড়ান্ত সরল 'নাম' ও অর্থহীন শুধু তাই নয়, চূড়ান্ত সরল 'বস্তু' যা কিনা জগতের যৌক্তিক পরমাণু হিসেবে

ট্র্যাক্টেটাসে স্বীকৃত ছিল–– তার অস্তিত্বও মানা সম্ভব নয়, যেহেতু 'চূড়ান্ত সরল' বলেই কিছু হয় না, উপরন্তু আগেই দেখেছি নাম ও বস্তুর মধ্যে যে অটল গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে মানা হয়েছিল ট্র্যাক্টেটাসে–– তাও এখানে অর্থহীন হিসেবে পরিত্যক্ত হ'ল। ভাষার নামের যদি অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব না থাকে–– তবে তাদের সমাহারে অর্থপূর্ণ মৌলবাক্য গঠিত হবার সম্ভাবনাই রইল না। যেহেতু মৌলবাক্য সমূদায় দ্বারাই ট্র্যাক্টেটাসের 'ভাষার সীমানা' নির্ধারিত ছিল–– এখানে সেই সীমানার ধারণাটি নামের অর্থহীনতার সাথে সাথে তাসের ঘরের মতোই ভেঙ্গে পড়লো।

এবারে আসি অর্থপূর্ণতার সীমানা প্রসঙ্গে। *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্*-এ তিনি বলেন 'কোন রচনাটি অর্থপূর্ণ হবে আর কোন রচনাটি হবে না–– তা নির্দেশ করবে প্রসঙ্গ। অর্থাৎ অর্থপূর্ণতা ও অর্থহীনতার পার্থক্যটিও অটল, চিরন্তর নয়। আজ যা এক প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ, কাল তা অন্য প্রসঙ্গে অর্থহীন হতেই পারে। তাদের অর্থপূর্ণতা বা অর্থহীনতাকে চূড়ান্ত ভাবার কোন যুক্তি নেই অর্থাৎ অর্থপূর্ণ ভাষার সীমানার ধারণাও এখানে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল।'

এবারে আসি ভাষাতীত্ব প্রসঙ্গে। ভাষার সীমানার ধারণা যদি অটুট না থাকে, তবে ভাষাতীত, যা কিনা সীমানার বাইরে–– তার ধারণাই বা অটুট থাকে কী করে? যাই হোক আমরা আগেই দেখেছি যে, ভাষাতীত অর্থাৎ অনির্বচনীয় বিশেষ বস্তু হত পারে আবার বিশেষ অভিজ্ঞতাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, তা তো বচনীয় হতে পারে না সাধারণ ভাষায়। পরিণত ভিটগেনস্টাইন মনে করেন–– যা বচনীয় তা কখনো গোপন হতে পারে না, *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্*-এ তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত ভাষার ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়–– তাই যা কিছুই ভাষাতীত তা কোন ভাষাতে প্রকাশিত হতে পারে না। সুতরাং তা সম্পর্কে আমার জ্ঞান হবে কী করে? তা যদি সাধারণ সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় প্রকাশ হতে না পারে–– তাহলে ভাষাতীতের প্রকাশ হয় কীভাবে? তবে কী এটির ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ সম্ভব? ভিটগেনস্টাইন ব্যক্তিগত ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন––

> যে ভাষায় শব্দের অর্থ কেবলমাত্র সেই ভাষা ব্যবহারকারীর কাছেই বোধগম্য বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ সেই শব্দগুলি কেবলমাত্র বক্তার ব্যক্তিগত অনুভূতির (যা অন্যের কাছে কেবল দুরধিগম্য নয়- চির অনধিগম্য তার নির্দেশক হবে।[৬]

অর্থাৎ ভিটগেনস্টাইন এখানে ব্যক্তিগত ভাষা বলতে ব্যক্তিগত দিনপঞ্জির সংকেতলিপি বা অন্য কোন ধরনের সাংকেতিক ভাষাকে বুঝছেন না। কারণ এইসব ব্যক্তিগত গোপন ভাষাগুলির সবসময়েই সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় অনূদিত

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে-- অর্থাৎ এই ভাষার সর্বজনীন ভাষা হবার যৌক্তিক সম্ভাবনা আছে। ভিটগেনস্টাইনের মতে একটি শব্দ যখন সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তখনই তা অর্থযুক্ত হয়। অর্থাৎ শব্দটি তখনই ভাব আদান-প্রদানের কাজে সক্ষম হয়, কারণ তখন শব্দটির ব্যবহার (কী অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে, সে) সর্ম্পকে ব্যবহারকারীদের মতদ্বৈধ থাকে না। শব্দ ব্যবহারের নিয়ম থাকে এবং সেই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যবহার বা প্রথার নিয়মিত অনুসরণে। তাই কোন একটি শব্দের ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হ'ল কিনা-- তা আমরা শব্দ ব্যবহারের প্রচলিত প্রথার মানদণ্ডের নিরিখেই যাচাই করে নিতে পারি।

ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্-এ তিনি যে যুক্তি দেন, তা হল: কোন পদকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার (একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার) করতে চাইলে তা অর্থহীন হবে। কারণ সেক্ষেত্রে শব্দটি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হ'ল কিনা-- তা বিচার করার কোন মানদণ্ড থাকে না। যদি সত্যিই কোন মানদণ্ড না থাকে তবে শব্দের প্রয়োগ যে যথার্থ-- এ বিষয়ে নিছক প্রতীতি এবং শব্দটি যথার্থই প্রযুক্ত-এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

তিনি আরো যুক্তি দেন যে, যদি কেউ কখনো জানতে পারে-- আমি 'ভালোবাসা' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করছি- তাহলে অন্য কেউ কোনদিন জানতে পারবেন না-- অন্য কেউ যে অর্থে 'ভালোবাসা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন-- সেই অর্থগুলির সঙ্গে আমাকৃত অর্থের সাযুজ্য আছে কিনা। আবার মানসিক যন্ত্রণার অর্থ যদি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে হয়, তবে 'যন্ত্রণা' বলতে যে সবাই একই ধরনের অনুভূতিতে বোঝাচ্ছে-- তা মানার কোন উপায়ই থাকবে না। অতএব ভিটগেনস্টাইনের মূলবক্তব্য হল- কোন শব্দ যদি সার্বিক ভাষায় অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে সেই শব্দের অর্থ বা বিষয় কখনোই ব্যক্তিগত হতে পারে না।

এই ব্যক্তিগত ভাষার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি তাই আমাদের ভাবতে বাধ্য করে: তাহলে ভাষাতীতের ধারণা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় এলো কী করে? আমরা সবাই বুঝি 'ভাষাতীতের' অর্থ কী? কিন্তু এই অর্থ আমরা পেলাম কী করে? অবশ্যই কোন বিষয় থেকে নয়, তবে কোথা থেকে এলো এর সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ ? *ফিলোসফিকাল ইনভেসটিগেশন্স্* অনুযায়ী ভাষাতীত শব্দটি কীভাবে সার্বিক ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে-- তার উপর নির্ভর করেই শব্দটির অর্থ গড়ে উঠছে।

ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্ -এ ভিটগেনস্টাইন আরো যে বিষয়ে গুরুত্ব দেন তা হল-- বর্ণনা করাই দার্শনিকদের কাজ, ব্যাখ্যা করা নয়। দার্শনিকেরা

সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে চান বলেই সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। দার্শনিকদের এই সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা তাঁর কাছে অসুস্থতারই নামান্তর। এই অসুখ সারবে যদি দার্শনিকেরা ব্যাখ্যা করার বদলে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ ভাষাতীত বা অর্নিবচনীয়কে ব্যাখ্যা করার বদলে যদি আমরা বর্ণনা করি কীভাবে এই শব্দগুলো ভাষাতে অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্ণনা করতে গেলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল ভাষা ব্যবহারের নিয়মগুলো জানা ও ঠিকমতো তা অনুসরণ করা। পরিণত ভিটগেনস্টাইন মনে করেন দৈনন্দিনের ভাষা সবসময়েই ভাষা ব্যবহারের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই নিয়মগুলি কিন্তু সর্বজনীন, ব্যক্তিগত নয়। নিয়মগুলি সর্বজনীন বলে এগুলি সহজেই শেখা ও শেখানো সম্ভব। (P১ ১৭৯, ২০১, ২০৬, ২১৬)। তিনি যেমন একদিকে মনে করেন যে ভাষা ব্যবহারের নিয়ম সকল ক্ষেত্রে মেনে চলা জরুরী–– তবুও তিনি এটাও মানেন যে, নিয়মগুলি সবক্ষেত্রে অনমনীয় নয় এবং কোন শব্দের সফল ভবিষ্যৎ ব্যবহারকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থাৎ 'অনির্বচনীয় বা 'ভাষাতীত' শব্দের ব্যবহার বা সন্দর্ভ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়মগুলি দেখায়–– 'যা বলা যায় না- তা কীভাবে বলতে হয়।' এই যে অব্যক্তকে ব্যক্ত করা, অর্নিবচনীয়কে বচনীয় করার প্রচেষ্টা, যা তিনি ট্র্যাক্টেটাসে 'অর্থহীন' বলে দাবি করেছেন এটার মধ্যে পরিণত ভিটগেনস্টাইন এক ধরনের নিয়ম-প্রতিহত করার প্রবণতাও দেখতে পান।

তাহলে ট্র্যাক্টেটাসে যে 'ভাষাতীত' বা 'অনির্বচনীয়ের সাক্ষাৎ পাই, *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস্*-এ তিনি তার থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন। ব্যক্তিগত ভাষার অসম্ভাব্যতার যুক্তিগুলি দেখায় সর্বজনীন ভাষা অতিরিক্ত অন্য কোন কিছু স্বীকার করার যো নেই আমাদের। তাই 'অনির্বচনীয়' বিষয় বা অভিজ্ঞতার সন্ধান না করে আমাদের বর্ণনা করা উচিৎ যে কীভাবে এই শব্দবন্ধ অর্থপূর্ণ ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই ব্যবহার- সর্বজনগ্রাহ্য ভাষার নিয়মানুসরণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এই কারণেই *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস্*-এ ভিটগেনস্টাইন আমাদের ভাষাতীত যে অনির্বচনীয়–– তার সম্বন্ধে অন্যরকম প্রশ্ন করতে বাধ্য করেন। যেমন অনির্বচনীয় বিষয় বা অভিজ্ঞতা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন না তুলে আমাদের প্রশ্ন করা উচিৎ- কীভাবে এগুলি ভাষায় প্রকাশিত হয়? আবার ভাষাতে যে পদ অনির্বচনীয় বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে (যেমন জগৎ আছে–– এতে আমি বিস্মিত) সে সম্বন্ধে কি আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়? এর পরিবর্তে আমার

প্রশ্ন করা উচিত–– কীভাবে একজন যে ভাষাখেলায় অনির্বচনীয়দের ব্যবহার আছে, সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে?

এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের ভাষাতে শব্দের অধিবিদ্যার ব্যবহার থেকে সাধারণ ব্যবহারে ফিরিয়ে আনতে পারে। শুধু তাই নয় যা প্রকাশ করা (articulate করা) শক্ত তাকে আধিবিদ্যক অর্থ দেওয়ার প্রলোভন থেকেও মুক্ত করে।

পরিশেষে তাই এ কথাই বলতে পারি যে, পরিণত ভিটগেনস্টাইন 'ভাষার সীমানা' ও 'ভাষাতীত'র ক্ষেত্রে *ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেশন্স্*-এ নতুন চিন্তার দিগন্ত উদ ঘাটিত করেন।

References

Wittgenstein Ludwig (1922). *Iractalus logico Philosophicus*, Translated by D. F. Pears and B. F. McGuinness, London, Routledg & Kegan Paul, p.74

Engelmann Paul (1967). Letters from Wittgenstein with a Memoir, Edited by B. F. McGuinness. Translated by I. Furtmiiller, Oxford, Bsil Blackwell, pp. 143-144

Monk Ray, 1990, *Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius.* New York: Macmillan. P. 164

Wittgenstein Ludwig (1983), Philosophical Investigations, G. E. M. Anscombe, Oxford, Basil Blackwell, par. 109

Edward B Pusey (1949), *Trans. The Confessions of St. Augustine,* New York: Modern Library, p. 253

Wittgenstein Ludwig. *Philosaphical Investigations,* par. 243

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জারিগান ও মনিরুদ্দিন মোড়ল

দেবপ্রসাদ দাঁ *

সারসংক্ষেপ: বাংলা লোকসংগীতে বিভিন্ন ধারা বহমান। এর এক অনন্য ধারা জারিগান। উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে এই গানের সংক্ষেপিত সহ যশোর অঞ্চলের অন্যতম জারি শিল্পী মনিরুদ্দিন মোড়ল সম্পর্কে। বর্তমানে জারিগানের যেসকল উল্লেখযোগ্য প্রবীন শিল্পী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম এই শিল্পীর কর্মময় জীবনের পটভূমি উপস্থাপনের সচেষ্ট প্রয়াস সাধিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আরো উপস্থাপিত হয়েছে– জারিগানের উদ্ভব, শিল্পীদের জীবন-জীবিকা, গানের বিষয়বস্তু, জারি ও ধুয়াজারি সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও রয়েছে বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পী, গানের আসর বর্ণনা।

জারিগান স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন। মুসলমানদের বীরত্বের ইতিহাসে মহর্‌রমের করুণ কাহিনি, জঙ্গনামা ও কারবালার গভীর শোকগাথা, শরীয়ত মারফত পৌরাণিক কাহিনি-ই এ গানের মূল উপজীব্য। বিষয়ের নিরিখে এই গান সকল ধর্মাবলম্বীদের নিকট সমভাবে সমাদৃত।

> আরবি 'জারি' শব্দের অর্থ প্রচার। কোনো বিষয় প্রচার বা জাহির করাকে সাধারণত জাহিরী বা জারি বলা হয়। ধর্মীয় বাণী, নীতি-নৈতিকতা প্রচারের জন্য জারি গানের আবির্ভাব হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৪৪)

মহর্‌রম মাসের দশম দিনে এই গান পরিবেশনের সাথে সাথে মুসলিম সম্প্রদায় নিজের দেহে ধারালো ছোরা দিয়ে আঘাত করেন। খালি পায়ে রাস্তায় হেঁটে

* ড. দেবপ্রসাদ দাঁ, সহযোগী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহর্‌রমের কাহিনি বর্ণনা পূর্বক মহর্‌রমের কষ্টকে অনুভব করতে চায় এবং সাধারণ মানুষকে মহর্‌রম বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন সনাতন ধর্মের চড়ক পূজা উপলক্ষে সন্যাসীদের কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটা, পিঠে লোহার বড়শি বিঁধে চরকাতে ঝুলে ঘোরা, আগুনের উপর দিয়ে লাফ দেওয়া ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে যেমন মানুষের ধর্ম শিক্ষা ও লোকমানসের বিশ্বাস জাগ্রত করেন; তেমনই এ আয়োজন করা হয়ে থাকে ধর্মীয় ও লোক শিক্ষার জন্য। কবি গানের অনুকরণে জারি গান গাওয়া হয়ে থাকে বলেও অনেকে মনে করেন। জারি গান যারা পরিবেশন করেন তাদেরকে বয়াতি বলে।

কবে থেকে জারিগানের সূচনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু জারি নয়; কোন লোকগানের-ই সূচনা কথা দিনমাস-সময়ের হিসেবে লিখে রাখা হয় না। কেননা, লোকমানসের ভাবাবেগের এই সোনালী অর্জন আদি থেকে বর্তমানে মিশে আছে। ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে জানা যায়, সেকালে আরবের মুসলমানরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন– শিয়া ও সুন্নী। শিয়ারা মনে করতেন রসুলুল্লাহ্‌র জীবনাবসানে তাঁর বংশধরেরা খিলাফতের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করবেন। অপর দিকে সুন্নীরা মনে করতেন যিনি সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে একতাবদ্ধ করতে পারবেন, ইসলামের জয়পতাকা সারা পৃথিবীতে সবার উপরে তুলে ধরতে পারবেন তিনিই হবেন খলিফা। এ রকম অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব এবং কারবালার হত্যাকাণ্ড।

> কারবালায় শত্রুবেষ্টিত হোসেন ফোরাত নদীতে নেমে অঞ্জলিবদ্ধ জল মুখে দিতে গিয়ে জলের অভাবে শত শত শিশুর আর্তনাদ ও সহকর্মীদের শহিদ হওয়ার কথা মনে পড়ায় তিনি জল পান না করে শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করেন। (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫০)

এই আত্মত্যাগের কাহিনি মানবতার শিক্ষা দেয়। জারিগানে যখন এই কাহিনি বর্ণিত হয় তখন শ্রোতারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ইমাম হোসেন তাঁদের কাছে হয়ে ওঠেন আদর্শ। কবি জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) মতে– 'বাংলাদেশে যে এত সহজে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল আর এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারিয়াছিল তাহা হয়তো এই সব জারিগানের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল।' (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫১) মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের মতে– আঠারো শতকের মধ্যভাগে জারিগান প্রচলিত।

> ড. এস. এম. লুৎফর রহমান মনে করেন যে, পুঁথি সাহিত্যের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই জারিগানের উদ্ভব। এবং তা সম্ভব হয়েছিলো গ্রামের আসরে

> পালাগান, মঙ্গলগান, পাঁচালি গীত হতে দেখে মুসলমান কবিরা এ থেকে জারিগান রচনার অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। আর বিষয় হিসেবে সন্নিবেশিত করে থাকবেন কারবালার কাহিনি। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যও তাই-ই মনে করেন। তাঁর মতে– অনুমান হিন্দুর রামায়ণ অথবা চণ্ডী-গীতের পরিবর্তে বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এই জারি প্রচলন করিয়াছিল। প্রচলিত রামায়ণ গান ও চণ্ডী-গীতের সঙ্গে জারি গীতের সাদৃশ্যই ইহার প্রমাণ। (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫১)

'জারিগান নিকট ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কাহিনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগীত হয়ে উঠতে অসুবিধে হয়নি।' (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৬৩)

ষড়ঋতুর বাংলায় সব ঋতুতে জারির আসর বসে না। ফলে জীবন ও জীবিকার তাগিদে স্বশিক্ষিত এই শিল্পীদের কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

> বেশিরভাগ সময় শীত মৌসুমে এ আয়োজন রাত্রে বেশি সংখ্যক লক্ষ্য করা যায়। মূল শিল্পীদের জন্য একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হয় এবং দর্শনার্থীদের জন্য সামিয়ানার নীচে বসার ব্যবস্থা থাকে। দর্শকরা মঞ্চের চারিদিক গোলাকৃতি হয়ে ঘিরে বসে। অনেক সময় রাত ৮/৯ টা থেকে শুরু হয়ে ফজরের আযান অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলতে দেখা যায়। দুই দলে দু'জন বয়াতি বা মূল গায়েন থাকেন। তাদের প্রত্যেকের সাথে ৯/১০ জন করে দোহার থাকে। (সাক্ষাৎকার: আনোয়ারুল)

এখনো পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়সের দর্শকদের নিকট জারি গানের সমধিক প্রাধান্য রয়েছে। পূর্বে জারিগানে ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেলেও আশির দশক থেকে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। একটি জারি গানের বন্দনার কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ওরে প্রথমে বিসমিল্লা বলে জারি করলাম শুরু
ঐ যে অনাথের নাথ আল্লা দোয়া করবেন গুরু
আহা গুরু কল্পতরু তুই সংসারের সার
এই যে পড়িয়াছি অচল ভরা আমায় কর পার গো
লা ইলাহা ইল্লালা মোহাম্মদ রসুল ॥ (সাক্ষাৎকার: মনিরুদ্দিন)

জারিগানেরও আছে নির্দিষ্ট গীত-পদ্ধতি। প্রথমে এ গানের পদ্ধতি কেমন ছিল তা জানা না গেলেও আদিতে এ গান ধর্ম ভিত্তিক ছিল এ কথা বিভিন্ন ইতিহাস, নথি, পুঁথি ইত্যাদি থেকে দৃষ্ট হয়। যা পরবর্তীতে সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হতে শুরু করে। লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার প্রভাবে।

> আধুনিককালের পরিবেশনা ও সূচনা পর্বের পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তখনকার গান ছিলো কোরানের আয়াত বা আরবীয় কাহিনি, তাতে থাকতো ধুয়া, আরেব ফেরতা, খুখড়া, বাহির চিতেন প্রভৃতি অংশ। আধুনিক কালে সেসব পরিবর্তিত হয়ে জারিগানের ভাব-ভঙ্গির মধ্যে প্রবেশ করেছে যাত্রার ভাব। (সুরঞ্জন, ২০১৩ : ৫২)

বিভিন্ন লোকসংগীতের পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কোন গান কোন গানের প্রভাবজাত তা নির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। জারিগান বাংলা লোকগানের তেমনই একটি ধারা। যার সুরের আঙ্গিক, বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাবের অবস্থান কেননা কোন লোকধারার সাথে প্রকরণগত সাদৃশ্যের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রভাবের জাত বিচারে এ গানকে আমরা পাঁচালি ও পালাগানের প্রতিবেশজাত বলতে পারি। প্রকরণগত সাদৃশ্য রয়েছে কবি ও কীর্তনের সঙ্গে। ব্যবহৃত সুরের আঙ্গিক লক্ষ করলে দেখা যায় রামায়ণ গানের সুর।

জারিগানের বিশেষ একটি অংশ ধুয়া জারি। এ গানের মধ্যে দোহারদের অংশগ্রহণে মূল গায়েনের গাওয়া অংশ ধুয়া ধরে গাওয়াকে অবলম্বন করে উৎপত্তি হয়েছে ধুয়া জারিগানের। এ গানের স্রষ্টা হিসেবে পাগলা কানাই বিশেষ ভাবে খ্যাত। ধুয়া জারি গানেও একইভাবে সমাজের কথা, তথা সাধারণ মানুষের জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে বারংবার। এ গানের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা ও শিল্পীরা হলেন– সোনাউল্লাহ, মোসলেম উদ্দিন, প্রফুল্ল গোঁসাই, মাছিম মোল্লা, তছির উদ্দিন সমধিক প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত জারি ও ধুয়া জারি গানের শিল্পী মনিরুদ্দিন মোড়ল সাক্ষাৎকালে জানান, "জারিগানের মতো এ গানও একজন বয়াতি উপস্থাপনের সাথে সাথে সকলে তাঁর সুরে ধুয়া ধরে গানের রেশ বৃদ্ধি করে থাকেন এবং সাথে হাত নেড়ে হালকা ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন। এর আঞ্চলিক শব্দ ধুয়োগান।" নিম্নে একটি ধুয়া জারি গানের অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো–

> ওলো ছোট বউলো ছোট বউ তোরে আমি বলি
>
> সব দুঃখ তোর ঘুচে যাবে আমার সাথে গেলি-লো ছোট বউ
>
> কার জন্যে দাঁড়াইছো রাজ পথে?
>
> ছোট বউলো ছোট বউ তোর কপাল দেখি খালি–
>
> সোনার টিকলি গড়ে দেব আমার সাথে গেলি॥(শামসুজ্জামান, ২০১৩ : ১২৭)

কর্ম সংগীত হিসেবেও এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সর্বসাধারণের কাছে। এমনি ভাবে কর্মের মধ্যে সকলে সমস্বরে ধুয়া ধরে এ গান পরিবেশন করে থাকেন তাদের কর্মের উদ্দীপনার লক্ষে।

> হারমোনিয়াম, ঢোল, করতাল, কাঁসি, বাঁশি, কর্নেট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র জারিগানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে মূল বয়াতি গানের সাথে নিজে একটি কাঠের দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন, যাকে খঞ্জরী বলে। এটি জারিগানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। দোহারগণ এ গানের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও দলের চাহিদা-সামর্থ অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে আলাদা যন্ত্রশিল্পী রাখা হয়ে থাকে। (সাক্ষাৎকার: জামিরুল)

> জারিগান পরিবেশনের জন্য আসর তৈরি করা হয় চারিধার খোলা উন্মুক্ত মঞ্চে। মঞ্চের চারপাশে শ্রোতারা বেষ্টন করে বসেন। রাতের আসর হারিকেন জ্বালিয়ে, সম্ভব হলে হ্যাজাগ লাইট দিয়ে আলোকিত করা হয়ে থাকে। আসর ছোট হলে বাড়ির উঠান কিংবা ধান মাড়াইয়ের খোলেন এবং আসর বড় হলে খেলার মাঠ বা বটতলা ও হাট খোলা বিশেষ স্থানে এ গানের আয়োজন করা হয়। সাধারণত উন্মুক্ত আকাশের নিচে সামিয়ানা খাটিয়ে উপরে ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রোতাদের বসার জন্য নিচে বেদেপাটি, কোথাও আবার নাড়া, পাটের চট পেতে উপরে কাপড় বিছিয়ে ব্যবস্থা করা হয়। (সাক্ষাৎকার: মতলেব)

আদিতে এ গান পরিবেশিত হতো মাঠে কর্মসংগীত হিসেবে পরবর্তীতে তা উঠে এসেছে মঞ্চে সাধারণ মানুষের মাঝে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে। এজন্য ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বয়াতি রচনা করেছেন–

আগে জারি ছিল ঘাটে আর মাঠে

এখন সেই সব হয়ে থাকে সুন্দর খাটে॥

গানের কথায় ও সুরে শ্রোতারা সম্মোহিত হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে আনন্দে জয়ধ্বনি করে ওঠেন। গভীর রাত কিংবা সারারাত ধরে গানের আসর চলতে থাকে। মুগ্ধ শ্রোতারা আপ্লুত হয়ে অনেকে শিল্পীদেরকে পুরস্কৃত করেন। বর্তমান সময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ গানের বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। গ্রামাঞ্চলেও এখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। শ্রোতারা এখন এ ধারার গানের কোন আয়োজন করেন না, যার ফলে শিল্পীরা উৎসাহ হারাতে বসেছে। নতুন করে এ গানের শিল্পী সৃষ্টি হচ্ছে না, কারণ শ্রোতার অভাব। সরকারি ভাবে উদ্যোগী ব্যবস্থাপনা না থাকলে একদিন হয়তো চিরতরে এ গানের বিলুপ্তি ঘটবে।

যশোর অঞ্চলের ধুয়াজারি গানের গায়ক হিসেবে মনিরুদ্দিন মোড়লের নাম বিশেষ উলেখযোগ্য। গায়ক এবং বিচ্ছেদী গান রচয়িতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর সংগীত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা এবং রচনা শক্তি ছিল আকর্ষণীয়। যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার অন্তর্গত গাঙড়া গ্রাম। মনিরামপুর বাজারের প্রায় ১২ কি:মি: পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই গ্রামে ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট জারি বয়াতি মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল। পিতা- মোঃ রহিম বক্স মোড়ল, মাতা- মুছাঃ আমেনা খাতুন। পেশা-কৃষি। শিক্ষাজীবন শুরু হয় জালঝাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খুবই মেধাবি ছাত্র ছিলেন মনিরুদ্দিন। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিলো তাঁর। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অভাবগ্রস্থ পরিবারের মুখে অন্ন যোগাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পাসের পর লেখাপড়ার পাঠ চুকে যায় অতি অল্প বয়সে। ১৯৬৬ সালে যশোর জেলার কোতয়ালী থানাধীন খলসীডাঙ্গা গ্রামের মোঃ জুনাব আলী গাজী এবং খায়রুন্নেছার কন্যা মুছাঃ জোহরা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। স্ত্রী ও সাত সন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। সন্তানরা–

ছেলে: ১. মোঃ বাবলু মোড়ল, ২. মোঃ মুকুল মোড়ল, ৩. মোঃ মিলন মোড়ল।

মেয়ে: ১. সখিনা খাতুন, ২. নার্গিস আক্তার, ৩. নূরনাহার, ৪. শামসুননাহার।

তিনি মানুষকে আর মানুষের কণ্ঠকে ভালোবাসেন। মন তাঁর সংগীতাসক্ত। সুর ও ছন্দের আবেগে তিনি হয়ে উঠেন ভাবের পাগল, গানের পাগল। ১৮ বছর বয়সে সংগীত জীবনের পথচলা শুরু করেন তিনি। জীবন পথে চার জন গুরুর কাছে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সংগীতের প্রথম হাতেখড়ি ফরিদপুর নিবাসী মোঃ শাহ্জাহান পাটোয়ারীর নিকট। এর পর একে একে শিক্ষাগ্রহণ করেন– ১. মোঃ মুমতাজ আলী গাজী, গ্রাম: হেটোরি, মনিরামপুর; ২. মোঃ আব্দুস সামাদ, ভারত; ৩. মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, গ্রাম: দেলোয়াবাড়ি, মনিরামপুর। এঁরা আজ আর কেউ পৃথিবীতে নেই। তবে তাঁদের শিক্ষা আজো রয়ে গেছে মনিরুদ্দিনের মাঝে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সারা পৃথিবী নিমজ্জিত, তাই জারিগানের মতো এমন গ্রাম্য সংগীতের প্রতি অনাগ্রহ থাকায় কোন শিষ্য তৈরি করতে পারেননি তিনি। সন্তানদেরও কারো এই সংগীতের সাথে সম্পৃক্ততা নেই।

যশোর অঞ্চলে তখন জারিগানের প্রচলন ছিল খুব বেশি। মনিরুদ্দিন আসক্ত হন জারিগানে এবং গাঙড়া গ্রামে একটি জারিগানের দল গঠন করেন। গায়ক ও বয়াতি হিসেবে এ সময় তাঁর সুনাম বেশ ছড়িয়ে পড়ে। আকর্ষণীয় চেহারা ও সুমধুর কণ্ঠ তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। পাগলা কানাই, ইদু বিশ্বাস, সুলতান মোল্ল্যা, বিজয় সরকার, অনাদী বৈরাগী, নারায়ণ ফকির প্রমুখ বয়াতির অনেক গান তাঁর কণ্ঠস্থ। তাঁদের গান তিনি বেশি গাইতেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি জারিগান পরিবেশন করেছেন এবং পুরষ্কৃত হয়েছেন অনেক মঞ্চে। উল্লেখযোগ্য– বারান্দী ফকির মেলা, ঝালকাঠি ফকির মেলা, মনোহরপুর ফকির মেলা প্রভৃতি। শ্রোতাদের চাহিদা মত গেয়েছেন বিভিন্ন জারিপালা তার মধ্যে– নারী-পুরুষ, শরিয়ত-মারফত, হিন্দু-মুসলমান এমন।

জারিপালায় উভয় পক্ষের বয়াতি-ই–তার শিক্ষা, জ্ঞান, মেধা উপস্থাপন এবং প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা অপরকে পরাজিত করার প্রতিযোগিতায় সবিশেষ চেষ্টা করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ: পুরুষ বনাম নারী বিষয়ক কোনো পালায় পুরুষের পক্ষের বয়াতি হয়তো পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বলতে চাইলেন–

আদির আদিত্যে আদম

সৃষ্টি করেছে দয়াময়

বাপকে ছোট বল কোন কথায়?

এর বিপক্ষ বয়াতি নারীর প্রশংসা সূচক উক্তি করতে গিয়ে হয়তো বললেন–

নারীর বক্ষে আছে সুধা

খেয়ে বাঁচ সব জনা

মাকে কেউ নিন্দা কর না।

এভাবেই পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক, গানের পাশাপাশি ধুয়া, নৃত্য প্রভৃতিও চলতে থাকে এক একটি জারিগানের আসরে। (শামসুজ্জামান, ২০১৪ : ১৪৫)

মনিরুদ্দিনের সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন– ১. মীর আলী (গাঙড়া), ২. আব্দুল হানেফ আলী (বিজয়রামপুর), ৩. আব্দুল সুকুর আলী (সাতগাতি), ৪. জব্বার আলী (শুলাকুড়), ৫. ঢোল বাদক অনিল দেবনাথ (মুজগুণী), ৬. হারমোনিয়াম বাদক মোঃ শামসুর (চালকিডাঙা), এ সকল সহযোগীরা সবাই পরলোকের বাসিন্দা।

যাঁদের সাথে জারিপালা গেয়েছেন– ১. নূর আলী, ২. জায়রা খাতুন, ৩. আবুল কাশেম, ৪. মোঃ সামাদ, ৫. আজগর হোসেন, ৬. ইউসূপ আলী, ৭. বিবি হাসিনা, ৮. নার্গিস।

আসর জমানোর গানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন পালা গানের মধ্যে মাঝে মাঝে ছুটগান হিসেবে আমরা বিচ্ছেদী গান পরিবেশন করতাম। বিশেষ করে– বিজয় সরকার, অনাদী বৈরাগী ও নারায়ণ ফকিরের গান। এছাড়াও অনেক সময় ভাটিয়ালী, মুর্শিদী গানও গাইতে হতো।

মনিরুদ্দিনের নিজের রচিত একটি বিচ্ছেদী গান–

আর কত দিন থাকবিরে মন
পরের বাড়ি, পরের ঘরে।
তোর নাড়ার ছাউনি গেছে উঠে
তাতে ঝরঝরায়ে বৃষ্টি পড়ে ॥
ঘরের বাঁধন-ছাদন হয়েছে ঢিল
নড়ে গেছে তোর দরজার খিল
করতালি দেয় আজরাইল
দিন পঞ্জিকা ধরে।
তোর বিবেক বন্ধু দিচ্ছে সাড়া
খাস জবানে ডাক না তারে ॥
ডুয়া-মাটি তোর নুনা ধরা
রঙ্গিন করছো ঘরের বেড়া
চটাপাতা ধরেছে ঘুণে
ঘরের খুঁটি গেছে নড়ে।
কাল বৈশাখী ঝড় এসে
ভিটে ছাড়া করবে তোরে
পরের বাড়ি পরের ঘরে ॥
মনিরুদ্দি বলে তোরে
সময় থাকতে তল্পি তুলে

গাড়ি আসবার সময় হলো
নাওনারে টিকিট কেটে।
তাই মনের কথা বলবো কারে
সময় থাকতে মন নাও না চিনে
পরের বাড়ি পরের ঘরে ॥

গ্রন্থপঞ্জি

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*– যশোর জেলা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৪

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*– নড়াইল, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৩

সুরঞ্জন রায়, *মোসলেমউদ্দিন বয়াতির জারি গান লোকধারার পারম্পর্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৩

সাক্ষাৎকার: মোঃ মনিরুদ্দিন মোড়ল, মনিরামপুর, যশোর,তারিখ : ২৪-০৬-২০১৬

সাক্ষাৎকার: মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি, ঝিনাইদহ, তারিখ : ১৭-১২-২০১৭

সাক্ষাৎকার: মোঃ জামিরুল ইসলাম বয়াতী, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঝিনাইদহ জেলা বাউল সমিতি, ঝিনাইদহ

তারিখ : ১৮-১২-২০১৭

সাক্ষাৎকার: মতলেব ফকির, কালেক্ট্রি মার্কেট মাঠ, যশোর , তারিখ ১৮-১২-২০১৭
টীকা: মনিরুদ্দিন মোড়লের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিরিখে।

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের হিন্দু দেবদেবী প্রসঙ্গ

কালিদাস ভক্ত *

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর মধ্যে মহাস্থানগড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম পুণ্ড্রনগড়। বর্তমানে স্থানটি বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সমৃদ্ধিশালী নগরী হিসেবে এর খ্যাতি ছিল। প্রাচীনকালে মহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল। ধারাবাহিকভাবে এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের নৃপতিরা প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও বিশ্বব্যাপী এই স্থানটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটকেরা এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন এবং এ নগরী সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। এখনও মহাস্থানগড়ের চারপাশে প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক স্থাপনা রয়েছে। এথেকে বোঝা যায় সমগ্র অঞ্চল শহরকেন্দ্রিক ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে, মন্দিরে মন্দিরে ও ঘরে ঘরে নানাধরনের প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে, সেগুলো সংগ্রহ করে মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রত্নসম্পদের মধ্যে অনেক ভাস্কর্য রয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য অত্যন্ত নান্দনিক ও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য সম্পর্কে আলাদাভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও ক্যাপশনে বিস্তারিত বর্ণনা নেই। এই দেবদেবীর ভূমিকা এবং এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যয়ন। আলোচ্য প্রবন্ধে মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর গুরুত্ব এবং ভাস্কর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া

* ড. কালিদাস ভক্ত, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর ধর্মীয় গুরুত্ব ছাড়াও এর শিল্প-নৈপুণ্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ও বর্তমান আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্যগুলোর বর্ণনা এবং প্রাচীন বাংলার উপর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই মহাস্থানগড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং হিন্দুধর্মে দেবদেবীর গুরুত্বের বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো –

মহাস্থানগড় বর্তমানে বগুড়া জেলার অন্তর্গত হলেও মহাস্থানগড় নামেই পৃথিবীব্যাপী সমধিক পরিচিত। এটি শুধু বগুড়া জেলাকেই বিখ্যাত করেছে তা নয়, সমগ্র বাংলাদেশকেই বিখ্যাত করেছে। তবে বগুড়া জেলারও অনেক প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা হিসেবে বগুড়া সর্বজনবিদিত। ষোড়শ শতকে সুলতান নাসির উদ্দিন বগুড়ার নামানুসারে জেলাটির নামকরণ করা হয়। বর্তমান এই বগুড়া শহর থেকে বারো কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। করোতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে চার দিকে উঁচু প্রাচীর বিশিষ্ট মহাস্থানগড়ের আয়তন ১৫১৫ মিটার থেকে ১৩৬৩ মিটার। ভূমিভাগ থেকে উচ্চতা ৫ মিটার, তবে কোনো কোনো স্থানে বুরুজের অংশে উচ্চতা ১০ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। বিশাল এই আয়তাকার ভূমিভাগে নানাধরনের স্থাপনা রয়েছে। শাহ্ সুলতান বল্‌খীর মাজার থেকে শুরু করে খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুণ্ড, জীয়তকুণ্ড, পরশুরামের বাড়ি, পুকুর, বৈরাগীর ভিটা, মন্দির, মঞ্চ, মুনির ঘোন, দুর্গ, শীলা দেবীর ঘাট, গোবিন্দ ভিটা প্রভৃতি। এর চারদিকেও নানা স্থাপনা রয়েছে। যেমন – গোকুল মেধ, নেতাই ধোপানীর পাট, পরশুরামের সভাবাটী, স্কন্দের ধাপ, গোপীনাথের ভিটা, ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি, মঙ্গলকোট, খামার ধাপ, কাঁচের আঙ্গিনা, বিহার গ্রাম, ভাসু বিহার প্রভৃতি। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা নিদর্শন রয়েছে। সেগুলো মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে বাংলা নামে কোনো অখণ্ড জনপদ ছিল না। সমগ্র বাংলাকে প্রধান সাতটি জনপদে বিভক্ত করা হয়। যেমন – পুণ্ড্র, বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্র, রাঢ়। বগুড়া পুণ্ড্র অঞ্চলের অন্তর্ভূত ছিল এবং সর্বপ্রাচীন জনপদ বলেও অনুমিত। উত্তর বাংলার প্রাচীন নামও পুণ্ড্র। পুণ্ড্র শব্দের অর্থ হলো – 'ইক্ষুভেদ অপর অর্থে দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ'[১]। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুণ্ড্র অর্থে একই মত পোষণ করে বলেছেন – 'পুণ্ড্র জাতি ও দেশ উভয় সংজ্ঞক শব্দ।[২]

বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর জেলা নিয়ে পুণ্ড্র জনপদ ব্যাপৃত ছিল। পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়। আর এ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ও রাজনীতির অনন্য ক্ষেত্র। পুণ্ড্র নগর যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল সেসম্পর্কে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন – *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ* এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, কলহণের *রাজতরঙ্গিণী* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ও বিখ্যাত নগর হিসেবে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শিলালিপি, লেখমালা, রাজকীয় অনুশাসনে পুণ্ড্র সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। এ অঞ্চলের গুরুত্ব প্রকাশ করে মনীষীগণ নানাধরনের মন্তব্য করেছেন –

ইতিহাসবিদ আর. সি. মজুমদারের মতে –

> The Digvijayasection of the Mahabharata place them to the east of Monghyr and associates them with the prince who ruled on the banks of the Kosi. This accords with the evidence of Gupta epigraphs and the records of the Chinese writers which agree in placing the territory of the Pundras –them styled Pundravardhana – in North Bengal.[3]

দীনেশ চন্দ্র সরকার পুণ্ড্র সম্পর্কে বলেন –

পাল সম্রাজ্যের অবনতির যুগে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল বাদে বাংলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশকে পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্র,অথবা পৌণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তির অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[4]

এছাড়াও বিভিন্ন তাম্রশাসনে পুণ্ড্র সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত গুপ্তযুগের দামোদরপুর তাম্রশাসনে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। তখন পুণ্ড্র ছিল বাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র। সমতট তার সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাষ্ট্র ছিল। 'দশম শতকে ধর্মপালের খালিমপুর তাম্র শাসনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্ড্র ছিল পাল সাম্রাজ্যের সুবিশাল নগর'। ১৯৩১ সালে মহাস্থানগড়ে ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া যায়। এ ব্রাহ্মীলিপিতে পুণ্ড্রনগরের বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনকালে প্রজাদের দুর্দিনে দানশীলতার পরিচয় মেলে। ষষ্ঠ শতকে পর্যটক উয়ান-চোয়াঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন পরিভ্রমণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং বাংলা ভ্রমণকালে পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন। তিনি গঙ্গা নদী পেরিয়ে পুন্নাফতনন বা পুণ্ড্রনগরে এসে পৌঁছেছিলেন। তখন এ অঞ্চল সমুদ্রের নিকটে, নিচু ও আর্দ্র ছিল।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ৫.৫ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রাজধানীর চিত্রও তিনি তুলে ধরেন। ১৮৮০ সালে স্যার আলেকজেন্ডার কানিংহাম মহাস্থানগড় পরিদর্শন করেন। তিনি এ স্থান সম্পর্কে বলেন –

It was a origianally surrounded by a broad ditch on the north, south and west sides and was no doubt protected by the Karotoya River on the east, as the low lands come right upto the foot of the rampart.[5]

প্রত্নতত্ত্ববিদ আ কা ম জাকারিয়া বলেন – এ পর্যন্ত অবিষ্কৃত নগরীগুলোর মধ্যে এটিকে সবচেয়ে প্রাচীন নগরী বলা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলিপি এবং গ্রন্থাদিতে বর্ণিত বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগরই বর্তমান কালে মহাস্থান নামে পরিচিত।[৬]

নাজিমুদ্দিন আহমেদের বর্ণনা মতে, পুণ্ড্রবর্ধন সমগ্রবাংলার প্রাচীন নগরী। প্রাচীন বহু সাহিত্যগ্রন্থ ও লিপিমালায় এর উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে এটি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্রই ছিল না বরং ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেরও অন্যতম কেন্দ্ররূপে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেছিল।[৭]

আলোচনার এই পর্বে হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো –

'দিব্' ধাতু থেকে দেবদেবী বা দেবতা শব্দটি এসেছে। দিব্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি বা জ্যোতির প্রকাশ। 'দেব' পুরুষ বাচক আর 'দেবী' স্ত্রী বাচক। ঈশ্বর যখন নিজের গুণের মাধ্যমে কোনো রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেন তখন তাঁকে দেবতা বলে। যেমন – সৃষ্টিকর্তা রূপে ব্রহ্মা। পালনকর্তা রূপে বিষ্ণু। ধ্বংসকর্তা রূপে শিব। এভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা জানা যায়। কারো কারো মতে তেত্রিশ কোটি নয় তেত্রিশ ধরনের দেবতা হিন্দুধর্মে উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা হয়েছে –

> *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ*-এর অনেক চরিত্র দেবদেবী হিসেবে পূজিত। ভক্তগণ মনের সকল অভিলাষ পূর্ণ করার প্রয়াসে মূর্তিতে যুগ যুগ ধরে পূজা করে আসছেন। হিন্দুধর্মে তিন প্রকার দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা – (১) বৈদিক দেবতা (২) পৌরাণিক দেবতা (৩) লৌকিক দেবতা। বেদে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁদের বৈদিক দেবতা বলে। যেমন – অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, ঊষা, অদিতি, রাত্রি প্রভৃতি। বৈদিক

দেবতাদের কোন মূর্তি ছিল না। দেবতাদের শরীর ছিল মন্ত্রময়। বেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা –(ক) স্বর্গের দেবতা (খ) অন্তরীক্ষের দেবতা (গ) মর্ত্যের দেবতা। যে দেবতারা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন তাঁরা স্বর্গের দেবতা, যেমন – সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি। স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা অন্তরীক্ষের দেবতা। যেমন – ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি। মর্ত্যে বা পৃথিবীতে যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা মর্ত্য লোকের দেবতা। যেমন – অগ্নি। পুরাণে যে সমস্ত দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন – ব্রহ্মা, শিব, গৌরী, সরস্বতী প্রভৃতি। পুরাণে বৈদিক দেবতাদের অনেকের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। পৌরাণিক যুগ থেকেই দেবতাদের বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। ধ্যানলব্ধ দেবতাদের তৈরি করা হয়েছে ধ্যানানুযায়ী মূর্তি। বেদের বিষ্ণু দেবতা পুরাণে বিভিন্ন অবতার হিসেবে শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্ম ধারী রূপে দেখা যায়। এছাড়াও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার কথা পুরাণে ও উল্লেখ রয়েছে। মন্ত্রে যেভাবে দেবদেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বেদে ও পুরাণে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন – মনসা, নন্দী, কন্যাকুমারী, শীতলা, ক্ষেত্রদেবতা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণে ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৮]

তবে মহাস্থানগড়ে যে সমস্ত দেবদেবীর ভাস্কর্য রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, যেমন – অগ্নি, সূর্য, গোপাল, বিষ্ণু, দাত্তাত্রেয়, হরগৌরী, অম্বিকা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দী, মনসা, অম্বিকা, নৈঋত, যোগিনী তারা, বরাহাবতার, কন্যাকুমারী, গড়ুর প্রভৃতি। এখানে বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক এই তিন শ্রেণির হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিই রয়েছে।

বিভিন্ন মনীষী এই মূর্তি তৈরির পেছনে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। দেবদেবী ও ভাস্কর্যের গুরুত্বের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে – দেবমানব স্বর্গ-মর্ত্য বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য, ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।[৯]

প্রত্নতত্ত্ববিদ মোঃ মোশারফ হোসেনের মতে – যুগ বিবর্তনের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতি বলয়ে উর্বরতা চর্চাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে হাজারো দর্শনের গ্রন্থন-মন্থন অব্যাহত ছিল। আর ঐসব দর্শনের আবহে লালিত করে এই মানুষেরা পালাক্রমে অগুণিত বৈচিত্র্যময় মূর্তি গড়েছে।[১০]

অপরপক্ষে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মনে করেন – সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই অধিকারভেদে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অনুসারে দেবমূর্তি গড়ে উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।[১১]

মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর পরিচিত, ধর্মে তাঁদের গুরুত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গ:

এখানে প্রথমেই মহাস্থান জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো –

প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গই পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ অঞ্চল। যেমন – বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ। তবে বিশেষ করে মহাস্থানগড় এবং এর চারপাশের স্থাপনা খননের ফলে নানা ধরনের প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ এবং জনগণের মাঝে প্রদর্শনের জন্য ১৯৬৭ সালে মহাস্থানগড়ের উঁচু এলাকায় 'মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাদুঘরটি মহাস্থানগড়ের দক্ষিণ সীমান্তে গোবিন্দের ভিটার সন্নিকটে অবস্থিত। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে মহাস্থানগড়কে ডানে রেখে পূর্বমুখী করে অবস্থিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তিন একর জায়গার উপর নির্মাণ করা হয় বর্তমানে বর্ধিত হয়ে দশ একরে সম্প্রসারিত হয়েছে। জাদুঘর ভবনটি ১৩৬মি.x২৩মি. x ৬১মি. পরিমাপের ৪৪টি সোকেজে দেয়ালের সাথে লাগানো ভাস্কর্যসহ প্রত্নসম্পদগুলো রয়েছে। প্রবেশদ্বারের বামদিক থেকে প্রদর্শিত একটি আধারে সোকেজ নম্বর এক থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমানুসারে চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রবেশদ্বারের ডানে দিকে গিয়ে মোট ৪৪ টি প্রদর্শনী শোকেজ দিয়ে শেষ হয়েছে। ৪৪ টি প্রদর্শিত শোকেজ বাইরেও মাঝে মাঝে কিছু অতি আকর্ষণীয় প্রত্নসম্পদও রয়েছে। তবে জাদুঘরে প্রদর্শিত মোট ৬৩টি ভাস্কর্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দেবদেবীর ভাস্কর্যসম্পর্কে আলোচনা করা হলো –

সূর্য

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অনেক ধর্মের লোকজন সূর্যের পূজা করত। ঋগ্বেদে সূর্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। জাদুঘরের প্রদর্শিত তথ্যানুসারে – সূর্য মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১২] সূর্য দেবতা অনেক নামে স্তুত হন। যেমন – বিবস্বান, সবিতা, আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, পূষা, অর্যমা, মাতরিশ্বা, উষা, ভগ, মিত্র প্রভৃতি । তিনি জগতের শক্তির উৎস এবং সমস্ত জীবের প্রাণ স্বরূপ। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, জ্যোতির প্রকাশক, চক্ষুস্বরূপ। চক্ষুস্বরূপ বলতে মহাবিশ্বের সকল কিছুর প্রকাশক। সূর্য দেবতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষলোকে বিরাজিত । *বেদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত ও পুরাণে* সূর্যের উল্লেখ আছে। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* অনুসারে সূর্যের পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতি, স্ত্রী বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা। তাঁদের বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামে তিন সন্তান। পুরাণানুসারে সূর্যের রূপের বৈশিষ্ট্য হলো – দুই হাত বিশিষ্ট, ঘোড়াটানা রথে ধাবমান, পায়ে বুটজুতো এবং দেহে রাজকীয় পোশাক পরিহিত। যুগে যুগে স্থানে স্থানে সূর্যের মূর্তিতে নানা রূপ দেখা যায় – 'গুপ্তপূর্ব যুগের নিদর্শনগুলোতে তাঁর গায়ে থাকত কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত ঝুলে থাকা কুর্তা। কিন্তু গুপ্ত আমল থেকে তাঁর বেশভূষার প্রকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে। গুপ্ত আমলে বুকে আড়াআড়িভাবে বেল্টসহ কোমরে ছোড়া বা তলোয়ার ঝুলে থাকতে দেখা যায়। তাঁর পায়ের দু'পাশে থাকে ভূদেবী মহাশ্বেতা বা পৃথিবী, ছায়া, সঙ্গা, নিক্ষুভা প্রভৃতি নামের স্ত্রী মূর্তি। এছাড়া বিভিন্ন যুগে সূর্যমূর্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।'[১৩] ভারতে বিশেষ করে উড়িষ্যা, গুজরাট, কর্নাটকে অনেক সূর্যমূর্তি ও মন্দির রয়েছে। আগের দিনের মতো সম্প্রতি সূর্যপূজা বহুলভাবে প্রচলিত নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে মারোয়ারি সম্প্রদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে সূর্যপূজা করে থাকেন। সূর্যের আলো ও উষ্ণতা প্রাণিকুলের জন্য বড়ই উপকারী। প্রতিদিন সকালে সূর্যকে প্রণাম করা নিত্যকর্মের অংশ।

চিত্র:সূর্য

অগ্নি

ঋগ্বেদ-এর অন্যতম প্রধান দেবতা অগ্নি। জাদুঘরের বর্ণনানুসারে – অগ্নি মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের তৈরি। ঐতিহাসিক স্থান মহাস্থানগড় খননের ফলে মূর্তিটি পাওয়া গেছে। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৪] অগ্নির বন্দনার মাধ্যমে ঋগ্বেদ আরম্ভ (১/১) এবং সমাপ্ত (১০/১৯১) হয়েছে। এখানে প্রায় ২০০ সূক্তে তাঁর স্তব করা হয়েছে। নিরুক্তকার যাস্ক অগ্নিকে মর্ত্যলোকের দেবতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর্যগণ প্রাচীন কাল থেকে অগ্নির উপাসনা করতেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অগ্নির ব্যবহার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আদিম যুগ থেকে অগ্নির ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির নানা বিপর্যয় ও হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নি ব্যবহার করত। সেই থেকে তারা মনে করত অগ্নিই তাদের আত্মরক্ষার মূল অবলম্বন। সেই ভাবনা থেকেই তারা অগ্নিদেবের পূজা করে আসছে। তাই পার্থিব জগতের দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। তিনি যজ্ঞের অগ্নিরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। বেদে অগ্নি হব্যবহ নামে পরিচিত। কেননা দেবতাদের উদ্দেশে যে আহুতি দেওয়া হয় তা

অগ্নিই গ্রহণ করেন। বিবাহের সময় অগ্নি কে সাক্ষী করে বিবাহ করা হয়। *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *পুরাণে* অগ্নি সম্পর্কে অনেক কাহিনি রয়েছে। অগ্নি – অনল, পাবক, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, সর্বভুক প্রভৃতি নামে পরিচিত।

চিত্র: অগ্নি

বিষ্ণু

সকল সৃষ্টির রক্ষাকর্তা বিষ্ণু। *ঋগ্বেদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* এবং পুরাণে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – বিষ্ণুর দু'টি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি খ্রিষ্টীয় একাদশ এবং দ্বিতীয়টি দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – প্রথমটি মহাস্থানগড় এবং দ্বিতীয়টি আদমদিঘী বগুড়া। মূর্তিদুটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৫] বিষ্ণুর পিতা কশ্যপ মাতা অদিতি। স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ভাগবতে তাঁর দশাবতারের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন – মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। তাঁর একমুখ ও চার হাত। চার হাতে চার ধরনের অস্ত্র দেখা

যায়। যেমন – শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, গদা, পদ্ম। প্রাচীন বিভিন্ন লিপিতে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বোঝা যায় তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছেন। সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য তিনি অসুরদের বিনাশ করে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পরিধানে থাকে –'ধুতি, মাথায় মুকুট ও বক্ষে কৌস্তুব। তাঁর বাহন গরুড়। *বৃহৎসংহিতার* বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বুকে থাকে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি। কাশ্মীর ও নেপালে চারমাথা চারহাত বিশিষ্ট বিষ্ণুর নিদর্শন আছে। আবার নেপালে দু'হাতবিশিষ্ট বিষ্ণুর অস্তিত্বও দেখা যায়।'[১৬] পুরাণানুসারে তিনি অসুরদের কাছ থেকে ত্রিপদভূমি গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বভুবণ পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়।

চিত্র: বিষ্ণু

গোপাল

মহাবতার শ্রীকৃষ্ণের বাল্য নাম গোপাল। তিনি মূলত বিষ্ণুর অবতার। জাদুঘরে প্রাপ্ত বর্ণনানুসারে – গোপালের মূর্তিত্রয় খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – বগুড়ার শিবগঞ্জ। মূর্তিত্রয় কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৭] শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ টি নামের মধ্যে আহ্লাদিনী গোপাল নামটি রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি আশ্চর্যজনক। মহাস্থান জাদুঘরে গোপালের তিনটি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি ও তৃতীয়টি ননীগোপাল, দ্বিতীয়টি বেনুগোপাল। তিনটি মূর্তিই রূপভেদে আলাদা।ভাগবতে তাঁর বাল্যলীলায় দেখা যায় এ রূপ অবলোকন করতে স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নারদাদি দেবতা উন্মুখ হয়ে গোকুলে চলে এসেছেন। এখানে বাৎসল্য রসের এক চমৎকার পরিস্ফুটন ঘটেছে। গোপাল বসুদেব ও দেবকীর গর্ভে মাতুলালয়ে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন পরে পিতা বসুদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মানব দেহ ধারণ করে দ্বিভুজ বিশিষ্ট হলেন। বাল্যকাল থেকেই গোপাল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিরত থেকেছেন। এ সময় পুতনা রাক্ষসী বধ, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ করতে দেখা যায়। এছাড়া গোপালনে ব্যাপৃত থেকে গোপ-গোপী ও সখাদের নিয়ে খেলার ছলে গোকুলে নানা ধরনের বাল্যলীলা-মাধুর্য প্রকাশ করেন।

চিত্র: গোপাল

দত্তাত্রেয়

পরমেশ্বর বিষ্ণুর আরেকটি বিশেষ রূপ হলো দত্তাত্রেয়। জাদুঘরের বর্ণনানুসারে – মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দশম শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – বগুড়া। এটি বগুড়া র‍্যাব বারো এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।[১৮] দত্তাত্রেয়ের পিতার নাম অত্রি আর মাতার নাম অনসূয়া। সতী-সাধ্বী অনসূয়ার গর্ভে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে আবির্ভূত হন। কাহিনি অনুসারে – কুশিকবংশে অত্রি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন। পরম সতী-সাধ্বী স্ত্রী অনেক কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে স্বামীর সেবা করতেন। একদিন স্বামী এক পতিতা নারীকে দেখে কমাসক্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্ত্রীকে অনুরোধ করেন সেই পতিতার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে কাঁধে নিয়ে সে পতিতার গৃহাভিমুখে চললেন। রাতের বেলায় অন্ধকারে যাওয়ার পথে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য মুনির গায়ে পদস্পর্শ হওয়ায় তিনি অভিশাপ দিলেন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তার স্বামীর মৃত্যু হবে। এই নিদারুণ অভিশাপ সতী-সাধ্বী স্ত্রী শোনার পর বললেন যেহেতু সূর্যোদয়ই আমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ তাই সূর্যোদয়ই হবে না। কেননা সতী-সাধ্বী স্ত্রীর বাক্য অভ্রান্ত। সূর্যালোকের অভাবে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় পৃথিবী ধ্বংসের পথে। তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা বললেন পতিব্রতের মাহাত্ম্যের জন্যই সূর্যের উদয় হয়নি। ব্রহ্মার পরামর্শে সকলে মিলে অনসূয়ার কাছে গেলেন। তাঁরা অনসূয়াকে সূর্যোদয়ের জন্য অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন। যদি সূর্যোদয়ের কারণে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় তবে পুনর্জীবন দান করে নতুন দেহসম্পন্ন করে দিবেন। অনসূয়া সব মেনে নিয়ে সূর্যোদয়ের অনুমতি দিলেন। তখন দেবতারা খুশি হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। তিনি বর প্রর্থনা করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে পুত্ররূপে পাবার। তখন অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন।

চিত্র: দত্তাত্রেয়

বরাহ

বরাহ বিষ্ণুর অবতার। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – বরাহ মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দশম শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৯] মানব দেহে বরাহের মাথা সংযুক্ত করে বরাহাবতারের মূর্তি নির্মাণ করা হয়। পুরাণানুসারে সৃষ্টির প্রথমে জগৎ যখন জলমগ্ন ছিল। জল প্রশমনের জন্য ব্রহ্মা যখন অত্যন্ত চিন্তিত হন। অন্তর্যামী ভগবান জগতের দুঃখ লাঘবের জন্য বরাহাবতাররূপে আবির্ভূত হলেন। এই সংবাদে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মুনি-ঋষিরা বরাহরূপী বিষ্ণুকে স্তুতি করতে থাকেন। সকল বিঘ্ন বিনাশী বরাহ রূপটি ব্রহ্মার নাশারন্ধ্র থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ নির্গত হয়ে আকাশে উত্থিত হয়ে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার রূপ ধারণ করেন। বরাহাবতারের হুংকারে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত হতে থাকে। ধ্যানরত মুনি-ঋষিরা জাগ্রত হয়ে আবার স্তব করতে থাকেন। তারপরে বরাহাবতার

ধাবমান হয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য জলের মধ্যে লুক্কায়িত দৈত্য হিরাণ্যাক্ষকে বধ করেন। পরে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে মানবের বসবাসের জন্য উপযোগি করে তোলেন।

চিত্র: বরাহাবতার

গড়ুর

গড়ুর বিষ্ণুর বাহন। ঋষি কশ্যপ ও বিনতার পুত্র গড়ুর। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – গড়ুর মূর্তিটি দশম-একাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[২০] গড়ুর পাখিদের রাজা। তার অপর নাম সুপর্ণ। কেননা তিনি ইন্দ্রকে একটি স্বর্ণময় পালক দিয়েছিলেন। *রামায়ণে* দেখা যায়, রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হলে, রাম উদ্ধারের জন্য গড়ুরকে স্মরণ করেন। গড়ুর নাগদের ভক্ষণ করে রাম-লক্ষ্মণকে মুক্ত করেন। *মহাভারত*-এর আদি পর্বে প্রথমেই দেখা যায়, কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে এক হাজার নাগ পুত্র হলো আর বিনতার গর্ভে মহাপরাক্রমশালী গরুড়ের জন্ম হলো।

গরুড় তার মায়ের দাসত্ব মোচনের জন্য নাগদের নির্দেশে অমৃত আনতে গমন করেন। পথে ক্ষুধা নিবারণের জন্য পিতা কশ্যপের কথানুসারে মহাগিরিতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন করে শক্তি অর্জন করে। পরে গরুড় স্বর্গের দেবতাদের পরাজিত করে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করে অমৃত এনে মায়ের দাসত্ব মোচন করেন।

চিত্রঃ গড়ুর

ব্রহ্মা

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তার নাম ব্রহ্মা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে তিনটি ব্রহ্মার মূর্তি রয়েছে। সবকটিই খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – প্রথমটি নওগাঁ,

দ্বিতীয়টি পাঁচবিবি জয়পুরহাট, তৃতীয়টি আদমদিঘি, বগুড়া।[২১] ব্রহ্মা থেকেই ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে। *রামায়ণে* ব্রহ্মাই বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করে জগৎকে রক্ষা করেছেন। *মহাভারতে* বলা হয়েছে – ব্রহ্মা সকল প্রাণীর নমস্য, তাঁকে অনেক নামে ডাকা হয়েছে। যেমন – অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, সকলের প্রাণ, অযোনিসম্ভব, জগন্নাথ, বেদের জনক, বিষ্ণু, নারায়ণ, উমাপতি, সাবিত্রীপতি, বিরূপাক্ষ, স্কন্দ-সেনাপতি প্রভৃতি। *পদ্মপুরাণে* ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মাকে সূর্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ* মতে ব্রহ্মাই নারায়ণ। তিনি মৎস্যাদি অবতাররূপও পরিগ্রহ করেছিলেন। *ধর্মসূত্রে* ব্রহ্মার পাঁচটি নাম। যেমন – ব্রহ্মা, চতুর্মুখ, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ ও সয়ম্ভূ। *গৃহ্যসূত্রে* ব্রহ্মার ছয়টি নাম। যেমন – ব্রহ্মা, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, স্থানু, শিব, শর্ব। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও বিভিন্ন বৈদিক দেবতার গুণ-কর্ম সম্মিলিত হয়ে আবির্ভাব ঘটেছে।ব্রহ্মা পূর্বে নিরাকার ছিলেন। পরে আবির্ভূত হলেন। দেবতাদের স্বরূপ বিচারে ব্রহ্মা সূর্যাগ্নির রূপভেদ। তিনি বিমল, স্বর্ণময়, সুন্দর, অগ্নিজ্বলিত শিখার মত উজ্জ্বল। সর্বদিক মুখবিশিষ্ট। তাঁর মুখে অগ্নি, দাঁতে যজ্ঞ, রোমরাজি তৃণের মত। তাঁর দীপ্তি জগৎ সংসারে ব্যাপৃত।তিনি এই পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে আকাশ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মেঘ-শিশির, প্রাণিবর্গ প্রভৃতি। সৃষ্টি ছাড়াও ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক। ব্রহ্মাকে ধাতা বা বিধাতা এবং সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। তিনি দেবতাদের গুরু। সকল দেবসত্তা ব্রহ্মাতেই একাকার হয়ে গেছে। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে এক, একে তিন। ব্রহ্মার স্বরূপ দিবালোকের মতই জাজ্বল্যমান। ব্রহ্মা দেবতা-দানব-মানবের গুরু-স্রষ্টা-পিতামহ।ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য প্রথমে তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঋষিরা বংশবিস্তারে মনোযোগ দিলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রথম নারী শতরূপা ও প্রথম পুরুষ সায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করলেন। মানুষ মনুর সন্তান বলে মানব নামে খ্যাত।

চিত্র: ব্রহ্মা

হরগৌরী

দেবাদিদেব মহাদেবের অনুরূপ হলেন হর। তিনি ভক্তদের দুঃখ-কষ্ট হরণ করেন। আবার অন্তিম সময়ে শিবরূপে তিনি বিনাশ করেন। ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবের পূজা করেন। আর গৌরী হলেন মহাদেবী দুর্গা ও পার্বতীর আরেক নাম। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – হরগৌরীর চারটি মূর্তি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – জয়পুর হাটের বিভিন্ন এলাকা। মূর্তিগুলো কালোপাথর ছেঁটে গড়া। ২২দানবদের দখলকৃত ত্রিপুর (স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী) ধ্বংসের জন্য দেবতাদের দেওয়া অর্ধেক তেজ ধারণ করে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান হন তখন তাঁর নাম হয় দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর অপর নাম রুদ্র। রুদ্ররূপে তিনি মহাকাল, ভয়ানক, হিংস্র। বস্তুত তিনি কল্যাণের দেবতা। বেদ ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ। তাঁর বাহন ষাঁড়। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব –এই ত্রিমূর্তির অন্যতম। তাঁর গায়ের রং শুভ্র। মাথায় জটা। ত্রিনয়ণধারী। কপালের মাঝখানে একটি চোখ রয়েছে। এটিকে জ্ঞান চোখ বলা হয়। আর মাথায় একটি বাঁকা চাঁদ রয়েছে। তাঁর হাতে থাকে ডমরু, শিঙ্গা এবং ত্রিশূল। গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। সর্প তাঁর গলার ভূষণ। তাঁকে

শম্ভু, ত্রিলোকেশ , পিনাকী, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নীলকণ্ঠ, শংকর ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। ২৩ আড়ম্বরপূর্ণভাবে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। আর গৌরী হলেন ব্রহ্মার মানস কন্যা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – গৌরী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়। পরবর্তী জন্মে তিনি হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভূত হন। তিনি মহাদেবের স্ত্রী। নক্ষত্রের জাজ্বল্যমান দীপ্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি গৌরীনামে খ্যাত। তাঁর বিভিন্ন নাম –আর্যা, উমা, শ্রী, ভবানী, রম্ভা, চিত্তরূপা, ত্রিপুরা, কন্যাকা প্রভৃতি। পুরাণে গৌরীর দুই হাত, চার হাত এবং দশ হাত বিশিষ্ট রূপে দেখা যায়। এই হাতে ভক্তদের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ধারণ করে থাকেন। যেমন – অভয়মুদ্রা, বরদমুদ্রা, জপমালা, পদ্ম, কমণ্ডলু প্রভৃতি। এই মূর্তির দুপাশে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নট-নটী দেখা যায়। নিচে পায়ের কাছে গোধিকা, সিংহ রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জাদুঘর ও মন্দিরে হরগৌরীর মূর্তি রয়েছে। কলকাতা জাদুঘরে গৌরীর দুহাত বিশিষ্ট মূর্তি রয়েছে। সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জে গৌরী মূর্তি পাওয়া গেছে। গৌরী মঙ্গলময়ী মাতৃরূপে ভক্তদের আরাধ্য।

চিত্র: হরগৌরী

অম্বিকা

দেবী দুর্গার আরেক নাম অম্বিকা। তবে এরূপে তাঁর গুণ-কর্ম-বিভাব আলাদা রয়েছে। তিনি আদ্যাশক্তি, দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রী। জাদুঘরে তথ্যানুসারে – মূর্তিটি একাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। মূর্তিটি বেলেপাথর ছেঁটে গড়া।[২৪] দেবী অম্বিকারূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভ এবং তাদের অনুচর চণ্ডী-মণ্ডী নামক দৈত্যদের নিধন করে ধরাধামে শান্তি স্থাপন করেছেন। এদের নিধনের ফলে দেবতাদের স্বর্গ রাজ্যও উদ্ধার হয়।তাঁর বাহন সিংহ। শ্বেতাশ্বতর সূত্র অনুসারে তিনি চার হাত বিশিষ্ট। তাঁর চার হাতে থাকে একগুচ্ছ আম, পাখির ঠোঁট, একটি শিশু এবং একটি লাঠি। দিগম্বর সূত্রে দেখা যায় তিনি দুই হাত বিশিষ্ট। এক হাতে থাকে আমের গুচ্ছ এবং আরেক হাতে থাকে শিশু ধরা। উড়িষ্যার পাটনা জাদুঘরে দুই হাত বিশিষ্টা অম্বিকার মূর্তি রয়েছে।

চিত্র: অম্বিকা

গণেশ

সিদ্ধিদাতা হিসেবে গণেশ সর্বজনবিদিত। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – এখানে গণেশের তিনটি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – আদমদীঘি, বগুড়া। দ্বিতীয়টি খ্রিষ্টীয় দশম শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। তৃতীয়টি খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়।[২৫] প্রথম ও দ্বিতীয় মূর্তিটি নৃত্যরত গণেশ। তৃতীয় মূর্তিটি সাবলীলভাবে অবস্থানরত।*বেদ*, *মহাভারত*, *পুরাণে* তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। *বেদে* তাঁকে গণেশ্বর বলা হয়েছে। *মহাভারতে* গণেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ব্যাসদেবের সর্বপ্রথম কলমধারী তথা লিপিকর হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে গণেশ শিব ও পার্বতীর পুত্র। তবে এখানে বিষ্ণুর বরে তাঁর জন্মের বিবরণও পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁর দ্বাদশ নামের উল্লেখ আছে। যেমন – **একদন্ত, সুমুখ, কপিল, গজকর্ণ, বিঘ্ননাশক, বিনায়ক, গজানন, গণপতি প্রভৃতি**। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর চব্বিশটি রূপের উল্লেখ আছে। গণেশের রূপের বৈশিষ্ট্য হলো – স্বাস্থ্যবান, খর্বকায়, ত্রিনয়নধারী, হাতির মতো মাথাযুক্ত, অর্ধবৃত্তাকার উত্তল পেট, সাপের কোমর বন্ধ, চার হাত, এক হাতে চক্র, একহাতে শঙ্খ, এক হাতে গদা, অপর হাতে পদ্ম প্রভৃতি। তাঁর বাহন ইঁদুর।[২৬] তিনি গুণ শ্রেষ্ঠ। শনি দেবতার অভিশাপে তাঁর নরমস্তক ছিন্ন হয়। পরে বিষ্ণুর কৃপায় হাতির মস্তক যুক্ত করা হয়। ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে গণেশ দেবতা প্রিয়। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে অতি আড়ম্বরপূর্ণভাবে গণেশের পূজা করা হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গেও গণেশ দেবতার পূজা হয়ে থাকে।

চিত্র: গণেশ

লক্ষ্মী

ঋগ্বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবতা হিসেবে লক্ষ্মী দেবী পরিচিত। জাদুঘরের প্রদর্শিত তথ্যানুসারে – এখানে দুটি লক্ষ্মীর মূর্তি রয়েছে। প্রথম মূর্তিটি গজলক্ষ্মীর। এটি হালকা ধূসর পাথরে (প্রস্তর) তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – নামুজা, বগুড়া। দ্বিতীয় মূর্তিটি সাধারণ লক্ষ্মী। হাতে চামর ধরা। এটি খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – ঈশ্বরদী, পাবনা। দুটি হস্তীর শুঁর বিশিষ্ট মূর্তি গজলক্ষ্মী। [২৭]লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবী হিসেবে স্বীকৃত। তিনি অতুলনীয় সুন্দরী, গৌরবর্ণা। তাঁর দুটি হাত। ডান হাতে পদ্ম ফুল। বাম হাতে শস্যের ছড়া। বাঁ কোলে ধন-সম্পদের পাত্র। লক্ষ্মী দেবী সর্ব প্রকার অলংকারে ভূষিত। মাথায় সোনার মুকুট। তিনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্ট। পুরাণে লক্ষ্মী দেবীর আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, লক্ষ্মী দেবীর চার হাত। তাঁর এক হাতে পাশ (দড়ির ফাঁস) ও অক্ষমালা। আরেক হাতে পদ্মফুল ও অঙ্কুশ (হাতি-চালনার দণ্ড)। একটি হাতে স্বর্ণপদ্ম। ডান হাত তুলে তিনি ভক্তকে দান করছেন বর ও অভয়। তাঁর বাহন লক্ষ্মী পেঁচা। তিনি ধন-সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন। পুরাণানুসারে দেবতা ও দৈত্যেরা মিলে

একবার সমুদ্র মন্থন করেন। সেই সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। পুরাণে লক্ষ্মীকে নারায়ণের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্মী পূজায় ঘণ্টা বাদ্য নিষিদ্ধ। লক্ষ্মী দেবীর পূজা নিত্যপূজা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ও রাতে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে আড়ম্বরপূর্ণভাবে পূজা করা হয়। এ পূর্ণিমাকে লক্ষ্মীপূর্ণিমা বা গোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। দুর্গাপূজার সময়ও লক্ষ্মী পূজা করা হয়। তিনি কল্যাণময়ী, শুভফল প্রদায়িনী। সর্বপ্রকারে রক্ষাকারিণী। লক্ষ্মী দেবী ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেন। তিনি শুধু পার্থিব ধন-সম্পদই দান করেন না, তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরের বিরাটত্ব, মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র সম্ভবা অর্থাৎ তিনি সমুদ্র জাতা। ভাগবতে লক্ষ্মী দেবীকে 'জীবনোপায়রূপিণী' বলা হয়েছে। লক্ষ্মী দেবী সর্বজীবের জীবন ধারণের জন্য জীবিকার উপায় করে দেন। লক্ষ্মী দেবীর শান্ত ও সৌম্য রূপ মনে শ্রদ্ধা ও প্রশান্তি জাগিয়ে তোলেন। তাই শান্ত-সুন্দর কোনো মেয়েকে 'লক্ষ্মী মেয়ে' বলা হয়। ধর্মগ্রন্থে লক্ষ্মী দেবী নিজেই বলেছেন – ঈশ্বর, পিতা-মাতা, গুরু, অতিথিকে যে বাড়িতে শ্রদ্ধা করা হয় না সে বাড়িতে তিনি কখনও প্রবেশ করেন না। এছাড়া যে বাড়িতে ঝগরাটে, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন এবং যারা নেই নেই বলে হাহাকার করে এমন লোকের বাড়িতে তিনি যান না। লক্ষ্মী দেবী সন্তুষ্ট হলে জীবন সমৃদ্ধ হয়। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীর প্রতিমা গড়ে পূজা করেন। বাংলাদেশে তিথি অনুসারে মেয়েরা লক্ষ্মী পূজা করে থাকেন।

চিত্র: লক্ষ্মী

সরস্বতী

ঈশ্বর যে শক্তিরূপে জ্ঞানকে প্রকাশ করেন, তাঁর নামই দেবী সরস্বতী। সরস্বতী জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী নদীস্বরূপা ও জ্যোতিস্বরূপা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – সরস্বতী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – আদমদীঘি, বগুড়া। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া। [২৮]বেদে সরস্বতী দেবীর উল্লেখ আছে। বৈদিক সভ্যতা সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বলে এই দেবীর মাহাত্ম্য অনেক। সেখানে তিনি নদী স্বরূপা। নদী ও দেবী রূপে তাঁর নামকরণ করা হয়েছে। পুরাণে সরস্বতী দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সরস্বতী সঙ্গীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টিশীল বা সুকুমার শিল্প এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দেবী। তিনি সকল প্রকার জ্ঞানদান করেন। সরস্বতী দেবীর গায়ের রং শুক্ল বা শুভ্র। চন্দ্রের মত শোভা তাঁর। শুক্ল তাঁর বসন। সরস্বতী দেবী শ্বেত পদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর হাতে থাকে পুস্তক ও বীণা। বীণা হাতে থাকে বলে সরস্বতী দেবীর আরেক নাম বীণাপাণি। তাঁর বাহন শ্বেতহংস। সবকিছু মিলে সরস্বতী দেবী সর্বশুক্লা। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। তাই এ তিথিকে শ্রীপঞ্চমী তিথি বলা হয়। দুর্গাপূজার সময়ও সরস্বতী পূজা করা হয়। পুরাণে

সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণিত। সরস্বতী বিশেষভাবে বিদ্যার্থীদের উপাস্য দেবী। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা করা হয়। শিল্পকলার দেবীরূপে সরস্বতী কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, নৃত্য শিল্পীসহ কলাকারদের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। সরস্বতী সর্বশুক্লা, সুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক। তাই যে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকেও মনে-প্রাণে শুদ্ধ ও পবিত্র হতে হবে। নইলে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস। রাজহাঁসকে জল আর দুধ মিশিয়ে দিলে দুধ গ্রহণ করে জল ত্যাগ করে। জ্ঞানী তেমনি জ্ঞানের জগৎ থেকে অসার বস্তু বাদ দিয়ে সার গ্রহণ করেন। সরস্বতী দেবীকে বলা হয়েছে 'জাড্যাপহা'। জাড্য মানে জড়তা। এখানে জাড্য মানে মূর্খতা। অপহা মানে বিনাশকারিণী। সরস্বতী দেবী মূর্খতা দূর করে মন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন। পুরাণে সরস্বতী দেবীর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্যের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অনেক সাধারণ ও মূর্খ ব্যক্তি সরস্বতীর কৃপা লাভ করে বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক হয়েছেন।

চিত্র:সরস্বতী

কার্তিক

কার্তিক হলেন সুদর্শন, দেবসেনাপতি। দুর্গাপূজার সময় দেবীর বাম পাশে ধনুর্ধারী রূপে দেখা যায়। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বতীর বীর পুত্র। তাঁর স্ত্রী বল্লী ও দেবসেনা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – কার্তিক মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাদেবপুর, নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া। [২৯]এটি মুখ থেকে ঊর্ধ্বাংশ ভঙ্গুর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। *মহাভারত* অনুসারে কার্তিকের ছয়টি মাথা, একটি গ্রীবা, একটি উদর। তাঁর বাহন ময়ূর। হাতে তীর ও ধনুক। *পুরাণ* অনুসারে একটি মাথা, দুটি হাত। এক হাতে অভয়মুদ্রা অপর হাতে শক্তি ধারণ করেন। তাঁর দেহে থাকে বীরত্বপূর্ণ ভাবব্যঞ্জনা এবং যৌবনের উচ্ছ্বাস। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে পার্বতীর সাথে বিহারকালে মহাদেব তেজ ধারণ করতে না পারায় পৃথিবীতে পতিত হয়। আবার পৃথিবীও ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নিও সহ্য করতে না পেরে হিমালয়ের পাদদেশে শরবনে পরিত্যাগ করেন। শরবনে এই বীর্য থেকে একটি তেজীয়ান বালকের জন্ম হয়। এই বালকই কার্তিক। পরবর্তীতে পার্বতী এ বিষয় অবগত হয়ে পুত্র স্নেহে লালন-পালন করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে কার্তিকের বারোটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন – সুব্রাহ্মণ্য, শক্তিধর, সেনাপতি-মিথুন, দেবসেনাপতি, কুমার, সংমুখ, তারকারি, সনৎকুমার, বিশাখা প্রভৃতি। অন্য কাহিনিতে বলা হয়েছে তিনি ছয় কৃত্তিকার সন্তান তাই শরানন। সন্তানহীন মায়েরা সন্তান লাভার্থে কার্তিক দেবতার পূজা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ পুত্র সন্তান কামনায় কার্তিকের পূজা করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্যদেব ও কুমাররূপে (অবিবাহিত) কার্তিক পূজিত হন।

চিত্র: কার্তিক

নন্দী

নন্দী দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন। আকৃতিষাঁড়ের মতো। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – নন্দী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাদেবপুর, নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[৩০] পিতার নাম শিলাদ মুনি। স্ত্রীর নাম সূয়শা। তাঁর অন্য নাম নন্দীশ্বর। নন্দীর রূপের বৈশিষ্ট্য হলো – করালদর্শন, বামন, বিকটাকার, মুণ্ডিত মস্তক, ক্ষুদ্রবাহু, মহাবল। নন্দী মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক। বাল্যাবস্থা থেকেই নন্দী অন্তিম পর্যন্ত মহাদেবের অর্চনা করে তাঁর গণমধ্যে গণ্য হন। [৩১] শিবপুরাণানুসারে মহর্ষি শিলাদ ছিলেন শিবের এক নিষ্ঠাবান ভক্ত, কিন্তু তিনি ছিলেন পুত্রহীন। সেকারণে তাঁর পিতৃপুরুষ স্বর্গলাভ করতে পারেনি। তাই তিনি শিবের তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে যজ্ঞ করার জন্য হল কর্ষণ করেন। তখন শিবের আশীর্বাদে হল কর্ষণের সময় ক্ষেত থেকে নন্দীর আকৃতির অযোনিসম্ভব এক পুত্র বের হয়ে আসে। পিতা শিলাদ নন্দীর ভাগ্য গণনা করে জানতে পারেন ইনি হবেন শিবেরভক্ত। *রামায়ণ*-এর কাহিনি অনুসারে, রাবণকে একদিন নন্দীবনের মধ্যে ঢুকতে নিষেধ করেন। কারণ সেখানে তখন হর-গৌরী বিহার করছেন। রাবণ

তখন অপমানিত বোধ করে তাঁকে তাচ্ছিল্য করেন। নন্দী অভিশাপ দেন আমার আকৃতি বিশিষ্ট বানরেরাই তোমাকে হত্যা করবে। এই অভিশাপের ফলেই একদিন রাবণ বংশ ধ্বংস হলো। মহাদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সুয়শার সাথে নন্দীর বিবাহ দেন। প্রায় সব শিব মন্দিরে মহাদেবের মূর্তির সাথে নন্দীর মূর্তি দেখা যায়। বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুরসহ বেশিরভাগ জাদুঘরে নন্দী মূর্তি রয়েছে। তবে মহাস্থানগড়ের এই মূর্তিটি বেশ নান্দনিক। ভারতে কর্ণাটকের চামুণ্ডী মন্দিরে এবং তামিলনাড়ুর ইসাযোগ মন্দিরে নন্দীর মূর্তি রয়েছে।

চিত্রঃ নন্দী

মনসা

মনসা সর্পকুলের দেবী। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – মনসা মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাদেবপুর, নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[৩২] সর্প দংশনের হাত থেকে প্রতিকার পেতে, রোগ নিরাময়ে এবং ঐশ্বর্য লাভের ক্ষেত্রে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। তাঁকে কেউ কৃষির দেবীও বলেছেন। মনসা শিব-পার্বতীর কন্যা। আবার কোনো গ্রন্থে তাঁকে কশ্যপের কন্যা বলা হয়েছে।

বেদে মনসার উল্লেখ নেই। পুরাণে দেবীর সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা রয়েছে। পুরাণানুসারে তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী, আস্তিক্য মুনির মাতা, নাগরাজ বাসুকির বোন হিসেবে পরিচিত। তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বিষহরী, জগৎগৌরী, শৈবী, বৈষ্ণবী, মাগেশ্বরী, নাগেশ্বরী, সিদ্ধযোগিনী, পদ্মাবতী।'এই দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের কন্যা তাই শৈবী ; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী ; নাগদের প্রাণরক্ষা করে ছিলেন বলে নাগেশ্বরী ; সর্পভয় দূর করেন, তাই তিনি বিষহরী ; মহাদেবের কাছ হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানস কন্যা বলে মনসা। তাঁর মাথার উপর সাধারণত থাকে সপ্তবাসুকি অথবা ত্রয়ীবাসুকি। [৩৩]এখানে মনসা দেবীর মাথার উপরে রয়েছে সপ্তবাসুকি। পায়ের নিচে জলের ঘট। দুহাত বিশিষ্টমূর্তিতে বাম হাতে সর্পও ডান হাতে শিশু রয়েছে। তবে মূর্তিটির মুখমণ্ডল ভঙ্গুর বাংলাদেশের বরিশালে আগৈলঝাড়ায় মনসা মঙ্গলের রচয়িতা বিজয় গুপ্তের বাড়িতে পিতলের বড় মনসা মূর্তি দেখা যায়। কলকাতার জাতীয় জাদুঘরে ও বীরভূমে এবং ব্রিটিশ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় মনসার মূর্তি রয়েছে।

চিত্র: মনসা

নৈঋত

আটটি দিকের মধ্যে নৈঋত একটি। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – নৈঋত মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[৩৪] জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিদেবতা নৈঋত। এই দেবতা সংসারের স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব-কর্তব্য প্রভৃতি প্রতিপালনীয় বিষয়কে প্রভাবিত করেন। নৈঋতের বাহন ভূত বা মৃত দেহ। তাঁর এক মাথা, দুই হাত। এক হাতে গদা অপর হাতে ধনুক। তাঁর পোশাক বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর বাহন ভালুক ও হাতে গদা থাকার কথা উল্লেখ আছে।

চিত্র: নৈঋত

যোগিনী তারা

দেবী যোগিনী দুর্গা বা পার্বতীর সহচরী। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – যোগিনী মূর্তিটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট। মূর্তিটি ধূসর বর্ণের পাথর ছেঁটে গড়া। [৩৫]পৌরাণিক শাস্ত্রে চৌষট্টি যোগিনীর উল্লেখ আছে।যেমন – জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী প্রভৃতি। যোগিনীরা দেবী দুর্গার নির্দেশ পালনকারী ও সাহায্যকারী। দুর্গা পূজার সময় যোগিনীদের পূজা করা হয়। অঞ্জলি প্রদান কালে যোগিনীদের নাম উল্লেখ করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে যোগিনী চক্র রয়েছে। যেমন – প্রতিপদ নবমীতে পূর্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্থীতে পশ্চিমে, পূর্ণিমাতে বায়ু কোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশান কোণে যোগিনী বিরাজ করেন। সাধারণত এসময় যাত্রা অমঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস করা হয়।

চিত্রঃ যোগিনী তারা

কন্যাকুমারী

দেবী পার্বতীর আরেক রূপ কন্যাকুমারী। জাদুঘরের বর্ণনানুসারে – মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – তাড়াস, সিরাজগঞ্জ।[৩৬]দক্ষিণ ভারতে বহুপূর্ব থেকেই কন্যাকুমারীরূপে দেবীর পূজা করা হয়। আবার কেউ কেউ দেবী কুমারী বলেও স্তুতি করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় ভাষায় তাঁকে আম্মান নামে ডাকা হয়। দেবী রূপে অপরূপা। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে বিয়ে করেন। ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মিলন স্থানে বিখ্যাত কন্যাকুমারী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ভক্তগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেবীর পূজা করে থাকেন। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই বিশেষভাবে কন্যাকুমারী দেবীর পূজা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋজু ভঙ্গিমায় অত্যন্ত নান্দনিকভাবে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে। এখানে দেবীকে বন্দনারত অবস্থায় দেখা যায়। মাথার নিচে উপাধান এবং পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। বাংলাদেশে দেবীর মূর্তি পাওয়ার বিষয়টি বিরল ঘটনা।

চিত্র: কন্যাকুমারী

উপসংহার

হিন্দুধর্মীয় দিক থেকে এই দেবদেবীর ভাস্কর্যগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ভাস্কর্য গুলো মহাস্থানগড়ে থাকায় পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ২০১৬ সালে মহাস্থানগড়কে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটকগণ এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে চল্লিশটির মতো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। বগুড়ার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান মহাস্থানগড় ছাড়াও হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে মহাস্থানগড় জাদুঘরে হিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন ভাস্কর্যের বিপুল সমাহার প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলো হিন্দুধর্মের পুরনো ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাস্কর্যগুলো তৈরিতে ঐ অঞ্চলের মানুষের যেমন শিল্প মানসের পরিচয় মেলে অপরদিকে ভক্তিমার্গের বিষয়টিও অনুধাবন করা যায়। এখানে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের তৈরি ভাস্কর্যগুলো সংরক্ষিত আছে। এ সমস্ত দেবদেবী বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। *বেদ*, *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর দেবতা বৈদিক দেবতা, *পুরাণে* আলোচিত পৌরাণিক দেবতা এবং *বেদে* ও *পুরাণে* উল্লেখ নাই কিন্তু জনসাধারণ স্থানীয়ভাবে অঞ্চল বিশেষে পূজা করে আসছে তাঁরা লৌকিক দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই পূজার নিমিত্তে মন্দিরে এবং গৃহে দেবদেবীর ভাস্কর্য তৈরি করে পূজা করতেন। প্রাচীন বাংলার হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের পরম পূজনীয় বিষয় হিসেবে এই দেবদেবীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মন্দির' প্রবন্ধে বলেছেন – 'মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, উহা নব হিন্দুধর্মের মর্মকথা হয়ে উঠিল'। [৩৭]ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টিও জড়িত ছিল। এগুলোর নির্মাণ উপকরণ দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, ভাস্কর্যগুলো তৈরিতে বেশ অর্থ ব্যয় হতো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিত্তবানদের ও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। রাজারা স্বাভাবিকভাবে প্রজাসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান জানাতে ভাস্কর্য তৈরিতে অনুদান প্রদান করতেন। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরের জন্য ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। তাঁরা ভাস্কর্য রেখে পৌরোহিত্য করতেন। মহাস্থানগড় জাদুঘরের সংরক্ষিত ভাস্কর্যগুলোর ধর্মীয় গুরুত্বের সাথে সাথে বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্রিক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দেশ-বিদেশের পর্যটক ও গবেষকরা এই জাদুঘরের দেবদেবীর ভাস্কর্য থেকে প্রাচীন বাংলার নানাবিধ বিষয় এবং হিন্দুধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এভাবে নানা বিষয়ে সমাজের

মানুষের উপর দেবদেবীর ভাস্কর্যসমূহের ধর্মীয় সাধনা ও অনুষ্ঠানের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। যা বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপম মহিমা প্রকাশ করে।

তথ্যনির্দেশ

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ. ১৩৩৯

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২,পৃ. ১৮

3. R.C. Majumder, *History of Bengal*, The University of Dhaka, 1976, p. 20

৪. দিনেশ চন্দ্র সরকার, *পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪৭

5. Sir Alexander Cunninggham, *Archaeologycal Survey of India,*Vol. xv. p. 103

৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭৫

৭. নাজিম উদ্দিন আহম্মেদ, *মহাস্থান, ময়নামতী*, পাহাড়পুর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯ পৃ. ২

৮. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা', উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, *প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ম, খন্ড, জুলাই ২০১৮, পৃ.৪২

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, শান্তিনিকেতন, ভারত, ১৯৩৫, পৃ. ৯৫

১০. মোঃ মোশারফ হোসেন, *হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ*, (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭

১১. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ*, প্রথম পর্ব, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩৪

১২. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১১৭, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৭

১৩. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একটি পর্যালোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৪. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৩৫২, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৮

১৫. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ০১, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৪১

১৬. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একটি পর্যালোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৭. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১২৫৪, প্রদর্শনী গ্যালারী – ১

১৮. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ২৩৪৭, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৯

১৯. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর , প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৯

২০. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩০

২১. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১২৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩১

২২. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর, প্রদর্শনী প্রদর্শনী গ্যালারী – ১

২৩. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একটি পর্যালোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২৪. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১১৯, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৫

২৫. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৭২৫, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৫

২৬. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একটি পর্যালোচনা',প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২৭. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ০৯, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৬

২৮. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ২৮, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৬

২৯. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৫৪, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৮

৩০. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৫, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৪০

৩১. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একটি পর্যালোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৩২. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩১, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৮

৩৩. কালিদাস ভক্ত, 'ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একটি পর্যালোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩৪. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৩৫৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ১৫

৩৫. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১২৯, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৬

৩৬. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১০৭৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৪

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্র প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চলচ্চিত্রের গানে নজরুল

ফারহানা রহমান কান্তা *

সারসংক্ষেপ: বিরল প্রতিভার অধিকারী আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না। সাহিত্য ও সংগীতের প্রায় সর্বাঙ্গনে তাঁর দৃপ্ত পদাচারণা ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধ লেখক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও সাংবাদিক। এছাড়াও তিনি চলচ্চিত্রাঙ্গনেও অনবদ্য অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্রের সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা, গায়ক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, সংগঠক, পরিচালক ও সংগীত পরিচালক হিসেবেও তিনি তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবি প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চ, নাটক, বেতার, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র ও সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। গণযোগাযোগের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্রের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের জড়িত হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাঁর পরিচালনায়, সংগীত রচনা ও সংগীত পরিচালনায় যেসব কাহিনি চলচ্চিত্রে রুপায়িত হয়েছে এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তাঁর যে সকল গান ও গানের সুর সংযোজিত হয়েছে তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

বাংলা চলচ্চিত্রে কাজী নজরুলের পর্দাপণ ও সংগীত সংযোজন চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। বাংলা গানের আদি ঘরানা তথা উচ্চাঙ্গ

* ফারহানা রহমান কান্তা, সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সুরকে পরিমার্জিত করে তা সর্বজনীন রূপদানে ও চলচ্চিত্র উপযোগী করে তুলতে কাজী নজরুলের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি শুধু একজন সুরকার ও গীতিকার হিসেবেই নয় বরং চলচ্চিত্র অঙ্গনে বিশেষ অভিনয়ে নিজে সম্পৃক্ত থেকে চলচ্চিত্র অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে কখনো তিনি নিযুক্ত হয়েছেন "সুর ভাণ্ডারী" পদে, কখনো সংগীত পরিচালক আবার কখনো বা তিনি নিজেই চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন। চলচ্চিত্র অঙ্গনে ব্যক্তি নজরুল ও তাঁর গানের যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল তা আজো অনেকের অজানা বিষয়। এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য চলচ্চিত্রে নজরুলের গানের দিকটি পরিস্ফুট করা।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস

১৮০৮ সালে ২রা অক্টোবর প্রফেসর স্টিভেন্সন নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী কলকাতায় সর্বপ্রথম বায়োস্কোপ এনে দেখানো শুরু করেন। এই বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর পর ১৮৮৭ সালে ঢাকা জেলাস্থ বাকজুরী গ্রামের হীরালাল সেন নামক একজন বাঙালি কলকাতার Borne and Shephard দ্বারা পরিচালিত ফটো Competition-এ অংশগ্রহণ করেন এবং সূর্যাস্তের ছবি তুলে প্রতিযোগিতার প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ইংরেজি ম্যাগাজিন ক্রয় করে বায়োস্কোপ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। সেই একই বছর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে বায়োস্কোপ চালানোর জন্য লন্ডনে একটি কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে কিছু Accessories এবং একটি Projector ক্রয় করেন। শ্রীযুক্ত হীরালাল বায়োস্কোপ চালানোর Projector ক্রয় করার পর পরই "Royal Bioscope company of Hiralal sen" নামে একটি কোম্পানি স্থাপন করেন। নিজের ছোট ভাই মতিলাল সেনকে Partner হিসেবে নিজের সঙ্গে রেখে কাজ শুরু করেন। কোম্পানি শুরু করার পর পরই বিদেশ থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট ছবি এনে প্রদর্শন শুরু করেন। হীরালাল সেন ১৯০০ সালে ভারতে তথা কলকাতায় চলচ্চিত্র তৈরির উদ্দেশ্যে ফরাসি প্যাথে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। একই বছর কিছু আনুসঙ্গিক ও একটি মুভি ক্যামেরা সংগ্রহ করে কিছু কিছু নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ চিত্রায়িত করে ঐ সময়কার থিয়েটারের Interval-এর সময় দেখানো হতো। আবার কখনও কখনও সকল অংশগুলো একত্রিত করে দেখানো হতো। কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটার হলে ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি এই একত্রিত অংশগুলো এক করে সর্বপ্রথম দেখানো হয়। এই সকল একত্রিত অংশগুলো এক করে প্রদর্শিত চিত্রকেই সর্বপ্রথম বাংলা

চলচ্চিত্র প্রদর্শন হিসেবে বলা যায়। তাই ইতিহাসের পাতায় হীরালাল সেন বাংলা চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ। একটি নতুন ক্যামেরা কিনে ১৯০৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ডকুমেন্টরি ছবি, এ্যাড্ভারটাইসমেন্ট ছবি এবং নিউজ রিল ছবি তুলতে শুরু করেন। ১৯১২ সালে সরকারের অনুমোদন না পাওয়ায় তার তোলা ছবি "Documentary Film on Dehli Darbar" প্রদর্শিত হয়নি।

চলচ্চিত্র জগতে নজরুলের আবির্ভাব

পার্সী চিত্র প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্স ১৯৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে সর্বপ্রথম সবাক বাংলা ছবি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্সে "সুর ভাণ্ডারী" পদ অলঙ্কৃত করেন। নজরুলের সুর ভাণ্ডারীর পদে আরোহণ হওয়ার সংবাদটি কলকাতার দৈনিক "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় ১৯৩১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠা, প্রথম কলামে ছাপা হয়।

বঙ্গবাণীতে যা ছাপা হয়েছিল তা হুবহু এ রকম- "নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড-এ সুরভাণ্ডারী নিযুক্ত। ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড বাঙ্গালা গানের টকি নির্মাণ করিতেছে। প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতকার নজরুল ইসলামকে সুর-ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়াছে। তাহাদের এ মনোনয়ন যথার্থ হইয়াছে। কারণ অধুনা বাঙ্গালার তরুণ কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম রচয়িতা ও সুরকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কিছুকাল ম্যাডান কোম্পানি নট-নটীদের সুর পরীক্ষার জন্য কেবল গান, আবৃত্তির সবাক চিত্রই নির্মাণ করিবেন, পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' তাহারা সবাক করিয়া তুলিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।"[১]

"অর্থাৎ সুর ভাণ্ডারী" হিসেবে নজরুলের দায়িত্ব ছিল সবাক চিত্রে অংশগ্রহণকারী নট-নটীদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা। উল্লেখ্য "সুর-ভাণ্ডারী " পদটি সঙ্গীত পরিচালকেরও ওপরে"।

কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স-এ যোগদানের পর ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ৩০/৪০ টি সবাক খণ্ডচিত্র মুক্তি লাভ করে। সম্ভবত এই খণ্ডচিত্রের একটিতে নজরুল তাঁর "নারী" কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। এ বিষয়ে নজরুল গবেষক অশোক কুমার মিত্র বলেছেন,

'ইংরেজি ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম বাংলা সবাক চিত্রে তাঁহার (কাজী নজরুল ইসলাম) নারী কবিতাবৃত্তির চিত্র ও শব্দ আজিও আমাদের মানসপটে দীপ্তমান।'[২]

---

[১] আশোক কুমার মিত্র,*নজরুল প্রতিভা পরিচিতি*-পৃ.২৫২। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্সে যোগদানের পর এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনায় বেশ কয়েকটি সবাক চলচ্চিত্র ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়। এসব ছবির সঙ্গীত পরিচালক ভিন্ন হলেও "সুর ভাণ্ডারী' হিসেবে নজরুলের অবশ্যই অবদান থাকার কথা। অশোককুমার মিত্রের সূত্রে জানা যায় এর মধ্যে "প্রহলাদ" ছবিতে ধীরেন দাসের কণ্ঠে কয়েকটি নজরুল গীতি (সুরসহ) ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ম্যাডান থিয়েটার্সের "বিষ্ণুমায়া "(১৯৩২) ছবিতেও ধীরেন দাসের কণ্ঠে নজরুল গীতি (সুরসহ) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

> "প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অশোক কুমার মিত্র বলেছেন, 'অধুনালুপ্ত ম্যাডান থিয়েটার্স লি: প্রযোজিত 'বিষ্ণুমায়া' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামক দুইখানি পৌরণিক চিত্রে কাজী নজরুল রচিত কয়েকটি অতি সুখশ্রাব্য গীত তাহার সতীর্থ ও অনুরাগী শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের কণ্ঠে গীত হইয়া যে মোহন মায়াজাল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আজ ৩৭ বৎসর পরেও আমাদের কানে ধ্বনিত হইতেছে। ধন্য কবি ও গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম।"[৩]

চলচ্চিত্র পরিচালক নজরুল

ম্যাডান থিয়েটার্স এর অন্যতম পার্টনার মিসে পিরোজ ম্যাডান ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে পায়োনীয়ার ফিল্মস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে গিরীশচন্দ্রের " ধ্রুব চরিত" অবলম্বনে "ধ্রুব" (বাংলা) ছবি নির্মানের ঘোষণা দেওয়া হয়। আর "ধ্রুব"র পরিচালক নিযুক্ত হন কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দে। কাজী নজরুল ইসলাম শুধু "ধ্রুব"র পরিচালকই ছিলেন না একাধারে পরিচালক, সুরকার, গীতিকার গায়ক ও অভিনেতা রুপে তিনি চিত্রজগতে আবির্ভূত হন। বলা বাহুল্য "ধ্রুব"র পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পর "মাসিক সওগাত" পত্রিকার কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে নিম্নলিখিত খবরটি ছাপা হয়েছিল-

> "কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ইনি সম্প্রতি পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানির ফিল্ম ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেহ ছায়াচিত্র জগতে এরূপ উচ্চপদের অধিকারী হন নাই। আমরা কবিকে তাহার এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।"[৪]

কবি নজরুল এ ছায়াচিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। নারদের চরিত্রের সাজে নতুনত্ব এনে সকলে বিস্ময় ও সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন কবি। তিনি

---

[৩] অশোক কুমার মিত্র, *নজরুল প্রতিভা পরিচিতি*, পৃ.-২৫২। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.-২০।

[৪] *মাসিক সওগাত*' ৩ সংখ্যা, ১০ম বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৩৩-জানুয়ারী ১৯৩৪, পৃ.-২২১। প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭-১৮।

অশীতিপর নারদকে আটাশে নামিয়ে আনেন, পোশাকেও আনেন নতুনত্ব। এছাড়াও ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল "ধূপছায়া" নামে একটি ছবির পরিচালক ও সে ছবির সংগীত পরিচালনা করেন বলে জানা যায়। তিনি ওই ছবিতে বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সেই ছায়াচিত্রে পংকজ মল্লিক কণ্ঠ দান করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে " ধূপছায়া" (১৯৩১) নামে কোন চলচ্চিত্রের উল্লেখ নেই। তবে এমনও হতে পারে "ধূপছায়া" একটি অসমাপ্ত বা অমুক্তিপ্রাপ্ত ছবি।

চলচ্চিত্রের কাহিনীকার ও সংগীত পরিচালক নজরুল

ধ্রুব

নজরুলের সংগীত পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্র ধ্রুব। পাইওনিয়ার ফিল্মস এর ব্যানারে ধ্রুব মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১লা জানুয়ারি। এই ছায়াচিত্রে ব্যবহৃত ১৮টি গানের মধ্যে ১৭টি গানই নজরুল দ্বারা রচিত ও সুরারোপিত। বাকি একটি গান ছিল কাহিনিকার গিরীশ ঘোষের লেখা। কিন্তু গানটিতে সুর প্রদান করেন নজরুল। এই চলচ্চিত্রে নজরুল নারদের ভূমিকায় নিজ কণ্ঠে চারটি গান করেন। এর মধ্যে তিনটি গান একক কণ্ঠে এবং মাষ্টার প্রবোধের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে একটি গানে অংশগ্রহণ করেন। এই চলচ্চিত্রে শিল্পী আঙ্গুরবালা একক কণ্ঠে চারটি এবং মাষ্টার প্রবোধের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে একটি গানে অংশগ্রহণ করেন। মাষ্টার প্রবোধ একক কণ্ঠে ছয়টি গান করেন। শিল্পী পারুলবালা একক কণ্ঠে দুটি গান করেন। কবি নজরুল কর্তৃক রচিত ১৭টি গানের পূর্ণ বাণী সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু এই গানগুলির সুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ছবিতে নজরুল রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি হচ্ছে-

১। জাগো, ব্যাথার ঠাকুর [ছায়াচিত্রে গানটি সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]

২। অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর [ছায়াচিত্রে গানটি সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]

৩। চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন [গানটি ছায়াচিত্রে সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]

৪। ধূলার ঠাকুর , ধূলার ঠাকুর [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

৫। হরি নামের সুধায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারি [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

৬। আমি রাজার কুমার পথ-ভোলা [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

৭। হে দুঃখ হরণ ভক্তের শরণ [ছায়াচিত্রে গানটি মুনি-পত্নীর (পারুল বালা) কণ্ঠে গীত]

৮। শিশু নটবর নেচে' নেচে' যায় [ছায়াচিত্রে গানটি মুনি-পত্নীর (পারুল বালা) কণ্ঠে গীত]

৯। মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে [ছায়াচিত্রে গানটি নারদের (কবি নজরুল) কণ্ঠে গীত]

১০। গহন বনে শ্রীহরি নামের [ছায়াচিত্রে গানটি নারদের (কবি নজরুল) কণ্ঠে গীত]

১১। দাও দেখা দাও দেখা [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

১২। ফুটিল মানস-মাধব-কুঞ্জে [ছায়াচিত্রে গানটি নারদের (কবি নজরুল) কণ্ঠে গীত]

১৩। হৃদি-পদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম [ছায়াচিত্রে গানটি দ্বৈত-কণ্ঠে নারদ (কবি নজরুল) এবং ধ্রুবর

(মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

১৪। ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় [ছায়াচিত্রে গানটি সুনীতির (আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]

১৫। নাচো বনমালী করতালি দিয়া [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

১৬। জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর [ছায়াচিত্রে গানটি দ্বৈত-কণ্ঠে ধ্রুব (মাষ্টার প্রবোধ) এবং সুনীতির

(আঙ্গুর বালা) কণ্ঠে গীত]

১৭। কাঁদিসনে আর কাঁদিসনে মা [ছায়াচিত্রে গানটি ধ্রুবর (মাষ্টার প্রবোধ) কণ্ঠে গীত]

এই চলচ্চিত্রে আরো একটি গান আছে। গানটি রচনা করেছেন ছায়াচিত্রের কাহিনিকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ। তবে সুরারোপ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। গানটির প্রথম চরণ হলো-

১৮। আয়রে আয় হরি বলে

বাহু তুলে নেচে নেচে আয়

ছায়াচিত্রে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ধ্রুব অর্থাৎ মাষ্টার প্রবোধ।

পাতালপুরী

কালী ফিল্মস প্রযোজিত ছায়াছবি "পাতালপুরী" ১৯৩৫ সালের ২৩ মার্চ কলকাতার রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। ছায়াচিত্রটি প্রযোজনা করেন প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গীত রচনা করেন-কাজী নজরুল ইসলাম এবং শৈলজানন্দ। সংগীত পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম, তার সহকারী ছিলেন কমল দাসগুপ্ত।

ছায়াচিত্রের কাহিনি লেখা হয়েছিল বর্ধমানের কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনী অবলম্বন করে। জানা যায় কবি নজরুল এই চলচ্চিত্রের সংগীত রচনার পূর্বে বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়ে খনি শ্রমিকদের জীবন যাত্রা প্রত্যক্ষ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সেই কুলি-কামিনীদের মুখের শব্দ সংগৃহিত করে গান রচনা করেন। রাঢ় বাংলার প্রচলিত ঝুমুরের সুরের সাথে সাঁওতালীকে মিলিয়ে তৈরি করলেন নজরুলী ঝুমুর। এই চলচ্চিত্রের মোট গানের সংখ্যা জানা যায় না। তবে বিশিষ্ট সংগীত গবেষক আব্দুল আজীজ আল-আমানের "নজরুল গীতি (অখণ্ড)" থেকে মোট সাতটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলির হলো-

১। আঁধার ঘরের আলো
২। এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
৩। ও শিকারী মারিস না তুই
৪। ধীরে চল চরণ টলমল
৫। তাল পুকুরে তুলছিল সে শালুক
৬। দুঃখের সাথী গেলি চলে

পাতালপুরী' চলচ্চিত্রেই প্রথম নজরুলী ঝুমুরের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে গ্রামোফোন কোম্পানি নজরুলী ঝুমুরের হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রি করেছিল।

গ্রহের ফের

দেবদত্ত ফিল্মস এর ছায়াচিত্র "গ্রহের ফের" ১৯৩৭ সালের ৪ ডিসেম্বর রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াছবির প্রযোজক ছিলেন শ্রীযুক্ত দেবদত্ত শীল। কাহিনিকার ডা. নরেশ সেনগুপ্ত। সংলাপ রচয়িতা ছিলেন প্রেমেন মিত্র। ছায়াছবির পরিচালক চারু রায়। সংগীত রচনা করেন অজয় ভট্টাচার্য। সংগীত পরিচালনা করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য রচিত ছয়টি গানে সুরারোপ করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বিদ্যাপতি

নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে ছায়াছবি "বিদ্যাপতি" ১৯৩৮ সালের ২ এপ্রিল কলকাতার চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের রেকর্ড নাটিকা "বিদ্যাপতি" অবলম্বনে ছায়াছবি "বিদ্যাপতি" চিত্র নির্মাণ করা হয়। নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষ সেকালের বিখ্যাত পরিচালক দেবকীকুমার বসুকে নজরুলের কাহিনী, গান, সুর ও সংলাপ নিয়ে "বিদ্যাপতি" ছবি নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন নজরুল তবে পর্দায় নাম গেছে পরিচালক দেবকী বসুর। ছবির বেশির ভাগ গানই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ও সুর করা। যদিও সংগীত পরিচালক হিসেবে রাইচাঁদ বড়ালের নামই প্রচারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে "নিউ থিয়েটার্সে নিয়োগকৃত সংগীত পরিচালক রাঁইচাঁদ বড়ালের একটি স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই, যা "গানের কাগজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন কোম্পানির নিয়োগকৃত সুরকার হওয়ায় নাম ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুলের সুরেই গান গাওয়া হয়েছে।"[৫]

স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ হতে একথা জানা যায় যে, কবি কাজী নজরুল বিদ্যাপতি ছায়াচিত্রের চিত্রনাট্য সংলাপ ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। কিন্তু কবি নজরুল কয়টি গান ও কী কী গান এ ছায়াছবির জন্য রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না তবে সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়াও অন্যান্য গানগুলি পদাবলী থেকে নেওয়া মৈথিলী ভাষায় রচিত।
"বিদ্যাপতি" ছায়াচিত্রের হিন্দি রুপ ১৯৩৮ সালের ২৩ এপ্রিল কলকাতায় নিউ সিনেমা হলে প্রথম মুক্তি পায়। কিন্তু বিদ্যাপতি ছায়াচিত্রের প্রিন্ট, প্রচারপুস্তিকা

[৫] আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৯৬-১৯৭।

দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় হিন্দি বিবরণ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তবে এইটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যে, "বিদ্যাপতি" হিন্দি ছায়াছবি খুবই লোকপ্রিয়তা পেয়েছিল আর এর ফলে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দি ভাষাভাষী দর্শকদের কাছে কাজী নজরুল ইসলাম বহুল পরিচিতি লাভ করেন। এই ছায়াচিত্রের কাহিনি ও রচিত হয় নজরুল রচিত "বিদ্যাপতি" নাটক (বাংলা)-র কাহিনি অবলম্বনে এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম কয়েকটি গীত রচনা করেন ও সুরারোপ করেন। তবে কী কী গান রচনা করেন ও সুরারোপ করেন তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তবে অনুপম হায়াতের *"চলচ্চিত্র জগতে নজরুল"* শীর্ষক বই থেকে পাওয়া যায় যে, এই ছায়াছবিতে কে.এল. সায়গলের গাওয়া " পনঘটপে কনহইয়া আতা হ্যায়" ও "গোকুল সে গয়ে গিরিধারী" এবং পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া "দর্শন হয়ে তিহারে" গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। তবে এই গানগুলি নজরুলের লেখা বা সুর করা কিনা সেই সম্বন্ধে কোন তথ্য বইটিতে নেই।

গোরা

দেবদত্ত ফিল্মস প্রযোজিত ছায়াচিত্র "গোরা" ১৯৩৮ সালের ৩০ জুলাই কলকাতার "চিত্রা" প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। বাংলা চলচ্চিত্রে "রবীন্দ্র-নজরুল" প্রতিভার মিলন ঘটেছিলো "গোরা" চলচ্চিত্রে। এই ছায়াচিত্রের কাহিনি লেখক ও গীতিকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। সংগীত পরিচালনা কাজী নজরুল ইসলাম, সহাকারী সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন। গোরা ছায়াছবিতে মোট সাতটি গান ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে তিনটি রবীন্দ্র সঙ্গীত, পুরান কিংবা গীতা থেকে দুটো শ্লোক পাঠ আছে এবং একটি গান রচনা ও সুরসংযোজন কাজী নজরুল ইসলামের। বাকি গানটি হলো বঙ্কিমচন্দ্র রচিত "সুজলাং সুফলাং শষ্য শ্যামলাং মলয়া শিতলাং"। এই গানটির সুরসংযোজন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি নজরুল রবীন্দ্রনাথের করা সুরটিকেই ছায়াচিত্রে ব্যবহার করেছিলেন। কবি নজরুল রচিত ও সুরারোপিত গানটিতে কণ্ঠদান করেন শিল্পী ভক্তিময় দাসগুপ্ত। গানটি নজরুল ইসলাম "আশা-তোড়ী" রাগে সুরারোপ করেন। গানটি নিম্নরুপ-

আশা- তোড়ী-ত্রিতাল
ঊষা এলো চুপি চুপি / রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নববধূ সম/তরুণ অরুণ বুঝি জাগে"
শুকতারা যেন তার জলভরা আঁখি/ আনন্দ বেদনায় কাঁপে থাকি থাকি।
সেবার লাগিয়া হাত দুটি/ মালার সম পড়ে লুটি
কাহার পরশ-রস মাগে॥[৬]

[৬] মূল সম্পাদক- আব্দুল আযীয আল-আমান, *নজরুল গীতি (অখণ্ড)*, হরফ প্রকাশনি, ২৩ সেপ্টেম্বর-১৯৭৮, পৃ.-২০৮

গোরা চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত রবীন্দ্র সংগীতগুলি নিয়ে ছবি মুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্বভারতী কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে কবি নজরুলকে বেশ উদ্বিগ্ন হতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কবি শিষ্য প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক নিতাই ঘটকের স্মৃতিচারণ-

"দেবদত্ত ফিল্মস রবীন্দ্র নাথের "গোরা"-র চিত্ররুপ তুললেন। সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তখন বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগীয় বোর্ড থেকে রেকর্ড বা ফিল্মের গানগুলির জন্য অনুমতি নিতে হত। কবি নজরুল বিনা অনুমতিতেই কিন্তু "গোরা"-র গান করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অন্ততপক্ষে তিনি যেখানে সংগীত পরিচালক বিশ্বভারতী-র বোর্ড সেখানে কোন রকম আপত্তি তুলবেন না। কিন্তু ছবিটির মুক্তি রজনীর ২/১ দিন পূর্বে " ট্রেড শো"-র দিন বিশ্বভারতী পর্যবেক্ষক এসে কবির গাওয়া গানগুলির ত্রুটি ধরলেন এবং ছবির মুক্তি বন্ধ করলেন। প্রডিউসারের মাথায় হাত। কবি হার মানলেন না। ব্যাপারটি শোনামাত্র কবি সঙ্গে সঙ্গে একটি গাড়িতে করে "গোরা" ফিল্মটির কপি একটি ছোট প্রোজেক্শন মেশিন, সঙ্গে দেবদত্ত ফিল্মস এর প্রোপাইটার ও তখনকার তার সহকারী মানু গাঙ্গুলীকে সঙ্গে নিয়ে সোজা শান্তিনিকেতনে চলে গেলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে। বিশ্ব কবিতো তাঁকে দেখে প্রথমে অবাক ও পরমুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে বললেন এসেছই যখন কয়েকদিন আমার কাছে থেকে যাও। নজরুল বললেন, "সে তো আমার সৌভাগ্য- কিন্তু এখন যে এক ভীষণ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। তারপর নজরুল ছবি সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার বললেন।

বিশ্বভারতী বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়ার কথাও জানালেন। শুনে বিশ্বকবি বেশ অসন্তুষ্ট স্বরে অভিমত প্রকাশ করলেন-'কী-কাণ্ড বলত? তুমি শিখিয়েছো আমার গান আর ওরা কোন আক্কেলে তা'র দোষ ধরে.....? তোমার চেয়েও আমার গান কী তারা বেশি বুঝবে। আমার গানের মর্যাদা কী ওরা বেশি দিতে পারবে?' কবি নজরুল বললেন,' কিন্তু লিখিত অনুমতি না পেলে সামনের ঘোষিত তারিখে ছবিটার মুক্তি দেওয়া যাবে না। আপনি দয়া করে আজ এক সময় ছবিটা দেখুন- আমি প্রজেক্টর ও ফিল্ম সঙ্গে করে এনেছি। তারপর অনুমতি পত্রে একটা সই দিয়ে দিন।' বিশ্বকবি বলেন-'ছবি দেখাতে চাও সকলকেই দেখাও-সবাই আনন্দ পাবে। আপাতত দাও কিসে সই করতে হবে'- এই বলে নজরুলের হাত থেকে আগের থেকেই লিখে রাখা অনুমতি পত্র নিয়ে তাতে সই ও তারিখ দিয়ে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনেই ছবিখানি মুক্তি পেল।"[৭]

৭ নিতাই ঘটক, *মুক্ত বিহঙ্গ-স্বর্ণপক্ষ ঈগল*, *তথ্য: কাফেলা*, আশ্বিন সংখ্যা ১৩৮৯ ইং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮২ পৃ.-৩৭। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩।

জনশ্রুতি আছে বিশ্বভারতীর এই আচরণের জবাবস্বরূপ নজরুল আশা-তোড়ী রাগে "ঊষা এলো চুপি চুপি" গানটি রচনা করে "গোরা" চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেন।

সাপুড়ে

নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত "সাপুড়ে" (বাংলা) ১৯৩৯ সালের ২৭ শে মে কলকাতার "চিত্রা" ও "নিউ সিনেমা" প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। এই ছায়াচিত্রের কাহিনিকার কাজী নজরুল ইসলাম। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- দেবকীকুমার বসু। গীতিকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য ও সংগীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল। এই ছবির নাম প্রাথমিক পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছিলো "বিষের বাঁশী"। কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলায় "সাপুড়ে" আর হিন্দিতে "সাপেরা"। ছায়াছবিতে চিত্রনাট্যকার হিসেবে দেবকী বসুর নাম পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্যকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

"সাপুড়ে" ছায়াচিত্রে মোট আটটি গান রয়েছে। চলচ্চিত্রের চটি পুস্তিকাতে সুরকার হিসেবে রাইচাঁদ বড়ালের নাম ছাপা হলেও রেকর্ড লেবেলে গানগুলির সুরকার হিসেবে নজরুল ইসলামের নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও ছায়াছবির সংগীত পরিচালক হিসেবেও রাইচাঁদ বড়ালের নাম পাওয়া গেলে আটটি গানের মধ্যে সাতটি গান রচনা, সুরসংযোজন এবং শিল্পী প্রশিক্ষণের সকল দায়দায়িত্ব পালন করেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাকি একটি গানের গীতিকার ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য এবং সেটি সুরারোপ করেন রাইচাঁদ বড়াল। এই প্রসঙ্গে *"চলচ্চিত্রে নজরুল"* বইয়ের লেখক আসাদুল হকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা দরকার-

"আমি একদিন নিজে বড়াল মশায়ের কাছে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন-নিউ থিয়েটার্সের বিধি-নিয়ম অনুসারে কোম্পানীর যত সিনেমা তৈরী হতো তার সুরকার থাকবেন হয় বড়াল মশায় অথবা শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। তাঁরা দুইজন নিউ থিয়েটার্সের বেতন ভোগী সুরকার। সে জন্যে সিনেমার পুস্তিকায় তার নাম ছাপা হয় কিন্তু গানগুলির রচনা ও সুরারোপ করেন নজরুল। অবশ্য সেজন্য কোম্পানী তাঁকে উপযুক্ত সম্মানী দিয়েছিল।"[৮]

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি হলো-
১। হলুদ গাঁদার ফুল

৮ আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৪।

২। আকাশে হেলান দিয়ে
৩। কথা কইবে না বউ
৪। কলার মান্দাস বানিয়ে দাও
৫। পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম
৬। ফুটফুটে চাঁদ হাসে রে
৭। দেখিলো তোর হাত দেখি

এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গান আজও নজরুল প্রেমীদের মুখে মুখে ঘোরে। এর মধ্যে কানন দেবীর গাওয়া একটি গানের বাণী নিচে দেওয়া হলো-

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ।
ঐ পাহাড়ের ঝর্ণা আমি/ ঘরে নাহি রই গো উধাও হয়ে বই ॥
চিতা বাঘ মিতা আমার গোখরো খেলার সাথী;
সাপের ঝাঁপি বুকে ধ'রে সুখে কাটাই রাতি।
ঘূর্ণী হাওয়ায় উড়নী ধরে আমি নাচি তাথৈ তাথৈ ॥[৯]

এই গানটি সম্বন্ধে কানন দেবী জানিয়েছিলেন-

'আকাশ-এ হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়, কাজীদার বাণীতে আমার আর একটি স্মরণীয় গান। তিনি এ গানটি আমার বৌ বাজারের বাড়িতে বসে লিখেছেন। "সাপুড়ে" ছবির গান ও কাহিনি তিনি আমার বাসায় বসে লিখতেন।"[১০]

হিন্দি "সাপেড়া" ছায়াচিত্রটি করাচি ও বম্বেতে এক যোগে মুক্তি লাভ করে বলে জানা যায়। তবে "সাপেড়া " রচনায় কতগুলি গান ছিল এবং কোন কোন গান কাজী নজরুল ইসলামের রচনা ও সুরসংযোজন করা ছিল সে কথা আজ আর কেউ বলতে পারে না।

চৌরঙ্গী

ফজলী ব্রাদার্সের ব্যানারে এবং এম্পায়ার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স এর পরিবেশনায় ছায়াছবি "চৌরঙ্গী" (বাংলা) ১৯৪২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনি প্রযোজনা এবং চিত্রনাট্য রচয়িতা করেন এস্. ফজলী। বাংলায় সংলাপ রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সংগীত রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং নবেন্দু সুন্দর। সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

---

৯ মূল সম্পাদক- আব্দুল আযীয আল-আমান, নজরুল গীতি (অখণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.-৪।

১০ কানন দেবী: কবি প্রণাম-বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত *নজরুল কথা*, কলকাতা, পৃ.২৭২। অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৫।

সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে ছিলেন কালীপদ সেন। এই ছবির জন্য ৮টি গান লিখেছিলেন কবি। গানগুলি হলো-

১। চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী
২। সারা দিন ছাদ পিটি
৩। রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্
৪। জহরত পান্ন হীরার বৃষ্টি
৫। প্রেম আর ফুলের জাতিকূল নাই
৬। ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
৭। ঘর ছাড়া ছেলে
৮। ও গো বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও

গানগুলির সুরকারও ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

চৌরঙ্গী (হিন্দি) কাহিনিচিত্র বাংলা চৌরঙ্গী কাহিনিচিত্রের আগে মুক্তি পেয়েছিলো। চৌরঙ্গী (হিন্দি) মুক্তি পায় ১৯৪২ সালের ৪ জুলাই কলকাতার নিউ সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে। চৌরঙ্গী (হিন্দি) কাহিনিচিত্রের সংগীত পরিচালনায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আবহ সংগীত রচনায় কাজী নজরুল ইসলামের নামের পাশাপাশি হনুমান পণ্ডিত শর্মার নামও পাওয়া যায়। চৌরঙ্গী (হিন্দি) ভার্সনে মোট গানের সংখ্যা ছিলো ১৩টি। এর মধ্যে একটি গান মীর্জ্জা গালিবের, হজরৎ জীগর মুরাদাবাদীর রচিত তিনটি গান, এছাড়াও আরজু লখনউভি এবং পরতাব লাখনউভি দুজনেই একটি করে গান রচনা করেন। সিনেমার চটি পুস্তিকায় এই ছয়টি গানের পাশে গানের রচয়িতাদের নাম বন্ধনীর মাঝে উল্লেখ করা আছে। তবে গানগুলির সুরারোপ করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বাকি ৭টি গানের মধ্যে কোন কোন বিশ্লেষকের মতে ৬টি গান কাজী নজরুল ইসলামের রচনা আবার কারো মতে ৭টি গানই কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন এবং সুরারোপ করেন।

গানগুলি হলো-

১। চৌরঙ্গী হায় ইয়ে চৌরঙ্গী
২। সারা দিন ছাত্ পীটী হাত হুঁ দুখাইরে
৩। ক্যায়সে খেলন্ জাবে সাবন মে কজরিয়া
৪। আ-জারি নিন্দিয়া তু আ- কিউ না যা-
৫। জো উমপে গুজরতি হায় কিসনে
৬। উহ কব্কে আয়ে ভী আত্তর গয়েভী
৭। হাম ইশ্কে মারো কা

নন্দিনী

কে. বি. পিকচার্স প্রযোজিত ও কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা নিবেদিত ছায়াছবি "নন্দিনী" ১৯৪১ সালের ৮ নভেম্বর রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। ছায়াছবির কাহিনি রচনা, চিত্রনাট্য রচনা এবং ছায়াছবি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন হিমাংসু দত্ত (সুরসাগর)। ছায়াছবির সংগীত রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে

১। কাজী নজরুল ইসলাম ২। সুবল দত্ত এবং ৩। প্রণব রায়।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বন্ধু শৈলজানন্দের অনুরোধ এই ছায়াচিত্রের জন্য দুটি গান রচনা ও সুরারোপ করেন। গান দুটি সুর প্রশিক্ষণ কবি নিজে করেছিলেন। নন্দিনী ছায়াছবির কবি নজরুল সুরারোপিত গান দুটিতে কণ্ঠদান করেন প্রখ্যাত শিল্পী শচীনদেব বর্মন। বিশ্লেষকদের মতে "এই গান দুটি কবি নজরুল আর শচীনদেব বর্মনের এক অমর সৃষ্টি, যুগ্ম প্রতিভার এক অম্লান স্বাক্ষর"। নজরুলের কালজয়ী সেই গান দুটি হলো

১। চোখ গেল চোখ গেল

২। পদ্মার ঢেউ রে

প্রথম গানটি ছায়াচিত্রে ব্যবহৃত হলেও, দ্বিতীয় গানটি শেষ পর্যন্ত ছায়াচিত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। তবে এই গান দুটি কবি নজরুল ইসলামের এক অমর সৃষ্টি।

রজত জয়ন্তীর

রজত জয়ন্তী সিনেমায় নজরুলের দুটি গান ব্যবহার হয়েছে বলে জানা যায়। আর কোন সম্পৃক্ততার কথা জানা যায় না। শিল্পী মলিনা দেবীর কণ্ঠে গীত "তুমি কি দখিনা হাওয়া" গানটি নজরুলের সৃষ্টি। তবে দ্বিতীয় গানটি নজরুলের কি না তা জানা সম্ভব হয়নি।

দিকশূল

কবি কাজী নজরুল ইসলাম অসুস্থ হওয়ার পর নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় কথ াশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর কাহিনি অবলম্বনে ১৪ আগস্ট ১৯৪৩ সালে কলকাতায় এক যোগে মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তিলাভ করে ছায়াছবি "দিকশূল"। ছায়াচিত্রের পরিচালক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক। সংগীত রচনায় ১। কাজী নজরুল

ইসলাম ২। প্রণব রায় এবং ৩। ভোলানাথ মিত্র। এই ছায়াছবির ৫টি গানের মধ্যে ২টি গানের গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম। গান দুটি হলো-

১। ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর

২। ঝুম্‌কো লতার জোনাকী

প্রথম গানটিতে কণ্ঠদান করেন শিল্পী অঞ্জলী রায়। আর দ্বিতীয় গানটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি ছড়ার গান। গানটি ছায়াছবিতে শিল্পী রাধারানী দ্বারা গীত হয়েছিলো। গান দুটির সুরকার শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক। পঙ্কজকুমার মল্লিক কবি নজরুলের গান দুটি তার নিজস্ব ঢংয়ে সুরারোপ করেছিলেন

অভিনয় নয়

কালী ফিল্মস লিমিটেড প্রযোজিত ছায়াছবি "অভিনয় নয়" কলকাতার রুপবাণী প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তি লাভ করে ১৯৪৫ সালের ২রা মার্চ। কাহিনিকার ও পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন গিরীণ চক্রবর্তী। গীত রচনায় ১। কাজী নজরুল ইসলাম ২। মোহিনী চৌধুরী ও ৩। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে মোট গানের সংখ্যা সাতটি। তার মধ্যে একটি গান নজরুল ইসলাম রচিত, গানটি নজরুল ইসলাম রচিত একটি ঝুমুর গান। ছায়াছবিতে গানটি নাচের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে গীত হয়েছে। পুরুষ কণ্ঠটি সুরকার গিরীণ চক্রবর্তীর এবং মহিলা কণ্ঠটি শেফালি ঘোষের। গানটি হলো-

"ও শাপলা ফুল নেবো না
বাব্‌লা ফুল এনে দে"

কবি বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কবি শিষ্য সুরকার গিরীণ চক্রবর্তী তাঁদের কৃতজ্ঞতার স্মৃতিস্বরূপ ছায়াছবিতে গানটি ব্যবহার করেছিলেন। কারণ যখন এই ছায়াছবি মুক্তিলাভ করে তখন কাজী নজরুল ইসলাম কোন কিছু ঠিক মত বলতে বা মনে করতে পারতেন না।

শহর থেকে দূরে

ইস্টার্ন টকিজ লিমিটেড নিবেদিত "শহর থেকে দূরে" ছায়াছবিটি ২৪ শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে মুক্তি লাভ করে। কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ছায়াচিত্রের টাইটেলে গীতিকার হিসেবে নজরুলের নাম পাওয়া যায়। অভিনয়াংশের এক জায়গায় নজরুলের "কে বিদেশী বন উদাসী" গানটির দুটি লাইন খালি গলায় গাইতে দেখা যায়। তবে জানা যায় যে, "আধো রাতে যদি

ঘুম ভেঙ্গে যায়" গানটি কবি এই ছায়াচিত্রের জন্য রচনা করেছিলেন তবে অজ্ঞাত কোন কারণবশত গানটি নজরুল নিয়ে যান।

উল্লেখিত ছায়াছবিগুলির সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত সুস্থাবস্থায় কাজী নজরুল ইসলাম চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক, সংগীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, কাহিনিকার, অভিনেতা, সংগঠক হিসেবে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি থেকে কবির অসুখ প্রকট হয়ে ধরা দেয়ায় নজরুল তাঁর কর্মজীবন থেকে বিদায় নেন। ১৯৪২ সালের পর কবি নজরুলের পক্ষে আর কোন ছায়াছবির সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। কোন কোন পরিচালক, প্রযোজক তাদের ছায়াছবিতে কবি নজরুলের দুই একটি গান ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে কোন কোন সংগীত পরিচালক কবির আদি সুরটাকেই ব্যবহার করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের ইচ্ছামত নিজে নতুন করে সুরসংযোজন করে গান ব্যবহার করেছেন।

"এরপর বেশ কয়েকটি বছর (১৯৪২-১৯৬৪) কবির জীবনের অন্ধকারময় যুগ বলা যায়। কবির রচিত গান ও সুর আর কেউ গাইতো না। রেডিওতেও প্রচার হতো না। এমনকি কবির রচিত গান ও সুর অন্যের নামে প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিহাসকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। সত্য একদিন একদিন কোন না কোন উপায়ে প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে কিছু নতুন উৎসাহিত গবেষকদের প্রচেষ্টায় নজরুলের সাহিত্য ও সংগীত এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে থাকে। কবির কোন কোন গুণগ্রাহী কবির কিছু কিছু বিখ্যাত গান তাঁদের পরিচালিত ছায়াছবিতে ব্যবহার করেন।" [১১]

কোন্ কোন্ ছায়াছবিতে কী কী গান ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

চট্টগ্রাম আস্ত্রাগার লুণ্ঠন

নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় ছায়াছবি " চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" ১৯৪৯ সালের ২৭ নভেম্বর, কলকাতায় একযোগে মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবির প্রযোজক ছিলেন সত্যদেব নারঙ্। গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। সংগীত পরিচালক কালীপদ সেন। এই ছায়াছবিতে কবি নজরুলের দুটো বিখ্যাত কোরাস গান ব্যবহৃত হয়েছ। গান দুটি হলো-

---

১১ আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১৮১-১৮২।

১। চল্ চল্ চল্
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
২। কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট

এই বিখ্যাত গান দুটো কবি নজরুলের আদি সুরে ছায়াছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে। "চল্ চল্ চল্" গানটির যন্ত্র-সংগীত এবং সমবেত কণ্ঠে রেকর্ড দুটি চীন সীমান্তে ভারতের সাথে চীনের সংঘর্ষের সময় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকার "চল্ চল্ চল্" গানের সুরটাকে রণ সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

শ্রীশ্রীতারোকেশ্বর

শক্তি প্রডাকশন নির্মিত ছবি " শ্রীশ্রীতারোকেশ্বর" ১৯৫৮ সালের ২৮ নভেম্বর উত্তরা, পূরবী, উজালা প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবির পরিচালক বংশী আস্, সংগীত পরিচালক-পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম। এ সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তিন কন্যা

বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'ছায়াচিত্র তিনকন্যা' ১৯৬১ সালের ৫ মে রুপবাণী, অরুণা ও ভারতী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াচিত্রের কাহিনিকার ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রনাট্য, সংগীত পরিচালনা ও সিনেমা পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তথ্য সূত্রে জানা যায়, শ্রী সত্যজিৎ রায় "তিন কন্যা" ছায়াছবির সমাপ্তি খণ্ডে নজরুলের "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে" গানটির প্রথম অংশটুকু রেকর্ড বাজিয়ে ব্যবহার করেছিলেন, তবে সত্যজিৎ রায় জানতেন না যে গানটি নজরুল ইসলাম রচিত ও সুরারোপিত। পরে যখন গ্রামোফোন কোম্পানি গানটি ছায়াছবিতে ব্যবহারের জন্য রয়্যালটি দাবি করে তখন তিনি জানতে পারেন গানটি নজরুল ইসলামের। এইচ.এম ভি গ্রামোফোন কোম্পানি ঐ গানটির স্বত্ব নজরুলের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলো।

হাসুলি বাঁকের উপকথা

জালান প্রডাকশন নিবেদিত " হাসুলি বাঁকের উপকথা" চলচ্চিত্রটি ১৯৬২ সালের ১৪ এপ্রিল মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াছবির কাহিনিকার ও গীতিকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তপন সিংহ, সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে নজরুলের

বিখ্যাত গান "কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে" কবিকৃত আদি সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি দ্বৈত কণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বেলা মুখোপাধ্যায় নজরুলের মূল সুরেই গেয়েছেন।

দাদা ঠাকুর

জালান প্রডাকশন নিবেদিত "দাদা ঠাকুর" ছায়াছবিটি ১৯৬২ সালের ৯ই নভেম্বর মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবিটির পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। কাহিনিকার এ.কে সরকার। গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার। সংগীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে নজরুলের বিখ্যাত কোরাস গান "দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু দুস্তর পারাবার হে" গানটি আদি সুরে ব্যবহৃত হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও আরও কিছু চলচ্চিত্রে নজরুলের গান ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু নজরুলের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়নি এমনকি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি নজরুল ইসলামকে। হয়তো এমনও হতে পারে নজরুল সুস্থ অবস্থায় এ গানগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন কিংবা পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারের নিকট থেকে এ গানগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। নিচে এমন কয়েকটি ছায়াছবির কথা উল্লেখ করা হলো-

সুরের আগুন

১৯৬৫ সালের ২৫ জুন মিনার, বিজলী এবং ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এই ছায়াচিত্রে নজরুলের লেখা গান ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায়। তবে কটি গান আছে তা জানা যায়নি।

সিরাজদ্দৌলা

১৯৬৭ সালে ছায়াছবিটি ঢাকার মুক্তি লাভ করে। ছবিটির প্রযোজক খান আতাউর রহমান। এই ছায়াচিত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি গান ব্যবহৃত হয়েছেন। গান দুটি যথাক্রমে-

১। পথহারা পাখি কেঁদে ফেরে একা

২। এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে

গান দুটিতে কণ্ঠ দান করেছেন ১। ফেরদৌসী রহমান ও ২। আবদুল আলিম।

জীবন থেকে নেয়া

১৯৭০ সালে জহির রায়হান তাঁর "জীবন থেকে নেয়া" ছায়াছবিতে কবি নজরুলের দুটি গান ব্যবহার করেন। গান দুটি হলো-

১। কারার ঐ লৌহ কপাট

২। শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল

"জীবন থেকে নেয়া" ছায়াচিত্রটি ১৯৭০ সালের বাংলাদেশে গণ আন্দোলনের সময় চিত্রায়িত হয়। দেশের পরিস্থিতির সাথে গান দুটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছিলো।

কোথায় যেন দেখেছি

কথাকলি ফিল্মসের ছায়াছবি "কোথায় যেন দেখেছি" ১৯৭০ সালে চিত্রায়িত হয়। ছায়াছবিটির চিত্রনাট্য ও সংগীত পরিচালনা করেন নিজামুল হক ও কাহিনিকার-ছন্দা হক। এই ছায়াচিত্রে কবি নজরুলে সেই বিখ্যাত কোরাস গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল-

জাগো, জাগো অনশন-বন্দি, ওঠোরে যত

গানটিতে কণ্ঠদান করেন শিল্পী অজিৎ রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ।

বিরাজ বৌ

১৯৭২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে "বিরাজ বৌ" মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন কালীপদ সেন। নজরুলের গান ব্যবহৃত হয়েছে ছায়াছবিটিতে, তবে কি কি গান তা জানা সম্ভব হয়নি।

পদি পিষির বারমী বাক্স

অনিন্দ চিত্রা প্রডাকশন নিবেদিত "পদি পিষির বারমী বাক্স "ছায়াচিত্রটি ১৯৭২ সালের ৩রা নভেম্বর রাধা ও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছবিটির পরিচালনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অরুন্ধতী দেবী। গীতিকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম পাওয়া গেলেও কি কি গান ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় নি।

অর্জুন

ইন্দার সেন পরিচালিত "অর্জুন" ছায়াছবিটি ১৬ই জুলাই ১৯৭৬ সালে উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনিকার-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক আনন্দ শঙ্কর। নজরুলের কোন গান ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায়নি।

অসময়

আপনজন চিত্রম প্রডাকশনস নিবেদিত "অসময়" ছায়াছবিটি ১৯৭৬ সালের ২৩ জুলাই রাধা, পূর্ণিমা ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবির কাহিনিকার ও পরিচালক-ইন্দার সেন। গীতিকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক আনন্দ শঙ্কর। তবে নজরুলের কোন কোন গান ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্ভব হয়নি।

সম্রাট

ছায়াছবিটি ১৯৭৬ সালে বসুশ্রী ও বীণা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সুরকার-কালীপাদ সেন।

বারবধূ

উর্বশী চিত্রম প্রডাকশনস নিবেদিত "বারবধূ" ছায়াছবিটি ১৯৭৮ সালের ১৪ এপ্রিল উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনিকার- সুবোধ ঘোষ। চিত্রনাট্য লিখেছিলেন- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা করেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। গীতিকার– কাজী নজরুল ইসলাম, অমিতাভ চৌধুরী, সংগীত পরিচালক - আনন্দ শঙ্কর। "বারবধূ" ছবিতে কবি নজরুলের একটি বিখ্যাত গান আদি সুরেই ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হলো "চোখ গেল চোখ গেল"। বারবধূ ছায়াছবিতে গানটি গেয়েছেন কিংবদন্তী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তবে এই গানটি ১৯৪১ সালে কবি কাজী নজরুলের প্রশিক্ষণে "নন্দিনী" সিনেমার জন্য কুমার শচীন দেব বর্মন গেয়েছিলেন।

বধূবিদায়

চিত্রা ফিল্মস দ্বারা পরিচালিত 'বধূবিদায়" ছায়াছবিটি ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায়। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কাজী জহির। সংগীত পরিচালক দেবু ভট্টাচার্য। এই ছায়াছবিতে কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান তাঁর রচিত আদি সুরেই ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হলো-"আমার যাবার সময় হলো"। ছায়াছবিতে গানটিতে কণ্ঠদান করেছেন সাবিনা ইয়াসমীন। এই গানটি তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম শিল্পী আঙ্গুরবালা দ্বারা রেকর্ড বাণীবদ্ধ করান।

দেবদাস

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস " দেবদাস" তৃতীয় বারের মত চিত্রায়িত হয়ে ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ উত্তরা, পূরবী ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবিটির চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দিলীপ রায়। গীতিকার–কাজী নজরুল ইসলাম, হৃদয়েশ পাণ্ডে, মোহিনী চৌধুরী। সংগীত পরিচালক - কালিপদ সেন। এই ছবিতে নজরুলের তিনটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল-

১। শাওন রাতে যদি

২। যে দিন লব বিদায়

৩। ভুলি কেমনে আজো যে মনে

সবগুলো গানই কবি নজরুলের আদি সুরে প্রখ্যাত শিল্পী মান্না দে দ্বারা গীত।

নবদিগন্ত

১৯৭৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর "নবদিগন্ত" ছায়াছবিটি শ্রী ও ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন–কালীপদ সেন। ছায়াছবিটিতে নজরুলের কী কী গান ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

দর্পচুর্ণ

"দর্পচুর্ণ" ছায়াছবিটি ১৯৮০ সালের ২৭ জুন উত্তরা ও উজালা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন কালীপদ সেন, তবে ছবিটিতে নজরুলের কী কী গান বা কটি গান ছিল তা জানা যায়নি।

কপালকুণ্ডলা

"কপালকুণ্ডলা" চলচ্চিত্রটি মোট পাঁচবার চিত্রায়িত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮১ সালের ১৯ জুন রাধা, পূর্ণ ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। তৃতীয় বার চিত্রায়িত "কপাল কুণ্ডলা" চলচ্চিত্রে নজরুলের আদি সুরে " কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী" গানটি প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হয়। যদিও সুরকার হিসেবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম জানা যায়।

লাইনী মজনু

ইবনে মিজানের ছায়াছবি "লাইলী মজনু" ছায়াছবিতে কবি নজরুলের একটি বিখ্যাত গান কবির মূল সুরে ব্যবহার করা হয়েছে। গানটি হলো-

লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া

মজনু গো আঁখি খোল।

ছায়াছবির গানটিতে কণ্ঠদান করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন, সংগীত পরিচালক ছিলেন মনসুর আহম্মদ।

সুবর্ণ গোলক

কালীমাতা প্রডাকশনস্ নিবেদিত "সুবর্ণ গোলক" ছায়াচিত্রটি ১৯৮১ সালের ১৭ই এপ্রিল রাধা, পূর্ণা, প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। কাহিনি-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক–মানু সেন। গীতিকার– শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছায়াছবিতে নজরুলের "বাগিচায় বুলবুলি তুই" গানটি নজরুলের আদি সুরে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাটির স্বর্গ

মাটির স্বর্গ" ছায়াছবিটি ১৯৮২ সালের ২২ অক্টোবর রুপবাণী, অরুণা ও ভারতী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র।

নীলকণ্ঠ

সান ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল প্রডাকশনস নিবেদিত "নীলকণ্ঠ" ছায়াচিত্রটি ১৯৮৫ সালের ৯ই আগস্ট রাধা ও পূর্ণা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন- দিলীপ রায়। গীতিকার- কাজী নজরুল ইসলাম, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক ছিলেন– জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। "নীলকণ্ঠ" ছায়াছবিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুটি গান মূল সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। গান দুটি হলো-

১। তোমার মহাবিশ্বে প্রভু

হারায় না তো কিছু

২। সৃজন ছন্দে আনন্দে

নাচো নটরাজ।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

১৯৮৮ সালে সচীন সেনগুপ্তের বিখ্যাত নাটক "সিরাজদ্দৌলা" ঢাকায় দ্বিতীয়বার চিত্রায়িত করা হয় "নবাব সিরাজদ্দৌলা" নামে। সংগীত পরিচালনা করেন-আমীর হোসেন।

এই ছায়াছবিতে ও নজরুলের দুটি গান সাবিনা ইয়াসমীন ও সুবীর নন্দী দ্বারা গীত হয়েছে। গান দুটি হলো-

১। পথ হারা পাখি

কেঁদে ফিরি একা

২। এ কূল ভাঙে ও কুল গড়ে

এই তো নদীর খেলা।

আগমন

অনুপমা ফিল্মস প্রযোজিত "আগমন" ছায়াছবিটি ১৯৮৮ সালের ২ ডিসেম্বর রাধা, পূর্ণা ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করে। ছায়াছবিটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেন তরুণ মজুমদার। গীতিকার-পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীত পরিচালক- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছায়াছবিতে নজরুল রচিত একটি গান মূল সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। গানটি হলো "শূন্য এ বুকে পাখি মোর"। গানটিতে কণ্ঠদান করেন হৈমন্তী শুক্লা।

ভালোবাসা ও অধিকার

মনি মৃধা প্রডাকশন নিবেদিত " ভালোবাসা ও অধিকার" ছায়াছবিটি ১৯৯২ সালের ২৭ মার্চ ইন্দিরা ও পূরবী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-দীপরঞ্জন বসু, গীতিকার-কাজী নজরুল ইসলাম ও বাপী দাস। সংগীত পরিচালনা করেন- গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ছায়াছবিতে নজরুলের "তুমি আমার সকাল বেলার সুর" গানটি মূল সুরে ব্যবহৃত হয়।

আব্বাজান

"আব্বাজান" ছায়াছবিটি ১৯৯৪ সালের ২ জুলাই মিনার, বিজলী ও ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। সুরকার ছিলেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুলের কী কী গান ও কটি গান ছায়াছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা যায় নি।

গজমুক্তা

১৯৯৪ সালের ১৩ মে "গজমুক্তা" সিনেমাটি মিনার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। সুরকার ভূপেন হাজারিকা। নজরুলের কী কী গান ব্যবহৃত হয়েছে জানা যায়নি।

এবার আসি এমন কিছু ছায়াছবির কথায়, যে সকল ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকারগণ নজরুলের কথা ও সুরকে নিজেদের লেখা ও সুর বলে ব্যবহার করেছেন নজরুলের কোনরুপ স্বীকৃতি ছাড়াই এমন কিছু ছায়াছবির কথা উল্লেখ করা হলো-

মেরে সুরৎ তেরী আঁখে

এই ছায়াছবিটিতে প্রখ্যাত সুরকার শচীন দেব বর্মন নজরুলের কোন স্বীকৃতি ছাড়া নজরুলের নিজের করা সুরকে নিজের সুর হিসেবে ছায়াছবিতে ব্যবহার করেছেন। ছায়াছবিতে শিল্পী মান্না দের গাওয়া "পুছনা ক্যায়সে" হিন্দি গানের সুর নজরুলের বিখ্যাত বাংলাগান, "অরুণ কান্তি কে গো" সুরের প্যারোডি।

মেরে অঙ্গনে

১৯৭০ সালে "মেরে অঙ্গনে" ছায়াছবিটি মুক্তিলাভ করে। সংগীত পরিচালক ছিলেন শচীনদেব বর্মন। এ ছায়াছবিতে লতা মুঙ্গেশকর দ্বারা গীত "তাজ একেলি যায়" হিন্দি গানটি নজরুলের বিখ্যাত বাংলা গান "মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে" গানের প্যারোডি। এই গানেও কুমার শচীনদেব বর্মন নজরুলকে কোন স্বীকৃতি দেননি।

অফসার

এই ছায়াছবিটির সংগীত পরিচালক ছিলেন কুমার শচীনদেব বর্মন। ছবিটিতে নজরুলের স্বীকৃতি ছাড়া তাঁর লেখা ও সুর করা "পদ্মার ঢেউরে" গানের সুরে "পদমার লহরায়" হিন্দি গানটি শচীন দেব বর্মন ব্যবহার করেন।

ভালোবাসা ও অন্ধকার

এই ছায়াছবিতে "তুমি আমার সকাল বেলার সুর" এই গানটি নজরুলের স্বীকৃতি ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছিলেন।

ছদ্মবেশে

এই ছায়াছবিতে নজরুলের দুটি গান ব্যবহৃত হয়। গান দুটি হলো "বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুণী ফাঁদে" ও "তোমার আঁখির মত আকাশের দুটি তারা"। কণ্ঠ দিয়েছিলেন মান্না দে। আর কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বলিদান

এই ছায়াছবিতে সানি পাণ্ডের রচিত একটি গানে নজরুলের "শূন্য এ বুকে পাখি মোর" গানের সুর ব্যবহার করা হয়েছে। কণ্ঠ দিয়েছেন অজয় চক্রবর্তী। নজরুলের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়নি।

দীপার প্রেম

এই ছায়াছবিতে নজরুলের বিখ্যাত গান " শুকনো পাতায় নূপুর পায়ে" গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়নি।

নতুন দিনের আলো

সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ নজরুলের "চল্ চল্ চল্" গানের সুর দিয়ে ছায়াছবির শুরু করলেও ছায়াছবিতে নজরুলের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেননি।

বর্তমানে বাংলাদেশে নির্মিত ছায়াছবিতেও নজরুলের গান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সোনালী আকাশ

সোনালী আকাশ ছায়াছবিটি ১৯৮৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত। এই ছায়াছবিতে নজরুলের দুটি গান ব্যবহৃত হয়েছে।

১। মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম

২। গাছের তলে ছায়া আছে।

চন্দ্রকথা

কাহিনীকার হুমায়ুন আহম্মেদ পরিচালিত চন্দ্রকথা ছায়াছবিটি ২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত। সুরকার ও সংগীত পরিচালক মকসুদ জামিল মিন্টু। এই ছায়াছবিতে নজরুলের "পথ হারা পাখি" গানটি ব্যবহৃত হয়েছে।

মেহের নিগার

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত মেহের নিগার ২০০৫ সালে মুক্তি লাভ করে। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল ও ইমন সাহা। ছবিটি পরিচালনা করেছেন–অভিনেত্রী মৌসুমী ও মুশফিকুর রহমান গুলজার। এই ছায়াছবির কাহিনি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত। এই ছবিতে নজরুল ইসলামের এগারটি গান ব্যবহৃত হয়েছে। গানগুলি হলো-

১। পরো, পরো চৈতালী সাজে কুসুমি শাড়ি

২। আজ এ শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে (যন্ত্র সংগীত)

৩। হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল

৪। তুমি কি দক্ষিণা পবণ

৫। দূরদীপ বাসিনী

৬। আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া

৭। সখি সে হরি কেমন বল (যন্ত্র সংগীত)

৮। প্রিয় এমন রাত যেন যায়না বৃথাই

৯। পরদেশী মেঘ যাওরে ফিরে

১০। নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল

১১। পরজনমে দেখা হবে প্রিয়

রাক্ষুসী

মতিন রহমান পরিচালিত রাক্ষুসী ছায়াছবিটি ২০০৬ সালে মুক্তি প্রাপ্ত। এই ছায়াছবিটির সংগীত পরিচালনা করেন এস. আই. টুটুল। এই ছায়াছবিতে নজরুলের দুটি গান ও এস. আই. টুটুলের সুরে নজরুলের দুটি কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে-

১। আয় ওলো সই খেলবি খেলা

২। ও রে নাইয়া ধীরে চালাও তরণী

কবিতা অবলম্বনে গান-

১। গিন্নির চেয়ে শালী ভালো

২। ও মোরে মেঘ যবে জল দিল

দারুচিনি দ্বীপ

তৌকির আহমেদ পরিচালিত দারুচিনি দ্বীপ ছায়াছবিটি ২০০৭ সালে মুক্তিলাভ করে। কাহিনিকার হুমায়ূন আহমেদ। এই ছায়াছবিতে নজরুলের একটি গান ব্যবহৃত হয়। গানটি হলো- "দূর দীপ বাসিনী চিনি তোমারে চিনি"।

দুষ্টু ছেলে মিষ্টি মেয়ে

উত্তম আকাশ পরিচালিত "দুষ্টু ছেলে মিষ্টি মেয়ে" ছায়াছবিতে নজরুলের "মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী" গানটি সংগীত শিল্পী "আগুন" এর কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছিল।

উপসংহার

সাহিত্যের অন্য যে কোন শাখার চেয়ে গানেই নজরুলের স্বকীয়তার প্রকাশ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সার্থক। বাণী ও বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায়, সুরের ইন্দ্রজালে নজরুলের গান অনন্যসাধারণ। নজরুল নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন-

> "সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই, তবে
> এই টুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।"[১২]

১৯৩১ থেকে ১৯৪২ সাল (অর্থাৎ কবি অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত) এই দশ বছর নজরুলের জীবনের একটি অন্যতম দিক হলো - চলচ্চিত্র। কবি নজরুল এই দশটি বছর চলচ্চিত্রাঙ্গনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।

বাঙালি মুসলমানগণ সাহিত্য ও সংগীত জীবনে পশ্চাৎপদ থাকলেও সে অঙ্গনে তাদের কিছু পদচারণা ছিল। কিন্তু অভিনয় নাটক এবং ছায়াছবির জগতের

[১২] আব্দুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী-৫ম খণ্ড*-[ঢাকা, বাংলা একাডেমি ১৯৮৪, পৃ.- ১৭৭। সন্তোষ ঢালী, *নজরুলের কবিতা ও গানে লোকজ উপাদান*, কবি নজরুল ইনিস্টিটিউট, প্রথম প্রকাশ-ফাগুন ১৪২৫/ফেব্রুয়ারী-২০১৯, পৃ.-২৮৪।

সঙ্গে তাদের প্রায় কোন সম্পর্কই ছিলো না। নজরুল শুধু সঙ্গীতচর্চায় অসাধারণ সাহসী ভূমিকা রাখেননি। চলচ্চিত্রেও যে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন তা অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। বাঙালি মুসলমানরাও যাতে এই জগৎটিতে প্রবেশ করতে পারে তারই প্রথম দিক উন্মোচন করেন এবং সেখানে তিনি গোড়ামি বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের চিহ্নও রাখেননি।

পরিশেষে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেরণাদাতা তেমনি নজরুল আজো আমাদের জীবনের সকল দুর্যোগ ও দুর্দিন অতিক্রম করার সাহস ও শক্তিদাতা।

সহায়ক গ্রন্থ

১। আসাদুল হক, *চলচ্চিত্রে নজরুল*, বইপড়া, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০১৩

২। অনুপম হায়াৎ, *চলচ্চিত্র জগতে নজরুল*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ আশ্বিন

১৪০৫/ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

৩। আব্দুল আযীয আল-আমান-সম্পাদিত *নজরুলগীতি* (অখণ্ড) হরফ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ৬ আশ্বিন ১৩৮৫, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।

৪। সন্তোষ ঢালী, *নজরুলের কবিতা ও গানে লোকজ উপাদান*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রথম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২৫/ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

৫। সম্পাদনা- শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় *নজরুল: সংগীত ও সাহিত্য কোষ*, প্রকাশ- মূনীর বিন আবদুল আযীয, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ২৫ মে ২০১৭।

৬। ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল সংগীতের সুর*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম সংস্করণ- আষাঢ় ১৪০৪/জুন-১৯৯৭।

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুহম্মদ মনিরুল হক *

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম শিক্ষার মতো একটি পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চ–শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ পথনির্দেশ। শিক্ষাক্রমে একটি দেশের শিক্ষার দর্শন প্রতিফলিত হয়, শিক্ষানীতির উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হয়। সে কারণে রাষ্ট্রের সমসাময়িক চাহিদা, নিজস্ব সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে শিক্ষাক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শিক্ষা উপ-ব্যবস্থার সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্ম হয়। এসব উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে কোনো দেশ বা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা। জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম। দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে "পৃথিবীর সকল দেশে জাতীয় ইতিহাস পাঠ প্রায় বাধ্যতামূলক, যে দেশসমূহ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়েছে, আন্দোলন বা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে– সেসব দেশে জাতীয় ইতিহাস পাঠ কেবলমাত্র বাধ্যতামূলকই নয়, বরং একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানে জাতীয় ইতিহাস পড়ানো হয়।"[১]

* ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন হলেও দেশ, সমাজ, প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির সংকটটি প্রশ্নাতীত। সোনার মানুষ তৈরি করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চশিক্ষায় মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ প্রসারিত করেছিলেন। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিকের উদাহরণ হিসেবেও তিনি অদ্বিতীয় এবং মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন, বক্তৃতা-বিবৃতি, গ্রন্থ, স্মারক, স্মৃতি বাংলাদেশের ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। দেশ, মাটি ও জনগণের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি দায়িত্বশীল, দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূলবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্য বিবেচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সকল শ্রেণিতে পাঠ্যযোগ্য বিষয়। আলোচ্য গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি, অবস্থান ও প্রতিফলন তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

১. ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ;

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ;

৩. ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থান বিশ্লেষণ;

৪. ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব বহুবিধ।

১. উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাক্রমের ধারণা বিষয়ক

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম প্রচলন থাকলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ধারা এখনো পুরোপুরি

বাস্তবায়িত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিজেদের মত করে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচিসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। "সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শিক্ষাক্রম ধারণার আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে উচ্চশিক্ষায় নতুন পাঠ্যক্রম তৈরির কথা বলেছেন।[২] ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীর্ষক গবেষণায় ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সে দিক থেকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষাক্রমের ধারণা দিতে বর্তমান গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২. জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত

একটি দেশের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের কৌশল হলো সে দেশের শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে–

ক. শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হবে। আর সেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হবে যে, প্রকৃত শিক্ষা যেন জীবনঘনিষ্ঠ হয় এবং তা শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে এবং চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক হয়।[৩]

খ. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা ও সঠিক ইতিহাস এবং দেশে বিরাজমান পারিপার্শ্বিকতা, মাতৃভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।[৪]

গ. সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, চেতনা, সঠিক ইতিহাস এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব কাহিনি যথার্থ উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[৫]

ঘ. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা[৬] এবং "জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি।"[৭]

বাংলাদেশের শিক্ষানীতির এ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ। অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের পাশাপাশি উদারনৈতিক, মানবমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি বাঙালির অন্যতম আদর্শ। সুতরাং শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে বর্তমান গবেষণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রেক্ষিত

"শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো"[৮] জাতীয় শিক্ষানীতিরও অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বাংলার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ জনসেবায় এক ঐতিহাসিক ভাষণে আপামর জনসাধারণকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার ডাক দেন এবং ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তদুপরি, রক্তপাতহীন স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং রাজনৈতিক নেতাদের সহিত ঢাকায় আলোচনায় বসেন। কিন্তু, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রিতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালিদের উপর অতর্কিত হামলা চালাইয়া নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটন করিতে থাকে। এমতাবস্থায়, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[৯]

বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেয় এবং বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিজয় অর্জনের এক বৎসরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত ও পাস হয় এবং একই বৎসরের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হয়।[১০]

সংবিধানের ১৫০ (২) অনুচ্ছেদে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত ঘোষণাপত্রে (অনূদিত) বলা হয়েছে,

"... যেহেতু...বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,[১১] এবং ... সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং ...সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতি পূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন... ।[১২]

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪ক এ বলা হয়েছে,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।[১৩]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল [১৫০ (২) অনুচ্ছদ] এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সংবিধানের সপ্তম তফসিল [১৫০ (২) অনুচ্ছদ]-এ উল্লেখ রয়েছে।[১৪]

সুতরাং সংবিধানে উল্লিখিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক অধ্যায়সমূহ সঠিকভাবে পাঠ করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাযথ অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। এ দিক থেকেও বর্তমান গবেষণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪. মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ

বাংলাদেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মুক্তিসংগ্রামের মহান নেতা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো গঠনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন অধিবেশনে তিনি জাতীয় মূলনীতি, রাষ্ট্রের ধরন ও অন্যান্য কাঠামোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আলোচনার দিক থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ নাম।

সাংবিধানিকভাবে আমাদের দেশের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। "১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন এদেশের নাম 'বাংলাদেশ'।[১৫] ২০০৪ সালে বিবিসি এক জরিপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে ঘোষণা করেছে। জীবন ও কর্মের বিভিন্ন স্তরে বঙ্গবন্ধু বাঙালির উন্নয়ন ও মুক্তির জন্যে দিকনির্দেশনা রেখে গেছেন। তাঁর স্মারক গ্রন্থ, ভাষণ ও অন্যান্য কর্ম এ দেশের জনগণের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নেতৃত্ব, রাজনীতি ও জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠ করা হলে বাঙালির জাতীয় জীবন দর্শন ও বাংলাদেশের চূড়ান্ত মুক্তির দর্শনও পাঠ করা হয়। তাই, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি, অবস্থান ও প্রতিফলন কীরূপ তা যাচাইয়ের জন্য এ গবেষণা যুক্তিপূর্ণ।

৫. ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত দিক

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো মানুষই তাঁর উৎস, গৌরবের ইতিহাস ও জাতিবর্ণের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনুসন্ধান করে। একটি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সংশ্লিষ্ট জাতিবর্ণের সাধারণ জনগণকে অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত করে দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এ সবই ইতিহাস পাঠের গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্যদিকে একজন যোগ্য নেতা ও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, শর্ত, দেশপ্রেম, রাজনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গত দিক থেকে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীর্ষক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ববিদ্যালয়

আভিধানিক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হলো বিবিধ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গবেষণা ও ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৭৩ অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুরুত্ব অত্যধিক। তার ঐতিহাসিক ভিত্তিও আছে। "১৯৬২ সালে তৎকালীন আইয়ুব সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল, যাকে কালো আইন হিসেবে অভিহিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু সে কালো আইনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সে কারণে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে সে কালো আইন বাতিল করে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয় যথা: ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়।"[১৬] ১৯৭৩ সালের যে অধ্যাদেশের মাধ্যমে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়, তার প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা আইন তৈরি হয়। এই আইনের অধীনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্দিষ্ট বাস্তবতায় নিজেদের মতো করে নীতি প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও সিনেট।[১৭] বাংলাদেশে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যাগুলোর মধ্যে আকার, আয়তন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকেও এ ৪টি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগণ্য। প্রতিষ্ঠাকালীন দিক থেকেও এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পুরনো। এ সকল দিক বিবেচনা করে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমকে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'শাস' ধাতু থেকে, যার অর্থ হচ্ছে শাসন করা বা উপদেশ দান করা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare বা Educatum থেকে যার অর্থ to lead out অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে নিয়ে আসা।[১৮] শিক্ষা উন্নয়নের চাবিকাঠি। একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। দেশপ্রেম, মানবতা, নৈতিক মূল্যবোধ, কায়িকশ্রম, কায়িকশ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, চরিত্র, সৃজনশীলতা, সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি অর্জনের মূলে রয়েছে শিক্ষা। আর এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন 'শিক্ষাক্রম'।[১৯]

বস্তুত জাতীয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাক্রমের যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হয়।[২০] শিক্ষাক্রম (Curriculum) হলো শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। 'Curriculum' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Currere' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'Currere' শব্দটি প্রাচীন রোমে ব্যবহৃত হতো, যার অর্থ 'Course of Study'। একজন শিক্ষার্থী কী পড়বে, কে পড়াবে, কোথায় পড়বে, কতদিন পড়বে, কীভাবে পড়বে, শিখনসামগ্রী কীরূপ হবে, কী ধরনের শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি নির্দেশনার সমষ্টিতে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়।[২১] শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দিকনির্দেশনা এবং শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার মূল কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে পাঠ্যসূচি (Syllabus) হলো শিক্ষাক্রমের অংশমাত্র। পাঠ্যসূচি মূলত বিষয়সূচি। সুনির্দিষ্ট বিষয় বা সাবজেক্ট-এর অন্তর্গত পাঠ্য-বিষয়ের তালিকাই হলো পাঠ্যসূচি। সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতিফলন পাঠ্যসূচিতে থাকে না। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির বিভাজন সাম্প্রতিককালের। অতীতে শিক্ষাক্রম (Curriculum) ও পাঠ্যসূচিকে (Syllabus) একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে পাঠ্যসূচিকে শিক্ষাক্রমের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষাক্রম। বাংলাদেশের ইতিহাস, রাজনীতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে গুণগত গবেষণা (qualitative research) পদ্ধতিকে এবং তথ্যগত দিক থেকে মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)-কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নরূপ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

১. এ গবেষণায় বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসিত ৪টি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি (ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

২. গবেষণাকালীন (২০২১ সাল) সময়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষাক্রমকে দলিল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এ দিক থেকে এটি এক প্রকার দালিলিক বিশ্লেষণ (documentary analysis)।

৩. ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাকার্যক্রম শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম কিংবা অন্য যে নামেই পরিচালিত হোক না কেন আলোচ্য গবেষণায় তাকে শিক্ষাক্রম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ তাদের স্ব স্ব শিক্ষাক্রমকে (শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম, বিষয়বস্তু, সিলেবাস, কারিকুলাম) যে নামে উল্লেখ করেছে, তাদের স্ব স্ব শিক্ষাক্রম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সে নামও ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় অন্য নামে উল্লেখ থাকলেও সেটিকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৫. অন্য কোনো নামের ইনস্টিটিউট ও বিভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু আলোচ্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বা পর্যবেক্ষণ হয়নি।

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ১: ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	বিষয়বস্তু/Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে

S T U D E N T HANDBOOK Department of History Bachelor of Arts (Honours) From Session 2018-2019 University of Dhaka	স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত সর্বমোট কোর্স সংখ্যা ২৮টি	স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু আছে এমন কোর্স সংখ্যা স্নাতকে ১টি, যার শিরোনাম Emergence of Bangladesh since 1947.	Six Point Programme of Awami League (1966): Background, Launching of Six Point movement by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangabandhu's call for non-violent and non-cooperation movement, Bangabandhu's public meeting of 7 march 1971, Declaration of Independence by Bangabandhu.

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমের শিরোনাম Student Handbook, Department of History, B. A. Honours Programme। উক্ত শিক্ষাক্রমটি জুলাই ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই শিক্ষাক্রমের ২৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে Curiculum, B. A. Honours Programme সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। কাঠামোগত আলোকে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সময়কাল, নম্বর বণ্টন এতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেমিস্টার পদ্ধতিতে ৪ বছরের কোর্স নম্বর, কোর্স শিরোনামসহ Aim, Objectives, Learning Outcomes, Course Conents, Recommended Readings উল্লেখ করে স্নাতক (সম্মান) কোর্স এর জন্য ৮টি সেমিস্টারের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে তৃতীয় বর্ষের ৫ম সেমিস্টার এর কোর্স টাইটেল হলো Emergence of Bangladesh since 1947. ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনায় উক্ত কোর্স এর কনটেন্ট হিসেবে Rule of Muslim League in East Bengal (1947-1954), Language Movement, Election of 1954 and the United Front, Constitutional Crisis and the adoption of 1954, The Ayub Decade, Six Point Programe of Awami League, Agartala Conspiracy Case, 1947-1971: Administrative and political disparity, Bangladesh Liberation War of 1971 and Bangladesh

Liberation War and the rule of Great Powers প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত কোর্স কনটেন্ট এর ৮ নম্বর অংশে Six Point Programme of Awami League (1966): Background, Launching of Six Point movement by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman এবং ১২ নম্বরে Bangabandhu's call for non-violent and non-cooperation movement, Bangabandhu's public meeting of 7 march 1971, Declaration of Independence by Bangabandhu, Mujibnagar Government and the Proclamation of Independence Order শিরোনোমে বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। Recommended Readings এ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে।[২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তরের ২০১৮-২০১৯ সেশনের শিক্ষাক্রমের কোনো কনটেন্ট-এ বঙ্গবন্ধুর নাম নেই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ২: ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে

Curriculum for B.A. (Honours) Session 2018-2019 Department of Histoty University of Rajshahi	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ৪৫টি	স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট আছে এমন কোর্স সংখ্যা: ১টি যার শিরোনাম: History of Bangaldesh এবং স্নাতকোত্তরে ১টি কোর্স যার শিরোনাম Liberation Movement and Contemporary Bangladesh.	Sheikh Mujibur Rahman. Mujib Era, Coup d Õetat of 1975 and its after-effects.

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮-২০১৯ সেশন থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত Curriculum for B.A. (Honours) বিভাগের ১ম থেকে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয়েছে, চতুর্থ বর্ষের ৪০৮নং কোর্স এর শিরোনাম History of Bangaldesh. উক্ত কোর্স এর Bengali political leadership অংশে Sheikh Mujibur Rahman উল্লেখ আছে।[২৩]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ সেশনের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের Curriculum for Masters Degree পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে, ৫০৬নং কোর্স এর শিরোনাম Liberation Movement and Contemporary Bangladesh. উক্ত কোর্স এ Mujib Era, Coup d 'etat of 1975 and its after-effects নামে কনটেন্ট আছে।[২৪] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষাক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত কোনো গ্রন্থের নাম বুক রেফারেন্স-এ উল্লেখ নেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ৩: ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু:

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে
Syllabus for B.A. (Honours), Course Session 2019-2020, 2020-2021 Department of Histoty University of Chittagong	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ২৯টি	স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট আছে স্নাতকে ১টি যার শিরোনাম: History of Bangladesh since 1971 এবং স্বাতকোত্তরে ১টি যার শিরোনাম শিরোনাম South Asia Since 1947.	Various Crisis of Sheikh Mujibur Rahman period, The role of Sheikh Mujib Government in reconstructing Bangladesh, Bangladesh-India relations during the time of Sheikh Mujibur Rahman, Role of Sheikh Mujibur Rahman in the Creation of Bangladesh and administration.

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম বর্ষ ২০২০, ২০২১, দ্বিতীয় বর্ষ ২০২১, ২০২২, তৃতীয় বর্ষ ২০২২, ২০২৩ এবং চতুর্থ বর্ষ ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের পরীক্ষার জন্য প্রণীত Syllabus for B.A. (Honours), Course Session 2019-2020, 2020-2021, Department of History এর শিক্ষাবর্ষ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত সকল কোর্সের Course Outline এবং Book Recommended উল্লেখ আছে। Course: His-302 Emergence of Bangladesh, 1947-1971) এ Six points programme of the Awami League, Agartala Conspiracy, Mujibnagar Government and its activities নামে কনটেন্ট আছে, বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ নেই। Course:

His-402 এ History of Bangladesh since 1971 এ Various Crisis of Sheikh Mujibur Rahman period, The role of Sheikh Mujib Government in reconstructing Bangladesh, Bangladesh-India relations during the time of Sheikh Mujibur Rahman নামে কনন্টে আছে।[২৫]

Syllabus for Masters Degree, Year of Examination-2020, 2021, Department of History, Univerity of Chittagong পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, Outline এবং Books Recommended এর অংশ নিয়ে প্রতিটি কোর্স সাজানো হয়েছে। ৫০৪নং কোর্স এর শিরোনাম South Asia Since 1947. এতে Role of Sheikh Mujibur Rahman in the Creation of Bangladesh and administration নামে কনটেন্ট আছে। অন্য কোনো কোর্সের কোনো অংশ বা কনটেন্ট এ বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ নেই।[২৬]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত কোনো গ্রন্থের নাম বুক রেফারেন্স-এ উল্লেখ নেই।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ৪: ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু:

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে

ইতিহাস বিভাগ, পাঠ্যক্রমের বিবরণ জাহাঙ্গী-রনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ৩১টি	স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট আছে এমন কোর্স সংখ্যা স্নাতকে ১টি যার শিরোনাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১৯০৫–১৯৭১) এবং স্নাতকোত্তরে ১টি যার শিরোনাম History of Bangladesh, From 1971—Selected themes	Sheikh Mujibur Rahman & Six Points Sk. Mujib Regime (1972-75)। The Rule of SK. Mujib, The formation of BKSAL and fourth Amend-ment.The fall of SK. Mujib Regime:

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমের শিরোনাম ইতিহাস বিভাগ, পাঠ্যক্রমের বিবরণ। এতে প্রথম পর্ব নামে ৭টি, দ্বিতীয় পর্ব নামে ৮টি, তৃতীয় পর্ব নামে ৮টি এবং চতুর্থ পর্ব নামে ৮টি কোর্স এর নাম উল্লেখ করে নির্বাচিত বিষয়বস্তুও উল্লেখ হয়েছে। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১৯০৫–১৯৭১) এর নির্বাচিত বিষয়বস্তুতে Sheikh Mujibur Rahman & Six Points শিরোনামে কনটেন্ট ছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কনটেন্ট নেই। Recommended Books-এ শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা বা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত কোনো গ্রন্থের নাম নেই।[২৭]

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া ইতিহাস বিভাগ, স্নাতকোত্তরের জন্য M.A. Syllabus: Contempory World (Any Seven) শিরোনামে লেখা মোট ২২টি কোর্স পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, History of Bangladesh, From 1971—Selected themes কোর্স ছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কনটেন্ট নেই। History of Bangladesh এর Course Content এর ২-এর শিরোনাম হচ্ছে Sk. Mujib Regime (1972-75)। এতে লেখা আছে The Rule of SK. Mujib, Government and opposition parties Background of Parliamentary Politics of Bangladesh. The formation of BKSAL and fourth Amendment.

The fall of SK. Mujib Regime: । জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমের বুক রেফারেন্স-এ শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত কোনো গ্রন্থের নাম উল্লেখ নেই।[২৮]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ৫: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে
Curriculum & Syllabus Bachelor of Social Science Honours Program under Semester System Sessions: 2018-19 to 2020-21 Department of Political Science University of Dhaka	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ৩২টি	স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট আছে এমন কোর্স সংখ্যা স্নাতকে ১টি যার শিরোনাম Political and Constitutional Development in Bangladesh (1971-till date)	Performance of Mujib Government

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Curriculum & Syllabus, Bachelor of Social Science, Department of Political Science শিরোনামে ২০১৮-২০১৯ সেশন থেকে ২০২০-২০২১ সেশন পর্যন্ত প্রযোজ্য শিক্ষাক্রমে Learnig Objective, Course Outline, Learning Outcome উল্লেখ করে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ৪ বছরের সম্মান কোর্স এর কথা বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) এর Course Outcome এর ৩০৩নং Socio-Political and Constitutional Development in Pre-Independent Bangladesh শীর্ষক কোর্সের Course Outline অংশে 6-Point and Autonomy Movement, General Election of 1970, Non cooperation movement-March 1971, Garilla War শিরোনামে কনটেন্ট আছে। বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কনটেন্ট নেই। পঞ্চম সেমিস্টার এর ৫০১নং কোর্স এ Political and Constitutional Development in Bangladesh (1971-till date) এর Course Outline এ Performance of Mujib Government নামে কনটেন্ট আছে।[২৯]

২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত সেশনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতকোত্তর এবং এম.ফিল এর জন্য প্রণীত Curriculum & Syllabus, M.S.S. Program under Semester & M.Phil. Program শিরোনামের বইয়ে স্নাতকোত্তর (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এর জন্য মোট ৮টি কোর্স এর উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে ৯০৩নং কোর্স এর শিরোনাম Bangladesh Politics: Issues and Problem. উল্লিখিত কোর্স এর Course Outline অংশে background of political leaders নামে কনটেন্ট আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কনটেন্ট নেই।[৩০]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ৬: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে
Syllabus for four-Year B.S.S (Honours) Programme in Political Science Session 2017-2018 Department of Political Science University of Rajshahi	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ২৯টি	বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ-পূর্বক কনটেন্ট আছে এমন কোর্স সংখ্যা স্নাতকে ১টি যার শিরোনাম Politics and Personalities in Indian Sub-Continent	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Syllabus for four-Year B.S.S (Honours) Programme in Political Science, University of Rajshahi পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, Politics and Personalities in Indian Sub-Continent শীর্ষক কোর্স এ কনটেন্ট হিসেবে Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman এর নাম উল্লেখ আছে। Course PS-204 এর শিরোনাম Government and Politics (1972-till date)। এর কনটেন্ট অংশে লেখা আছে "Second Revelution" and the fall of the Awami League regime. স্নাতক (সম্মান) এর বুক রেফারেন্স এ বঙ্গবন্ধু লিখিত কোনো বইয়ের উল্লেখ নেই।[৩১]

Syllabus for M.S.S in Political Science (General and Thesis Group), University of Rajshahi পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স বা কনটেন্ট নেই। বুক রেফারেন্স-এ বঙ্গবন্ধুর লেখা কোনো বইয়ের উল্লেখ নেই।[৩২]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ৭: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contents এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে
Syllabus Department of Political Science Sessions 2017-2018, 2018-2019 University of Chittagong	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ৩৪টি	বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট আছে এমন কোর্স সংখ্যা স্নাতকে ১টি যার শিরোনাম Leadership and Politics	Sheikh Mujibur Rahman

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ২০১৮

২০১৮ সালে প্রকাশিত এবং ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ সেশনের জন্য প্রয়োজ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Syllabus পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়েছে, স্নাতক (সম্মান) এর ৪০৫নং কোর্স এ Hazi Shariatullh, Nawab Sir Salimullah, Nawab Abdul Latif, Subas Chandra Bose, Abul Hasem, Begum Rokeya, Comrade Mozaffar Ahmed, A. K. Fazlul Huque, Maulana Bhashani, H. S. Suhrawardy, Moni Singh, Sheikh Mujibur Rahman and Ziaur Rahman উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩]

২০১৮ সালে প্রকাশিত এবং ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ সেশনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য প্রযোজ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of Political Science এর Syllabus পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কনটেন্ট নেই। Bangaldesh Politics: Problems & Issues নামে একটি কোর্স আছে। বঙ্গবন্ধুর লেখা কোনো গ্রন্থের নাম বুক রেফারেন্স-এ নেই।[৩৪]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারণি ৮: সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের নাম, কোর্স সংখ্যা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স সংখ্যা ও Course Contents বা বিষয়বস্তু

শিক্ষাক্রমের নাম ও যে শিক্ষাবর্ষ হতে চালু হয়েছে	কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	Contentং এ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করা হয়েছে
Bachelor of Social Science (Honors) Syllabi Sessions: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 Department of Government and Politics, Jahangirnagar University	স্নাতক (সম্মান) এ মোট কোর্স সংখ্যা ৩২টি	স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কোর্স নেই। বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখপূর্বক কনটেন্ট আছে এমন কোর্স সংখ্যা স্নাতকে ২টি যার শিরোনাম Liberation War and Genocide in Bangladesh এবং Oriental Political Thought: Modern	Contribution and Struggle of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Nation. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Bachelor of Social Science (Honors) Syllabi শিরোনামে সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ সেশনের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, GP-206: Liberation War and Genocide in Bangladesh শীর্ষক কোর্স এ Contribution and Struggle of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Nation নামে কনটেন্ট আছে। GP-301: Oriental Political Thought: Modern শীর্ষক কোর্স এ Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman উল্লেখ আছে। সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ সেশনের স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান

হয়েছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কনটেন্ট নেই। স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের Selected Readings এ শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত কোনো গ্রন্থের নাম নেই।[৩৫]

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারণি ৯: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনামূলক অবস্থান:

বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রেণি	যে কোর্স এর Contents-এ বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ আছে	বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করে Contents বা বিষয়বস্তু	রেফারেন্স এ বঙ্গবন্ধু লিখিত গ্রন্থের নাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	Emergence of Bangladesh since 1947	Launching of Six Point movement by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangabandhu's call for non-violent and non-cooperation movement, Bangabandhu's public meeting of 7 march 1971, Declaration of Independence by Bangabandhu.	*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*
	স্নাতকোত্তর	নেই	নেই	নেই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	History of Bangaldesh	Sheikh Mujibur Rahman	নেই
	স্নাতকোত্তর	Liberation Movement and Contemporary Bangladesh	Mujib Era, Coup d etat of 1975 and its after-effects	
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	History of Bangladesh since 1971	Various Crisis of Sheikh Mujibur Rahman period, The role of Sheikh Mujib Government in reconstructing Bangladesh, Bangladesh-India relations during the time of Sheikh Mujibur Rahman.	নেই
	স্নাতকোত্তর	নেই	নেই।	
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (১৯০৫–১৯৭১)	Sheikh Mujibur Rahman & Six Points.	নেই
	স্নাতকোত্তর	History of Bangladesh, From 1971—Selected themes	Sk. Mujib Regime (1972-75)। The Rule of SK. Mujib, Government and opposition parties Background of Parliamentary Politics of Bangladesh. The formation of BKSAL and fourth Amendment. The fall of SK. Mujib Regime:	

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স নেই। ইতিহাস স্নাতক (সম্মান) এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম Emergence of Bangladesh since 1947, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম History of Bangaldesh এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম History of Bangladesh since 1971- এ বিষয়বস্তুর কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি, কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষ ও আংশিকভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিফলিত হয়েছে।

ইতিহাস স্নাতকোত্তরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম Liberation Movement and Contemporary Bangladesh এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম History of Bangladesh, From 1971—Selected themes এ বিষয়বস্তুর কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি, কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষ ও আংশিকভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিফলিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, স্নাতক (সম্মান) বিভাগের শিক্ষাক্রমের Recommended Readings এ শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের Recommended Books এ শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কোনো গ্রন্থের নাম নেই।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারণি ১০: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনামূলক অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রেণি	যে কোর্স এর Contents বা বিষয়বস্তুতে বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ আছে	বঙ্গবন্ধুকে উল্লেখ করে Contents বা বিষয়বস্তু	রেফারেন্স এ বঙ্গবন্ধু লিখিত গ্রন্থের নাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	Political and Constitutional Development in Bangladesh (1971-till date)	Performance of Mujib Government	নেই
	স্নাতকোত্তর	নেই	নেই	নেই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	Politics and Personalities in Indian Sub-Continent	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman	নেই
	স্নাতকোত্তর	নেই	নেই	
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	Leadership and Politics	Sheikh Mujibur Rahman.	নেই
	স্নাতকোত্তর	নেই	নেই।	
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক (সম্মান)	Liberation War and Genocide in Bangladesh এবং Oriental Political Thought: Modern	Contribution and Struggle of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Nation. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman	নেই
	স্নাতকোত্তর	নেই	নেই	

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতক (সম্মান) এর ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম Political and Constitutional Development in Bangladesh (1971-till date), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম Politics and Personalities in Indian Sub-Continent, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১টি কোর্স যার নাম Leadership and Politics এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি কোর্স যার নাম Liberation War and Genocide in Bangladesh এবং Oriental Political Thought: Modern এ বিষয়বস্তুর কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি, কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষ ও আংশিকভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিফলিত হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতকোত্তরে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোর্স-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ নেই।

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরের কোনো কোর্স এর বুক রেফারেন্স-এ শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কোনো গ্রন্থের নাম নেই।

৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স ও Contents বা বিষয়বস্তুর হার

সারণি ১১: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক (সম্মান) এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স ও Contents বা বিষয়বস্তুর হার

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মোট কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স সংখ্যা	কোর্স এর বিষয়বস্তু হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম আছে এমন কোর্স সংখ্যা	শতকরা হার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৮	০০	১	৩.৫৭
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যা-লয়	৪৫	০০	২	৪.৪৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২৯	০০	১	৩.৪৪
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩১	০০	২	৬.৪৫
সর্বমোট	১৩৩	০০	৬	৪.৫১

উৎস: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রম

সারণি ১১ এ দেখা গেছে, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ১৩৩টি কোর্স এর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কোর্স নেই। কনটেন্ট/আধেয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ আছে মোট ৬টি কোর্স এ, যা মোট কোর্স সংখ্যার ৪.৫১%।

সারণি ১২: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স ও Contents বা বিষয়বস্তুর হার

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মোট কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স সংখ্য	কোর্স এর বিষয়বস্তু হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম আছে এমন কোর্স সংখ্যা	শতকরা হার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩২	০০	১	৩.১৩
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৯	০০	১	৩.৪৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪	০০	১	২.৯৪
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩২	০০	২	৬.২৫
সর্বমোট	১২৭	০০	৫	৩.৯৪

উৎস: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের *শিক্ষাক্রম*

সারণি ১২ এ দেখা গেছে, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) এর ১২৭টি কোর্স এর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কোর্স নেই। কনটেন্ট/আধেয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ আছে মোট ৫টি কোর্স এ, যা মোট কোর্স সংখ্যার ৩.৯৪%।

সারণি ১৩: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৮টি বিভাগের স্নাতক (সম্মান) এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স ও Contents বা বিষয়বস্তুর তুলনামূলক অবস্থান :

সর্বমোট কোর্স সংখ্যা	বঙ্গবন্ধুর নামে কোর্স সংখ্যা	Contents এ বঙ্গবন্ধুর নাম আছে এমন কোর্স সংখ্যা

ইতিহাস বিভাগ	১৩৩	০০	৬ *(৪.৫১)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	১২৭	০০	৫ *(৩.৯৪)
সর্বমোট	২৬০	০০	১১ *(৪.২৩)

উৎস: ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের *শিক্ষাক্রম*

*বন্ধনির মধ্যে সারি শতকরা হার

সারণি ১৩ এ দেখা গেছে, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) এর মোট কোর্স সংখ্যা ২৬০টি। তার মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোনো কোর্স নেই। যে সকল কোর্স এর কনটেন্ট/ আধেয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ আছে সে সকল কোর্স সংখ্যা মোট ১১টি। যা মোট কোর্স সংখ্যার ৪.২৩%।

ইতিহাস বিভাগের বিষয়বস্তুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উল্লেখ করার ভাষারূপ এবং পূর্বাপর বিষয়বস্তু সারণি ১৪: ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করার ভাষারূপ বা পরিভাষা এবং তার আগের ও পরের Contents বা বিষয়বস্তু :

বিশ্ববিদ্যা-লয়	কোর্স নং	বঙ্গবন্ধুর নামের ভাষারূপ	আগের Con-tents বা বিষয়বস্তু	পরের Con-tents বা বিষয়বস্তু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩১১	Launching of Six Point movement by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangabandhu's call for non-violent and non-cooperation movement, Bangabandhu's public meeting of 7 march 1971, Declaration of Independence by Bangabandhu,	Six Point Programme of Awami League (1966), Background	Mujibnagar Government and the Proclamation of Independent Order
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৪০৮	Sheikh Mujibur Rahman.	Abdul Hamid Khan Bhasani	Military rule of 1969
	৫০৬	Mujib Era, Coup d Õetat of 1975 and its after-effects.	1972 Consitution and its amendments	Martial Law regimes: Zia and Ershad Periods
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৪০২	Various Crisis of Sheikh Mujibur Rahman period, The role of Sheikh Mujib Government in reconstructing Bangladesh, Bangladesh-India relations during the time of Sheikh Mujibur Rahman	The Consitution of 1972	Military intervention in Bangladesh Politics, Civilianization process of Ziaur Rahman.

জাহাঙ্গী-রনগর বিশ্ববিদ্যা-লয়	৪০১	Sheikh Mujibur Rahman & Six Points	1962 Constitution and Autonomy Movement in East Pakistan	1969 Movement and the fall of Ayub Khan
	৫০৫	Sk. Mujib Regime (1972-75) The Rule of SK. Mujib The formation of BKSAL and fourth Amendment. The fall of SK. Mujib Regime:	Emergence of Bangladesh	General Ziaur Rahman and Civilianijation process, Formation of B.N.P. Green Revolution

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপস্থাপন করতে Bangabandhu উল্লেখ করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখ হয়েছে Sheikh Mujibur Rahman এবং Mujib Era. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা হয়েছে Sheikh Mujibur Rahman ও Sheikh Mujib. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখ হয়েছে Sheikh Mujibur Rahman, Sk. Mujib, SK. Mujib.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Six Point Programme of Awami League (1966), Background এবং পরের বিষয়বস্তু হলো Mujibnagar Government and the Proclamation of Independent Order.

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Abdul Hamid Khan Bhasani এবং পরের বিষয়বস্তু হলো Military rule of 1969.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো The Consitution of 1972 এবং পরের বিষয়বস্তু হলো Military intervention in Bangladesh Politics, Civilianization process of Ziaur Rahman.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Emergence of Bangladesh এবং পরের বিষয়বস্তু হলো General Ziaur Rahman and Civilianijation[sic] process, Formation of B.N.P. Green Revolution.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিষয়বস্তুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উল্লেখ করার ভাষারূপ এবং পূর্বাপর বিষয়বস্তু

সারণি ১৫: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার ভাষারূপ বা পরিভাষা এবং তার আগের ও পরের Contents বা বিষয়বস্তু:

বিশ্ববিদ্যালয়	কোর্স নং	বঙ্গবন্ধুর নামের ভাষারূপ	আগের Contents বা বিষয়বস্তু	পরের Contents বা বিষয়বস্তু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৫০১	Performance of Mujib Government	Participation and Legitimacy Crises	Constitutional amendments
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১০৬	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman	Maulana A. Hamid Khan Bhasani	Selected Readings:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৪০৫	Sheikh Mujibur Rahman	Moni Singh	Ziaur Rahman

জাহাঙ্গী-রনগর বিশ্ববিদ্যা-লয়	২০৬	Contribution and Strug-gle of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rah-man, the father of the Nation.	Back-ground of the Libera-tion War of 1971	Mujib-nagar Govern-ment
	৩০১	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman	Professor Abdur Razzaq	Amartya Sen and Edward Said.

উৎস: *শিক্ষাক্রম*, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপস্থাপন করতে Mujib লেখা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা হয়েছে Bangabandhu. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখ হয়েছে Sheikh Mujibur Rahman. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা হয়েছে The father of the Nation ও Bangabandhu.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Participation and Legitimacy Crises এবং পরের বিষয়বস্তু হলো Constitutional amendments.

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Maulana A. Hamid Khan Bhasani এবং পরের অংশ হলো Selected Readings.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Moni Singh এবং পরের বিষয়বস্তু হলো Ziaur Rahman.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে Contents বা বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখ

করার আগের Contents বা বিষয়বস্তু হলো Professor Abdur Razzaq এবং পরের বিষয়বস্তু হলো Amartya Sen and Edward Said.

ফলাফল উপস্থাপন ও মূল্যায়ন

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীর্ষক গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভুক্তি সন্তোষজনক নয়, তাঁকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। শিক্ষাক্রমে তাঁর অবস্থান, সম্মান, মর্যাদা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে–

১. ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীর্ষক কোনো কোর্স নেই। বাস্তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো দিয়েছেন। ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন অধিবেশনের ভাষণে তিনি জাতীয় মূলনীতি, রাষ্ট্রের ধরন ও অন্যান্য কাঠামোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ দিক থেকেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতি শিক্ষার অনুক্রম। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কোর্স ও কনটেন্ট থাকা যেমন কাম্য, তেমনি জাতীয়তাবোধ, মুক্তিসংগ্রাম, জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি দায়িত্বশীল ও শ্রদ্ধাশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে কোর্স থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁর অবদানও অনস্বীকার্য। এ কারণে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির ইতিহাস ও রাজনীতি পাঠ অংশে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠ করার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে, ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সর্বমোট ২৬০টি কোর্স এর মধ্যে Contents/আধেয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ আছে মোট ১১টি কোর্স-এ, যা মোট কোর্স সংখ্যার ৪.২৩ শতাংশ। তার মধ্যে ইতিহাস বিভাগের ১৩৩টি কোর্স এর মধ্যে ৬টি Contents/

আধেয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ আছে, যা মোট কোর্স সংখ্যার ৪.৫১ শতাংশ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১২৭টি কোর্স এর মধ্যে ৫টি Contents/আধেয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা মোট কোর্স সংখ্যার ৩.৯৪ শতাংশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপস্থাপনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাঁর নামের আগে জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ৮টি বিভাগের মধ্যে মাত্র ১টি (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ) বিভাগে 'father of the nation উল্লেখ হয়েছে। বাকি ৭টি বিভাগের শিক্ষাক্রমে 'জাতির পিতা' বা 'father of the nation' উল্লেখ নেই। ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মধ্যে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে বঙ্গবন্ধু 'Bangabandhu' উল্লেখ আছে। ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মধ্যে রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষাক্রমে 'Bangabandhu' উল্লেখ আছে।

২. কোনো মহান ব্যক্তির অবদানকে উপস্থাপন করার আগে ও পরে এমন কিছু উল্লেখ করা কাম্য নয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মান, মর্যাদা ও অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন বিশেষণ বা শব্দ-বাক্য ব্যবহার করা যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি তাঁর নামের খণ্ডাংশ ব্যবহার করাও কাম্য নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে Sk. Mujib Regime (1972-75), The Rule of SK. Mujib, The formation of BKSAL and fourth Amendment.The fall of SK. Mujib Regime: উল্লেখ করার পরপরই উল্লেখ রয়েছে General Ziaur Rahman and Civilianijation[sic] process, Formation of B.N.P. Green Revolution.

রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনার দিক নির্দেশক হলো সংবিধান। সংবিধান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং শিক্ষাক্রম তৈরির অন্যতম ভিত্তি। সাংবিধানিভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির পিতা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

সংবিধানে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো যেমন ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে এবং Contents/আধেয় বা বিষয়বস্তুতে যথাযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বা এমন কোনো বিশেষণ উল্লেখ করা কাম্য যেন তাঁর যথাযথ অবস্থান, সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ না হয়।

৩. নেতৃত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি আবশ্যকীয় পাঠ। একজন যোগ্য নেতা ও তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, শর্ত, দেশপ্রেম, রাজনীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নন, বিশ্বনেতৃত্বের ইতিহাসেও তিনি অন্যতম। সেই দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁকে অধ্যয়ন যেমন জরুরি তেমনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও ইতিহাস বিভাগে তাঁর যথাযোগ্য অবস্থান কাম্য। এ সব বিবেচনায়ও ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অধিক বিধৃত করা যেতে পারে।

৪. 'মুজিববাদ' একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক মতবাদ। এ মতবাদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চর্চিত ও প্রচারিত রাজনৈতিক দর্শন ও মূল্যবোধের সমষ্টি, যার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে সুখী-সমৃদ্ধ, মানবিক বাংলাদেশ গড়ার ইতিবৃত্ত ও কালোত্তীর্ণ মুক্তি-দর্শনের পথ। মুজিববাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য 'সোনার বাংলা' পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা মুজিববাদের চার স্তম্ভ। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে 'মুজিববাদ' নামে কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

একটি দেশের নামকরণের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট দেশের ইতিহাসের অংশ হতে পারে। তাই, বাংলাদেশের নামকরণের ইতিহাসও কোর্স শিরোনাম বা কনটেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন এদেশের নাম 'বাংলাদেশ'। বাংলাদেশ নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৫. যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক

মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় সেহেতু পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে এবং জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে Contents/আধেয় বা বিষয়বস্তুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ত্যাগ ও অবদান যথাযথভাবে উপস্থাপন ও প্রতিফলিত হওয়া কাম্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন স্তরে বাঙালির উন্নয়ন ও মুক্তির জন্যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর স্মারক গ্রন্থ, ভাষণ ও অন্যান্য কর্ম পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানের মানসম্মত শিক্ষাসহ শতাব্দী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেক কিছু সম্পর্কে তিনি দূরদর্শী ছিলেন। নেতৃত্ব, রাজনীতি ও জাতীয় মুক্তির জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠ করা হলে বাঙালির জাতীয় জীবন দর্শন ও বাংলাদেশের চূড়ান্ত মুক্তির দর্শনও পাঠ করা হয়। সে কারণে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যথাযথ প্রতিফলনের জন্য কোর্স ও Contents/আধেয় বা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৬. কোনো ব্যক্তির অবদান ও দর্শনকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ কাজ ও দর্শনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুযোগ থাকলে সেটি গ্রহণ করা কাম্য। গবেষণায় দেখা গেছে, শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* রেফারেন্স গ্রন্থের তালিকায় আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাক্রমে। আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রেফারেন্স গ্রন্থের তালিকায় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপজীব্য করে রচিত *সিক্রেট ডকুমেন্ট* গ্রন্থের উল্লেখ নেই। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত গ্রন্থগুলোর পাঠ আবশ্যিক করা যেতে পারে।

৭. ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববদ্যিালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম, সিলেবাস পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের মত করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে। শিক্ষাক্রমের কাঠামোগত এবং বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি বিভাগের সাথে আরেকটি বিভাগের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। পূর্বের প্রথাগত সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি থেকে এখনো কোনো কোনো বিভাগ বের হতে পারেনি। শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার শক্তিশালী ও কার্যকরি পরিকল্পনা হলো শিক্ষাক্রম। পূর্বের প্রথাগত সিলেবাস বা পাঠ্যসূচিগত ধারণা থেকে বের হয়ে আধুনিক ও

যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়ন করা বর্তমান যুগে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

২০০১ সালে প্রকাশিত "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও আমাদের পাঠ্যক্রম" শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে, "আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের পাঠ্যক্রমে সুপরিকল্পিতভাবে অনুপস্থিত।"[৩৬] একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মগুলির মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ব করার চেতনার অভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাদেরকে নিজ দেশের জাতীয় ইতিহাস ও মুক্তিসংগ্রামের বীরত্বগাথা যথাযথভাবে না জানানোর মধ্যে এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিহিত বলে অনেকের ধারণা। দুর্ভাগ্যজনক তথ্য এই যে, বাংলাদেশের পাঠ্যসূচির বিষয় বিন্যাস এমনই যেখানে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গর্ব করার মতো চেতনা গড়ে তোলার প্রশ্নটিকে প্রচ্ছন্নভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।[৩৭] "ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" শীর্ষক বর্তমান গবেষণায়ও প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্ভুক্তি ও উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও এ ধারা বিদ্যমান।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জানার অন্যতম উপায় বঙ্গবন্ধুকে জানা। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও রাজনীতি শিক্ষার অনুক্রম। বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় লক্ষ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও তিনি আবশ্যিক পাঠ্যক্রম। সে কারণে, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যথেষ্ট পরিমাণ ভুক্তি ও যথোপযুক্ত মর্যাদায় উপস্থাপন করা এবং শিক্ষাক্রমে তাঁর অবস্থান, সম্মান, মর্যাদা প্রতিফলনে যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

জাতীয়তাবোধ, মুক্তিসংগ্রাম, জাতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি দায়িত্বশীল ও শ্রদ্ধাশীল নাগরিক গড়ে তোলার দিক থেকেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতীয় জীবনদর্শনের অন্যতম আদর্শ, দেশের জনগণের প্রেরণা, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। দেশপ্রেমিক নাগরিক সংকটের এ যুগে তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক তৈরির প্রেরণা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অধ্যয়ন করা মানে

এক প্রকার বাংলাদেশকে অধ্যয়ন করা, ইতিহাস ও রাজনীতিকে অধ্যয়ন করা, বাঙালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র-জাতির নির্যাতিত মানুষের মুক্তির পথকে অধ্যয়ন করা। প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাশ কাটানো কিংবা হেয়ভাবে উপস্থাপন করা মানে এক প্রকার বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় লক্ষ্যের সাথে প্রহসন করা। তাই, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাক্রমে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' সম্পর্কিত যথাযথ কোর্স, কনটেন্ট এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ রেফারেন্স-এ থাকা বাঞ্ছনীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যথাযথ ভুক্তি ও প্রতিফলনের ব্যবস্থা করাও সংশ্লিষ্টজনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র

১. রতন লাল চক্রবর্ত্তী ও শরিফ উল্লাহ্ ভূঁইয়া, "বিভিন্ন দেশের পাঠ্যক্রমে জাতীয় ইতিহাস: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *নিবন্ধমালা*, বিশেষ সংখ্যা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০০১, পৃ. ৯।

২. *দৈনিক সমকাল*, নভেম্বর ২৯, ২০১৮।

৩. *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৬০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৯. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল, ২০১৬। পৃ.

১০. প্রাগুক্ত, উপক্রমণিকা।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২ ।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১৫. ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, "বাংলাদেশ নামকরণ দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণার দাবি জানাই", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ডিসেম্বর ৮, ২০১৯।

১৬. ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, "বঙ্গবন্ধুর মুক্তচিন্তা ও শিক্ষায় ৭৩ অধ্যাদেশ", শামসুন নাহার চাঁপা ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন*, ঢাকা প্রিন্টার্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ২০৭।

১৭. ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

১৮. ম. হাবিবুর রহমান, প্রধান সম্পাদক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *শিক্ষাকোষ*, আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ৭৩২।

১৯. এম. এ. ওহাব (সম্পাদিত), *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ১।

২০. ড. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, জুন, ২০১৮, পৃ. ২২৮।

২১. ড. আব্দুল মালেক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

২২. Nurul Huda Abul Monsorand and others (Edited), *Student Handbook,* Department of History B. A. Honours Programme, Univerty of Dhaka, ঢাকা, জুলাই, ২০১৯, পৃপৃ. ৫৭, ৫৮।

২৩. *Curriculum for B.A. (Honours),* Department of History, Session: 2018-2019, University of Rajshahi, পৃ. ১০২।

২৪. *Curriculum for Masters Degree,* Session: 2018-2019, Department of History, Session: 2018-2019, University of Rajshahi, পৃ. ২৪।

২৫. *Syllabus for B.A. (Honours) Course Session 2019-2020, 2020-2021,* Department of History, University of Chittagong, পৃ. ৩-৪৯।

২৬. *Syllabus for Masters Degree,* Year of Examination-2020, 2021, Department of History, Univerity of Chittagong, পৃ. ১-৩০।

২৭. ইতিহাস বিভাগ, *পাঠ্যক্রমের বিবরণ*, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাবর্ষ, ২০১৬-২০১৭ হতে কার্যকর।

২৮. *M.A. Syllabus,* Contemporary World, Department of History, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, পৃ. ৪৯-৬০।

২৯. *Curriculum & Syllabus,* Bachelor of Social Science, Department of Political Science, University of Dhaka, পৃ. ৩০, ৩১, ৪৩।

৩০. *Curriculum & Syllabus, M.S.S. Program under Semester & M.Phil. Program,* Department of Political Science, পৃ. ১২।

৩১. *Syllabus for four-Year B.S.S (Honours) Programme in Political Science,* University of Rajshahi, Session 2017-2018, পৃ. ১১, ১৭।

৩২. *Syllabus for four-Year M.S.S in Political Science (General and Thesis Group),* Session 2017-2018, University of Rajshahi.

৩৩. *Syllabus*, Department of Political Science, University of Chittagong, পৃ. ২৬।

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩২

৩৫. বিস্তারিত, *Bachelor of Social Science (Honors) Syllabi and Master of Social Science (MSS) Syllabi,* Department of Government and Politics, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

৩৬. এ কে এম গোলাম রব্বানী, "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও আমাদের পাঠ্যক্রম", *নিবন্ধমালা*, বিশেষ সংখ্যা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০০১, পৃ. ১৫।

৩৭. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী ও আকসাদুল আলম, "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও আমাদের পাঠ্যক্রম", নিবন্ধ*মালা*, বিশেষ সংখ্যা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, ২০০১, পৃ. ৫৯।

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা

বিশ্বজিৎ ঘোষ *

[**সারসংক্ষেপ :** অপরিমেয় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং নেতৃত্বের অতুলনীয় গুণাবলি পূর্ববাংলার শেখ মুজিবুর রহমানকে কেবল বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতির জনক পরিচয়ই এনে দেয়নি, অধিষ্ঠিত করেছে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে। সীমাহীন অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে বাঙালিকে একটি দেশ উপহার দেওয়া বঙ্গবন্ধু কেবল রাজনীতি-অর্থনীতি-সচেতন মানুষই ছিলেন না, ছিলেন আত্মসংস্কৃতি-সচেতন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষা ও চর্চার প্রতি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুকে বাধ্যতামূলক করা, বাংলাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস, অপরাপর ভাষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যচর্চা ও বোধ এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের শিল্পচর্চাকে নিরন্তর উৎসাহিত করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্নমাত্রিক পরিচয় উন্মোচিত করা সম্ভব।]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০ - ১৯৭৫) বিশ্বব্যাপী একজন মুক্তিসংগ্রামী এবং মহান রাজনীতিবিদ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি রাজনীতির মানুষ– রাজনীতিই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনিই বাঙালির শ্রেষ্ঠতম জাতীয়তাবাদী নেতা। বাঙালির সম্মিলিত চেতনায় জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে তিনি পালন করেছেন

* ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

ঐতিহাসিক ভূমিকা। গণতান্ত্রিক মূল্য চেতনা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা– এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূলকথা। শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বাঙালির সামূহিক চেতনায়।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, প্রকৃত অর্থেই, অভিন্ন ও একাত্ম। বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছেন। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় দেশের স্বার্থের কাছে, জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন নিজের স্বার্থ। বিশ্ব-ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি জাতীয় পুঁজির আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালির সম্মিলিত মুক্তির বাসনাকে মেলাতে পেরেছেন এক মোহনায়। বিশ্ব-ইতিহাসে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার কর্মসাধনায় এই যুগলস্রোতের মিলন লক্ষ করা যায় না।

শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শোষিত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে তিনি কখনো দূরে সরে যাননি, ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা তিনি সত্যের কথা বলেছেন, বলেছেন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকারের কথা। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশেরই নয়, বিশ্ব-মানুষেরই অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এসব সংস্থায় শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে– পেয়েছেন তিনি বিশ্ব-নেতার স্বীকৃতি। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– উৎসর্গ করেছেন নিজের জীবন। তবে কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, বাংলাদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। বস্তুত, তাঁর সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচিত হয়েছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনা এক্ষেত্রে তরুণ শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের চিত্তলোকে সঞ্চার করেছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চার করেছে ভাষা ও সংস্কৃতির মুক্তির বাসনা। এ কারণেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের

প্রথম শাসনতন্ত্রে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হলেও, বাংলা ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য তাঁর সংগ্রাম চলেছে আমৃত্যু। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্তর্গত চেতনায় সারাজীবন উদ্বুদ্ধ ও আলোকিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য– সবকিছুর প্রতিই ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর ভালোবাসা। বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার একটা নির্যাস পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে দেওয়া তাঁর অভিভাষণ থেকে। ওই অভিভাষণে অংশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণার সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে : 'আমরা বাঙালি। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমি যদি ভুলে যাই আমি বাঙালি, সেদিন আমি শেষ হয়ে যাব। আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ, বাংলার মাটি আমার প্রাণের মাটি, বাংলার মাটিতে আমি মরব, বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা আমার কৃষ্টি ও সভ্যতা।' (দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ২০১২ : ১১৪) বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা ও চিন্তা বিভিন্ন ভাষণ থেকে আমরা জানতে পারি। কীভাবে ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত করা যায় তা নিয়ে সবসময় তিনি ভাবতেন, এ বিষয়ে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ত প্রেরণা দিতেন– তাঁদের নির্ভয়ে কাজ করার সাহস জোগাতেন (আতিউর রহমান : ১৩)। কখনো-কখনো ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে একজন ভাষাতাত্ত্বিকের মতোই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছেন তাঁর ভাবনা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছেন :

> মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩.০২.১৯৭১)

-উদ্ধৃত অংশ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় কল্পনা করেছেন স্বাধীন ও মুক্ত সংস্কৃতির। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে সংস্কৃতিকে অবরুদ্ধ তথা ধ্বংস করার জন্য বৈদেশিক প্রশাসন নানারকম কালাকানুন চালু করে, বৃহত্তর লোকায়ত সংস্কৃতির পরিবর্তে তারা চালু করে মেকি সংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যই ছিল বৃহত্তর জনসংস্কৃতি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কেননা, জনসংস্কৃতি মানুষকে জাগ্রত করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে দ্রোহী করে তোলে, তার চিত্তে সঞ্চার করে মুক্তির বাসনা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালির জনসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিল, ছিল পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তিও। এ সূত্রেই জনসংস্কৃতির মুক্তিদাতা হিসেবে স্মরণ করতে হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দ্বারা প্রাণিত হয়ে উত্তরকালে শেখ মুজিবুর রহমান সংস্কৃতির মুক্তির জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত মঞ্চনাটকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। শতাব্দী-প্রাচীন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি-নীতির পরিবর্তন করলেন বঙ্গবন্ধু– প্রাচীন অভিনয়-আইন পরিবর্তন করে নতুন আদেশ তিনি জারি করেন ১৯৭৫ সালের জুন মাসে– খুলে গেল সংস্কৃতি জগতের একটা বদ্ধ অর্গল। ১৯৭৫ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশের দুটো ধারা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে সংস্কৃতির মুক্তি তথা বিকাশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক অবদানের কথা :

> ক. দেশে জাতীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯২২ সালের The Bengal Amusement Tax Act 1922 (Bengal Act V of 1922) সংশোধন করেছেন।
> খ. অভিনয়ে অনুমতি দেবার পূর্বে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার বিধি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় অহেতুক হয়রানি এড়াবার জন্যে এই পরীক্ষা প্রণালী সহজ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে ১৮৭৬ সালের Act No. 29 of 1876 (16th December 1876) 'An Act for the better control of dramatic performances' আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন। (দ্রষ্টব্য

: বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯ : ১৫২)

–বঙ্গবন্ধুর এই আদেশের মৌল অনুপ্রেণনা হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনাকে অনায়াসেই শনাক্ত করা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ও অনুরাগের কথা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও অভিভাষণ থেকে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। ১৯৪৮-উত্তরকালে অনেক ভাষণেই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের সাহিত্যের নানা উদ্ধৃতির ব্যবহার করতেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি কারারুদ্ধ, এমনকি বুলেটের আঘাতে মৃত্যুবরণের কথাও বলেছেন। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অনন্য তারিখ ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে যে ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ওই ভাষণে তিনি বলেন :

> Nazimuddin and Nurul Amin Govts are not prone to the just demands of the people in general. People demanded Bengali to be one of the state languages of Pakistan but they have turned a deaf ear to it. Khawaja Nazim declared that Urdu should be the only state language of Pakistan. The movement punched on the 21st Feb. 1952 was not a movement for the Bengali Language it was a movement for our life and death. We want to live like men want food, cloth, shelter, rights of a citizen, liberty of speech and a society free from exploitation. The movement of 21st Feb. 1952 was an expression of these demands of the people, and the students received bullets and Lathicharge. We have come here to observe 'martyrs day' but every day people are dying of starvation in East Bengal. Our mothers and sisters are going naked, morale of people of East Bengal has broken and the ruling class

is sucking the blood of the people. I am not disrespectful to those who died in connection with Language Movement. Demands of no nation can be met without sacrifice and perseverance. We have to end the present oppressive rule in the country by peaceful means and establish a people's rule in its place. Bengali is one of the richest languages of the world. Each one of the East Bengali is ready to lay down life for the demand for Bengali Language. Moulana Bhasani and a few hundred others are in jail. No one can be detained in jail without a trial. We cannot get our demands fulfilled by merely passing resolutions. There cannot be any truce or pact with the oppressors who have sucked our blood and kept our mothers and sisters naked. Either they or we will remain in power. Every one of us wants not only Bengali as one of the State Languages, food, cloth, shelter but also the rights of a citizen, liberty of speech and release of political prisoners. If the present Govt. cannot concede to these just demands of the people let them give out power for those who will be able to fulfill them. So long as our demands are not conceded we shall carry on our movement peacefully in every nook and corner of East Bengal. Muslim League rule must be brought to an end by peaceful means for the good of the people in general. We are ready not only to go to jail but also to face bullets for the demands of Bengali Language, release of political prisoners and for making a society free from exploitation. [Sheikh Hasina, 2009B : 88]

—আরমানিটোলা ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের এই সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষ্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চেতনা তাঁকে কীভাবে সন্দীপিত করে তুলেছে। ভাষার সঙ্গে তিনি বাঙালির বাঁচা-মরার প্রসঙ্গটি উপলব্ধি করেছেন, বাংলা ভাষা আর বাঙালির অস্তিত্বকে তিনি গ্রথিত করেছেন অভিন্ন সূত্রে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী, *কারাগারের রোজনামচা* এবং *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থত্রয়ের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাতিস্বিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। সকল মানুষই মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। প্রসঙ্গত এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : 'যে কোনো জাতি তার মাতৃ ভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোনো কালে সহ্য করে নাই' (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ৯৯)। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁর মধ্যে কোনো সংকীর্ণ ভাষাচিন্তার জন্ম দিতে পারেনি। উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি সকল ভাষার প্রতিই তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। পাকিস্তানের বৃহত্তর বাস্তবতায় বাংলার পাশাপাশি উর্দুসহ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাকে স্বীকৃতির পক্ষে তিনি সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন (আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ২০১৮ : ১১)। অথচ বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধ আচরণ ও নানা ষড়যন্ত্রের কারণে উর্দুসহ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচলিত ভাষাসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতেন তিনি। এ বিষয়ে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি ব্যক্ত করেছেন সুস্পষ্ট অভিমত :

> বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভায়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করব কেন? (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ৯৮)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতে ভালোবাসতেন বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকেই তিনি বাংলায় বক্তৃতা করতেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আট মাস পরে, বেইজিং-এ আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিদের শান্তি

সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেন। সেই শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন, যা ইংরেজি, চীনা, রুশ ও স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন : 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান ও আমি বক্তৃতা করলাম। আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। ... কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না! ভারত থেকে মনোজ বসু বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য' (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২২৮)। এ প্রসঙ্গে *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। মাতৃ ভাষাকে উপেক্ষা করে যে বড়ো হওয়া যায় না, সে-কথা তিনি এখানে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। শান্তি সম্মেলনের অভিজ্ঞতার আলোকে মাতৃভাষা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান যা বলেছেন, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অবিনাশী চেতনা যে তাঁর মনোলোকে ক্রিয়াশীল ছিল, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> ... আমি বক্তৃতা করলাম বাংলা ভাষায়, আর ভারত থেকে বক্তৃতা করলেন মনোজ বসু বাংলা ভাষায়। বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃ ভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু কিছু জানে। মানিক ভাই, আতাউর রাহমান খান ও ইলিয়াস বক্তৃতাটা ঠিক করে দিয়েছিল। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৪৩)

অনেকের মাঝেই দেখা যায় যে, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষায় কথা বলতে তারা অহংকার বোধ করে। বাংলাদেশে এই প্রবণতা ভয়াবহভাবে বিরাজমান। এখানে অনেকেই ভুল ইংরেজিতে কথা বলবে, ক্লাসেও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবে– তবু মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলবে না। ইংরেজিতে ভুল করলে তারা লজ্জিত হয়, কিন্তু বাংলায় ভুল করলে তারা লজ্জা পায় না,

বরং বলে– বাংলা ভাষা এখন আর আসে না। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের স্মরণ করতে হয়। *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থে লেখা শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> ... দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম ভাষা বাংলা। আমি দেখেছি ম্যাডাম সান ইয়াৎ-সেন খুব ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু তিনি বক্তৃতা করলেন চীনা ভাষায়। একটা ইংরেজি অক্ষরও তিনি ব্যবহার করেন নাই। চীনে অনেক লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছে, অনেকেই ইংরেজি জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবেন না। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। আমরা নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজি জানেন, কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন চীনা ভাষায়। দোভাষী আমাদের বুঝাইয়া দিলো। দেখলাম তিনি মাঝে মাঝে এবং আস্তে আস্তে তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন যেখানে ইংরেজি ভুল হচ্ছে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপরে দরদ। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০ : ৪৪)

কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি-ভাষণেই নয়, আইনসভাতেও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান পালন করেছেন সাহসী ভূমিকা। ১৯৫৩ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো ছাড়াও তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ চান। স্পিকার ওহাব খান পশতু ভাষার স্বীকৃতি না-থাকা সত্ত্বেও একজন সদস্যকে ওই ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ চান। কিন্তু তাঁকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ না-দেওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান, অন্যান্য সদস্য নিয়ে ওয়াকআউটের হুমকি দেন। স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন :

> … I would request you to revise your ruling and allow honorable members to speak in Bengali which is going to be one of the State Language of Pakistan. It is a very serious matter for us and here nobody can force us not to speak in our own mother-tongue. I will here and now speak in Bengali and nobody can prevent me from doing

> that. If you are not going to allow me to speak in Bengali, then all the Awami League members will have no alternative but to walk out of the House, as a protest. (উদ্ধৃত : Shahryar Iqbal, 1977 : 28)– অভিন্ন দিনে গণপরিষদে তিনি বলেন : 'আমরা ইংরেজি বলতে পারবো, তবে বাংলাতেই আমরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। যদি পরিষদে আমাদের বাংলায় বক্তৃতার সুযোগ না দেওয়া হয় তবে আমরা পরিষদ বয়কট করবো। ... বাংলাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবো' (উদ্ধৃত : Shahryar Iqbal, 1977 : 28)

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলা লিপির পরিবর্তে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করে। এক রাষ্ট্র এক ভাষা স্লোগান উত্থাপন করে বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের পাঁয়তারা করতে থাকে পাকিস্তানি শাসকেরা। বর্ণমালা পরিবর্তনের সরকারি এই প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করে শেখ মুজিবুর রহমান যৌক্তিকভাবে বলেন এই কথা : 'কে না জানে যে, সমগ্র ইউরোপই রোমান হরফ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু একই হরফের ব্যবহার ইউরোপীয় সংহতির জন্য সহায়ক হয় নাই। মধ্যপ্রাচ্যে ১১টি দেশে আরবি হরফ প্রচলিত রহিয়াছে কিন্তু একই হরফ সত্ত্বেও আরব বিশ্বে কোন একতা নাই' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫.০৫.১৯৬৪)। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি সরকার যে বলেছিল পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে একই হরফ বা ভাষা ব্যবহার রাষ্ট্রীয় সংহতি সুদৃঢ় করবে– তার বিরুদ্ধে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই দাঁতভাঙা জবাব। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা কেউই ভুলে নাই। আমরা তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র করতে জনমত সৃষ্টি করতে লাগলাম। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না মেনে নিলে আমরা কোনো শাসনতন্ত্র মানব না। এসময় ফজলুর রহমান সাহেব আরবি হরফে বাংলা লেখা পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করছিলেন। আমরা এর বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২৪৩)।

বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশকে শেখ মুজিবুর রহমান নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রসেনানী। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। গণপরিষদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট গণপরিষদে ভাষণদানকালে তিনি বলেন :

> ওরা [পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার] 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা উহাকে 'বাংলা' নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটির একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি এই নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে–তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না' (উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, **২০১২ : ১৭১**)।

প্রসঙ্গত শেখ মুজিবুর রহমানের অন্য একটি ভাষণের কথাও আমরা স্মরণ করব। ১৯৬৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত করেন এবং সকলকে 'বাংলাদেশ' লিখতে ও বলতে আহ্বান জানান। ওই আলোচনা সভায় তিনি ঘোষণা করেন :

> একসময় এদেশের বুক হইতে মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্ট করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২৯৭)।

১৯৫২ সালে বেইজিং-এ আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে বাংলা ভাষায় শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন, তার ধারাবাহিকতা উত্তরকালেও তাঁর মাঝে লক্ষ করা

গেছে। ১৯৫৫ সালের ৯ নভেম্বর স্পিকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বাংলা ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারিভাবে শহিদ দিবস এবং সরকারি ছুটি ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের ভাষণ-অভিভাষণে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। এ প্রসঙ্গে *কারাগারের রোজনামচায়* তিনি লিখেছেন : "এইদিন [২১শে ফেব্রুয়ারি] আমাদের কাছে পবিত্র দিন। ১৯৫৫ সালে নূতন কেন্দ্রীয় আইনসভায় আওয়ামী লীগ ১২জন সদস্য নিয়ে ঢুকল এবং তাদের সংগ্রামের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বাধ্য হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। আওয়ামী লীগ যখন ১৯৫৬ সালে ক্ষমতায় বসল তখন ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করল" (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৭ : ২০৭)। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেন। এই ঘটনা বাংলা ভাষার বিশ্বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর এই দুঃসাহসী ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই সদর্থক মূল্যায়ন করেছেন। এমন পাঁচটি মূল্যায়ন এখানে উৎকলিত হলো :

ক. শেখ হাসিনা

> বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়া বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। (উদ্ধৃত : এম. আর মাহবুব, ২০১৩ : ১৫৫)।

খ. তোফায়েল আহমেদ

> বঙ্গবন্ধুকে প্রথমেই অনুরোধ করা হয়েছিল, 'মানীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি ইংরেজিতে বক্তৃতা করবেন।' ... কিন্তু প্রিয় মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর দরদ ও মমত্ববোধ থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করতে চাই।' সিদ্ধান্তটি তিনি আগেই নিয়েছিলেন ... মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক পরিণতি। সেদিন বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হয়েছে, তিনি যেন বহুযুগ ধরে এমন দিনের অপেক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। মাতৃভাষায় বঙ্গবন্ধু মুজিবের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পর অধিবেশনে সমাগত

পাঁচটি মহাদেশের প্রতিনিধি এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুল পঠিত জাতিসংঘের ডেলিগেট বুলেটিন বঙ্গবন্ধুকে 'কিংবদন্তির নায়ক মুজিব' বলে আখ্যায়িত করে। (তোফায়েল আহমেদ, ২০১২)।

গ. জিল্লুর রহমান

১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে সারা বিশ্বে গৌরবের আসনে অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষাকে মর্যাদাপূর্ণ ও আন্তর্জাতিকীকরণেও ঐতিহাসিক ধারার সূচনা করেছিলেন। (উদ্ধৃত : এম আর মাহবুব, ২০১৩ : ১৫৩-১৫৪)।

ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাঙালির আন্তর্জাতিক কালচারাল নেশনহুডের ভিত্তি তৈরির সূচনা করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে সেই ন্যাশনহুডের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার স্বীকৃতি আদায় করেছেন। (উদ্ধৃত : এম আর মাহবুব, ২০১৩ : ১৫৪)

ঙ. সন্তোষ গুপ্ত

একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তারপর যুগান্তরের রথচক্র কতবার আমাদের ইতিহাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে। ... তারপর দেখা গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয় বারের মত বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরলেন। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। ... এই প্রথম একটি সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। এখানেও তিনি এক অনন্য ইতিহাস সেদিন সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের সংকীর্ণ-চিত্ত কিছু রাজনীতিক সম্ভবত মুষ্টিমেয় উন্নাসিক পতিত ব্যক্তি বাংলা ভাষাকে শেখ মুজিবের এই মর্যাদাদানের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। আমরাও কার্যত এর তাৎপর্য স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কিংবা সেরূপ গৌরব অনুভব

> করিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের পাবনা অধিবেশনে বাংলায় অভিভাষণ দেওয়ার ব্যাপারে জাতীয় নেতাদের সম্মত করাতে পারেননি। ইংরেজিতে ভাষণ দেয়ায় তারা গৌরব অনুভব করতেন। প্রভুর ভাষায় অধিকার লাভের জন্য আবেদন-নিবেদন করতেই তারা ভালোবাসতেন। ... বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে আমাদের ভাষার মর্যাদাকে বিশ্ব রাষ্ট্র সভায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের এবং আমাদের লজ্জা এখানেই যে, আমরা সেদিন এর গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে চাইনি। (সন্তোষ গুপ্ত, ২০০০)।

১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের প্রাক্কালে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার উপর বঙ্গবন্ধু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য, ১৯৫২ সালের মতো, যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য বাঙালিকে তিনি আহ্বান জানান। ১৯৬৯ সালের ১ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রকাশ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষা-ভাবনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> পাকিস্তানের সর্ব অঞ্চলে মাতৃভাষাকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করিতে হইবে এবং পাকিস্তানেও সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক জীবনে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার উন্নতি ও বিকাশের জন্য কার্যকরী উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (উদ্ধৃত : আবুল কাসেম, ২০০১ : ২৪০)

একটি রাষ্ট্রের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ছিল সুস্পষ্ট এবং অর্থবহ ধারণা। যে-কোনো সদর্থক ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনকে তিনি বিবেচনা করেছেন মূল রাজনৈতিক দর্শনচিন্তার আলোকে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান সংগীত শিল্পী সমাজ আয়োজিত তাঁর ভাষণ। ওই ভাষণে তিনি বলেছেন : 'একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা। বাংলার মানুষ মুসলমান নয়, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নেই– এই ধরনের অভিযোগ দিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে

২৩ বছর ধরে তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আর বাংলার মানুষও এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, এই আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন (দ্রষ্টব্য : এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০ : ২২৯)।

স্বাধীনতার পর অতি অল্প সময়ে বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনা করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। আদালতের রায় বাংলা ভাষায় লেখার নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। যথাযথ পরিভাষা না থাকার কারণে রাষ্ট্রের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে– একথা অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন : 'আমি ঘোষণা করছি, আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে, সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন, তারপর বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদেরা যত খুশি গবেষণা করুন, আমরা ক্ষমতা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬.০২.১৯৭১)। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে বঙ্গবন্ধু যে কত আন্তরিক ছিলেন, ওপরের ভাষ্য থেকে তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আন্তরিক। স্বাধীন রাষ্ট্রের মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে অনীহা লক্ষ করে বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন। ১৯৭২ সালের ২৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি সরকারি নির্দেশ জারি করেন (মুনতাসীর মামুন, ২০১২ : ৩৩৩)। দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখার কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সতর্ক করে বঙ্গবন্ধু জারি করেন এই নির্দেশ। কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু লেখেন : 'আমি কিছুদিন যাবৎ দুঃখের সাথে লক্ষ করছি যে, আমাদের উপর্যুপরি সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে এখনো বাংলা ভাষা ব্যবহার হচ্ছে না। উপরন্তু বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে, দপ্তর ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে পূর্বতন ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের দিকে প্রবণতা রয়েছে। ... এখন থেকে আমার নির্দেশ রইল যে, সর্বস্তরে সকল দপ্তরে ও প্রতিষ্ঠানে **বvsjv fvlv e¨envi Ki‡Z n‡eÕ (D×...Z : gybZvmxi**

gvgyb, 2012 : 333)|

বঙ্গবন্ধুর উপর্যুক্ত নির্দেশনা জারির ফলে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। সরকারি-বেসরকারি দপ্তর থেকে ইংরেজি নামফলক সরিয়ে বাংলা নামফলক লাগানো হয়, বিভিন্ন দপ্তরে বাংলা ভাষায় নথিপত্র লেখা চালু হয়। ২২টি পরিভাষা কমিটির মাধ্যমে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড কমবেশি ৮০ হাজারের মতো পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বাংলা টাইপরাইটার, বাংলা শর্টহ্যান্ড এবং বাংলা টেলিপ্রিন্টার চালু হয়। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মকমিশনসহ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে (এম আবদুল আলীম, ২০২০ : ২৬৭)। সরকারি কাজে বাংলা ভাষা যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় সে-লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'সরকারি পর্যায়ে বাংলা প্রচলন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৭৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে বলা হয় : 'বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অফিসের নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র বাংলায় না লেখা হলে তাঁর কাছে উপস্থাপিত করা যাবে না। সুতরাং যাবতীয় সরকারি নথিপত্রাদি বাংলায় লেখার জন্য কেবিনেট ডিভিশন এক পরিপত্রে সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছে। আরও জানা গেছে যে, বঙ্গবন্ধু সরকারি কাগজপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সরকারি নথিপত্র, ফরম ইত্যাদিতে পুরোপুরি বাংলা ব্যবহারের বাস্তব উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে উক্ত পরিপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে (*দৈনিক বাংলা*, ১৯.০২.১৯৭৩)। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত সরকারি নির্দেশটি ছিল নিম্নরূপ :

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
গণভবন, ঢাকা
তারিখ : ১২ই মার্চ ১৯৭৫

> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃ ভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজি ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যাঁর ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তাঁর ভালবাসা

আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালী কর্মচারীরা ইংরেজী ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উশৃংখলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না। এ আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা সরকারী অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে উক্ত বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তাব্যক্তিগণ সতর্কতার সাথে এ আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধানের ব্যবস্থা করবেন। তবে বিদেশী সংস্থা বা সরকারের সাথে পত্রযোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী কিংবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন। তেমনিভাবে বিদেশের কোন সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় বাংলার সাথে সাথে অনুবাদিত ইংরেজি বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(উদ্ধৃত : রতনলাল চক্রবর্তী, ২০০০ : ৩৭৫-৩৭৬)

লক্ষণীয়, স্বল্প-পরিসরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যে সরকারি নির্দেশ দিয়েছেন, এককথায় তা ছিল ঐতিহাসিক এক সিদ্ধান্ত। বিদেশে পত্রযোগাযোগে তিনি বাংলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সঙ্গে থাকবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ভাষায় প্রতিলিপি। এ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বঙ্গবন্ধুর এ নির্দেশ কখনো পালিত হয়েছে কি-না, আমাদের জানা নেই।

কেবল মাতৃভাষা বাংলা নয়, বাংলা সাহিত্যের প্রতিও ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগ। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা অবলীলায় উচ্চারণ করতেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন : 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের কথা চিন্তা করাও পাপ। অথচ এ দেশে রবীন্দ্রনাথকে অপাঙ্‌ক্তেয় ও

নজরুল-সাহিত্যকে 'মুসলমানী' করার নামে বিকৃত করার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর বার বার আঘাত আসিয়াছে' (উদ্ধৃত : সেলিনা হোসেন, ২০২০ : ৪৮)। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে যখন পশ্চিম পাকিস্তান যান, তখন গাড়িতে করে একদিন হায়দ্রাবাদ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও কয়েকজন পাকিস্তানি আইনজীবীসহ করাচি ফিরছিলেন সোহরাওয়ার্দী। পথিমধ্যে পাকিস্তানি আইনজীবীরা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে নানা প্রস্তাব করেন। শেখ মুজিবুর রহমান *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে প্রসঙ্গটির স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে :

> বিকালে করাচি রওয়ানা করলাম, শহীদ সাহেব নিজে গাড়ি চালালেন– আমি তাঁর পাশেই বসলাম। পিছনে আরও কয়েকজন এডভোকেট বসলেন। রাস্তায় এডভোকেট সাহেবরা আমাকে পূর্ব বাংলার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বাংলা ভাষাকে কেন আমরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাই? হিন্দুরা এই আন্দোলন করছে কি না? আমি তাঁদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম। শহীদ সাহেবও তাঁদের বুঝিয়ে বললেন এবং হিন্দুদের কথা যে সরকার বলছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা তিনিই তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। আমার কাছে তাঁরা নজরুল ইসলামের কবিতা শুনতে চাইলেন। আমি তাঁদের 'কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু', 'নারী', 'সাম্য'– আরও কয়েকটা কবিতার কিছু কিছু অংশ শুনালাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতাও দু'একটার কয়েক লাইন শুনালাম। শহীদ সাহেব তাঁদের ইংরেজি করে বুঝিয়ে দিলেন। কবিগুরুর কবিতার ইংরেজি তরজমা দু'একজন পড়েছেন বললেন। আমাদের সময় কেটে গেল। (শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১২ : ২১৭)।

সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের উন্নতির কথা ভেবেছেন– সাহিত্যিককে সাধারণ মানুষের কাতারে নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু মনে করেন– জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিনই মহৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে না। কেবল শহর নয়, গ্রামীণ জীবন ও জনপদকেও সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন– সাহিত্য-শিল্পকলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতিরূপ নির্মাণই লেখকের মুখ্য কাজ। সাহিত্যের রসসৃষ্টির কথা

মনে রেখেও তিনি সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতার কথাটাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহিত্য প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, তা তাঁর প্রাতিস্বিক সাহিত্যভাবনারই শিল্পিত ও স্ফটিকসংহত ভাষ্য। বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যভাবনার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাঁর সেদিনের বক্তৃতার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক অংশ নিচে উদ্ধৃত করছি :

> অমর একুশের কথা ভাবতে গেলেই আমার মনে অনেক স্মৃতি এসে ভিড় জমায়। যে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে আপনারা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছেন, সেই বাংলা একাডেমি এদেশের দুর্জয় জনতার মাতৃভাষার সংগ্রামে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা ভাষার দাবিতে আমাদের আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে ১১ই মার্চ। সেদিনের স্বৈরাচারী সরকার আমাদের মাতৃভাষার দাবিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নির্মম নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছিল। কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জে আহত হয়েছিল শত শত ছাত্র-জনতা। ঐদিন সকালেই বিক্ষোভ-মিছিল থেকে অন্যান্য সহকর্মীর সাথে আমাকেও গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় নির্যাতন ও কারাযন্ত্রণা। কিন্তু কোনো শক্তিই কখনো সত্যের পথ থেকে আমাকে নিবৃত্ত করতে পারে নাই। যাই হোক, তারপর এলো বায়ান্নর সেই রক্তাক্ত ফাল্গুন। তখন আমি জেলখানায়। জেল থেকে চিকিৎসার জন্য আমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মানিক মিয়া নামক জনৈক পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের সাহায্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমি ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করি অনশন ধর্মঘট। সেই অনশন ধর্মঘট আমি চালিয়ে যাই ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আমার সেদিনের বন্ধুরা হয়ত সেটা আজও মনে করতে পারবেন। আমাদের সেদিনের সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল। একুশের রক্তরাঙা পথ বেয়েই বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধিকার চেতনা ধীরে ধীরে এক দুর্বার গতি লাভ করে। স্বাধীনতার পর বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আমার দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরা এই প্রথম একটি জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। এই মহতী প্রচেষ্টা যে খুবই

সময়োপযোগী হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘকালব্যাপী নানা শোষণ এবং বঞ্চনার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ আমরা দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যও আজ আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে এবং দেশ গড়ার কাজে লিপ্ত রয়েছি। কিন্তু আমরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে দরিদ্র নই। আমাদের ভাষার দু'হাজার বছরের একটি গৌরবময় ইতিহাস আছে। আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। আজকে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মর্যাদাকে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি জানি আমাদের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মী, মেহনতি মানুষ, কৃষক-শ্রমিক এবং ছাত্র-তরুণদের পাশাপাশি দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীরাও সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, রক্ত দিয়েছেন। বিশ্বের স্বাধীনতালব্ধ জাতিগুলির মধ্যে আমরা এদিক থেকে গর্ব করতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম হাতে হাত ধরে অগ্রসর হয়েছে। আজকে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, তখন সাহিত্যিক, শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের কাছে আমার প্রত্যাশা আরো অধিক। যাঁরা সাহিত্য সাধনা করছেন, শিল্পের চর্চা করছেন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সেবা করছেন, তাঁদেরকে দেশের জনগণের চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-বেদনা এবং সামগ্রিক তথ্যে তাঁদের জীবন-প্রবাহ আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে অবশ্যই ফুটিয়ে তুলতে হবে। সাহিত্য শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে এদেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা। সাহিত্য-শিল্পকে কাজে লাগাতে হবে তাঁদের কল্যাণে। আজ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ তুলে ধরুন; দুর্নীতির মূলোচ্ছেদে সরকারকে সাহায্য করুন। আমি সাহিত্যিক নই, শিল্পী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সারাজীবন জনগণকে সাথে নিয়েই সংগ্রাম করেছি, এখনো করছি, ভবিষ্যতেও যা কিছু করব, জনগণকে নিয়েই করব। ...আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি যেন শুধু শহরের পাকা দালানেই আবদ্ধ না হয়ে

থাকে, বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের কোটি কোটি মানুষের প্রাণের স্পন্দনও যেন তাতে প্রতিফলিত হয়। আজকের সাহিত্য সম্মেলনে যদি এ-সবের সঠিক মূল্যায়ন হয়, তবেই আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে আজ সমস্যার অন্ত নেই। আমাদের আর্থিক অনটন আছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুঃসহ অভাব আছে, কিন্তু আমি মনে করি, সবকিছুর ঊর্ধ্বে আমাদের মূল্যবোধের অভাবই আজ সবচেয়ে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এই অভাব জাতীয় জীবনে যে সংকটের সৃষ্টি করছে তা অবিলম্বে রোধ করা দরকার। আমি বিশ্বাস করি, দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীরা এই সংকট উত্তরণে এবং জাতীয় মূল্যবোধের উজ্জীবনে ও সুকুমারবৃত্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আজকে সময় এসেছে, যখন প্রত্যেককে আত্ম-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাঁরা দেশের কল্যাণে সেই দায়িত্ব ও ভূমিকা কতটা আন্তরিকভাবে পালন করছেন। দেশ ও জাতি আজ তাঁদের নিকট এই দাবি জানায়। একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বত্রই একটি কথা বলি সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকে তাঁদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের প্রকৌশলী দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। আমি আজকের এই সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদেরকে সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। এই সম্মেলনে বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ থেকে অতিথি হিসেবে যাঁরা যোগ দিয়েছেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলন উদ্বোধন করছি।

জয় বাংলা।

(উত্তরাধিকার, ২০১৫ : ৯২ ৯৬)।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকরা বাঙালির সদর্থক সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পদে-পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের সিদ্ধান্ত এমনি একটা বাধার উদাহরণ। কিন্তু বাঙালি জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক শাসকদের এই হীন ষড়যন্ত্র মেনে নেয়নি, মেনে নেননি বঙ্গবন্ধুও। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে পরের দিন সোহরাওয়ার্দী ময়দানে দেওয়া সংবর্ধনা সভায় বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যে-কথা বলেন, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তা তাঁর ভালোবাসার উজ্জ্বল স্মারক। ওই সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন : 'আমরা মীর্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপীয়র, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাও-সে-তুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য। আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখে যিনি বিশ্বকবি হয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়বই, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবই এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এই দেশে গীত হবেই' (উদ্ধৃত : মুনতাসীর মামুন, ২০১২ : ২৯৬)। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি। সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের এই গানটিই হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। উত্তরকালে, স্বাধীনতার পর, রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বঙ্গবন্ধু নির্বাচন করেছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের রণসংগীত হিসেবে তিনি নির্বাচন করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মর্মে-মর্মে রাজনীতির মানুষ হয়েও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তা ভাবলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। তিনি যথার্থই ছিলেন রাজনীতির কবি Poet of politics। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মধ্যবিত্তের শাহরিক ভাষার পরিবর্তে তিনি লোকভাষা ব্যবহারে ছিলেন অধিক উৎসাহী। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় লোকভাষা-আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের বিস্ময়কর সার্থকতা লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত ও গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক মানবিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন– তাঁর ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা সে-স্বপ্নেরই সমার্থক এক অনুষঙ্গ।

সহায়কপঞ্জি

১. আতিউর রহমান (প্রকাশকাল অনুক্ত)। 'বঙ্গবন্ধুর নান্দনিক ভাবনা'। ঢাকা

২. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (২০১৮)। 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি-ভাবনা'। ঢাকা : *গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. আবুল কাসেম সম্পা. (২০২০)। *শেখ মুজিবুর রহমান : ভাষণসমগ্র (১৯৫৫-১৯৭৫)*। ঢাকা : চারুলিপি

৪. এম আবদুল আলীম (২০২০)। *বঙ্গবন্ধু ও ভাষা-আন্দোলন*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

৫. এম আর মাহবুব (২০১৩)। *রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*। ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশ

৬. তোফায়েল আহমেদ (২০১২)। 'জাতির জনকের মহৎ কণ্ঠ'। *দৈনিক প্রথম আলো*। ঢাকা ২৫.০৯.২০১২

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী

৮. মুনতাসীর মামুন সম্পা. (২০১২)। *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*। ঢাকা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

৯. রতন লাল চক্রবর্তী সম্পা. (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

১০. শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

১১. শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

১২. শেখ মুজিবুর রহমান (২০২০)। *আমার দেখা নয়াচীন*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

১৩. সন্তোষ গুপ্ত (২০০০)। 'বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর অবদান'। ঢাকা : *দৈনিক সংবাদ*, ২১.০২.২০০০

১৪. সেলিনা হোসেন (২০০০)। *পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ* "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিব। ঢাকা : কথা প্রকাশ

১৫. Shahryar Iqbal *edit.* (1977). *Sheikh Mujib in Parliament (1955-58)*. Dhaka : Agamee Prokashani

১৬. Sheikh Hasina (2019). *Secret Documents of Intelligence Brach on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol. 3, Dhaka : Hakkani Publishers

১৭. *উত্তরাধিকার*, নবপর্যায়ে ৫৯তম সংখ্যা, মে ২০১৫, ঢাকা : বাংলা একাডেমি

১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫.০৫.১৯৬৪, ১৩.০২.১৯৭১, ১৬.০২.১৯৭১, ০৮.১২.১৯৯৯

১৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৯.০২.১৯৭৩, *দৈনিক সংবাদ*, ২১.০২.২০০০

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ : গুরু-শিষ্য সমাচার

চন্দনা রাণী বিশ্বাস *

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতাব্দীর অশেষ কীর্তিমান এক বাঙালি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নির্মাতা তিনি। কেবল সাহিত্যই নয়, তাঁর স্বদেশভাবনা, জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ প্রভৃতি কারণে তিনি বাঙালির চিরস্মরণীয়। বাংলার আর এক কৃতী সন্তান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। তাঁর বংশীয় পদবি ভট্টাচার্য। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। এর পর থেকে তাঁর নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয় 'শাস্ত্রী'। হরপ্রসাদ ছিলেন প্রথিতযশা সংস্কৃত-পণ্ডিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি চর্চার পথিকৃৎ এবং বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ। বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ– এই দুই মনীষীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল গুরু-শিষ্যের। হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন খুব আপন পরিবেশে, পারিবারিক পরিমণ্ডলে, সাহিত্যসভায়, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডারত ইত্যাদি নানা অবস্থায়। হরপ্রসাদ বঙ্কিমের স্নেহধন্য ছিলেন এবং তিনি তাঁকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন। এ কথা তিনি তাঁর লেখা ও কথায় স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমমচন্দ্র সম্পর্কে হরপ্রসাদের চারটি স্মৃতিকথা প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়। হরপ্রসাদের এ স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ ও প্রেরণা, তাঁদের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের নানা দিক এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক জীবনের প্রথম দিকে বঙ্কিমপ্রভাব যুক্ত হরপ্রসাদ পরবর্তীকালে বঙ্কিমপ্রভাব মুক্ত হয়েছেন। হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর গুরু এবং অভিভাবক

* চন্দনা রাণী বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> মনে করলেও সাহিত্যভাবনাতে তিনি গুরুপ্রদর্শিত পথে হাঁটেননি। এমন কি এ নিয়ে গুরুর সাথে মতবিরোধ হলেও শিষ্য তাঁর নিজের সাহিত্যভাবনার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত হরপ্রসাদের বঙ্কিম-স্মৃতিকথাকে ভিত্তি করে গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত নানা দিক উপস্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন কলকাতার অদূরে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চার পুত্রের মধ্যে বঙ্কিম ছিলেন তৃতীয়। বঙ্কিমের দুই অগ্রজ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র, কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বনামে খ্যাত সাহিত্যিক। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় (১৮৫৪) সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা (১৮৫৬) দিয়ে তিনি মাসিক বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, এ বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। মোট ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দু'জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ দু'জন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। একই পদে থেকে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি জীবনে তাঁর বিশেষ পদোন্নতি হয়নি। একই সঙ্গে কর্মরত পদোন্নতিপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের তুলনায় বেশি যোগ্যতা অথবা সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যথেষ্ট পদমর্যাদা দেওয়া হয়নি। স্বাধীনচেতা বঙ্কিমচন্দ্র এই অবমাননা মানতে পারেননি। তাঁর স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণের এটা একটা প্রধান কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য সাহিত্যকৃতির জন্য চিরস্মরণীয়। তিনি 'সাহিত্যসম্রাট' এবং আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক হিসেবে স্বীকৃত। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থেকেও তিনি তাঁর স্বল্পপরিসর (৫৬ বছর) জীবৎকালে চৌদ্দটি উপন্যাস এবং অসংখ্য মননশীল প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। বিশেষভাবে আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) স্মর্তব্য। *আনন্দমঠে* উল্লিখিত 'বন্দে মাতরম্' গানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে খুবই প্রাণ সঞ্চার করেছিল। স্বদেশীদের কাছে 'বন্দে মাতরম্' ছিল অগ্নিমন্ত্রের মতো। *বন্দে মাতরম্* উচ্চারণ

করে বহু প্রাণ বিসর্জিত হয়েছে। এই গানটি রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র 'ঋষি বঙ্কিম' অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। উপন্যাস ব্যতিরেকে তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে *লোকরহস্য (১৮৭৪)*, *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫), সাম্য (১৮৭৯), *মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত* (১৮৮৪), *কৃষ্ণচরিত্র* (প্রথম ভাগ,১৮৮৬), *কৃষ্ণচরিত্র* (পূর্ণাঙ্গ, ১৮৯২), *বিবিধ প্রবন্ধ* (প্রথম ভাগ, ১৮৮৭), *বিবিধ প্রবন্ধ* (দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২), *ধর্মতত্ত্ব (*প্রথম ভাগ, অনুশীলন, ১৮৮৮), *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (১৯০২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চায় প্রসিদ্ধ ছিল তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। মাত্র আট বছর বয়সে হরপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ ঘটে। এ সময় তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে অবস্থিত 'অ্যাঙ্গলো বেঙ্গল' স্কুলে ভর্তি করান। তখন হরপ্রসাদের নাম ছিল 'শরৎনাথ ভট্টাচার্য'। বলা হয়, কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে হর বা শিবের প্রসাদে তাঁর রোগমুক্তি হয়। এরপর তাঁর নাম হয় 'হরপ্রসাদ'। ১৮৬২ সালে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে নন্দকুমারের অকালমৃত্যু হলে তাঁদের পরিবার চরম দুর্গতিতে পড়ে। এ কারণে হরপ্রসাদকে নৈহাটিতে ফিরে আসতে হয়। এ সময় কিছুদিন হরপ্রসাদ কাঁটালপাড়ার একটি টোলে পড়ালেখা করেছিলেন। এরপর বিদ্যাসাগর কিছুদিন বালক হরপ্রসাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হরপ্রসাদকে কলকাতায় নিজের বাড়ির ছাত্রাবাসে নিয়ে আসেন। হরপ্রসাদ তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ সময় বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ১৩/১৪ বছরের কিশোর হরপ্রসাদ আশ্রয় নিয়েছিলেন বৌবাজারের গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে তাঁকে ছাত্র পড়িয়ে নিজে রান্না করে খেতে হতো। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল দারিদ্রদশাযুক্ত। কিন্তু পরীক্ষার ফল ছিল অনন্য সাফল্যময়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য কয়েকবার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উচ্চমানের বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম স্থান লাভ করে বি.এ পাস করেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ ডিগ্রি ও 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। এখানে তিনি পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৮৭৮-৭৯ পর্যন্ত তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এরপর ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে

তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সহকারী সরকারি অনুবাদক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি প্রায় তিন বছর নিযুক্ত ছিলেন। এরপর কিছুদিন বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে কাজ করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন। এরপর তাঁকে Bureau of information for the benefit of civil officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal নামক প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Sanskritic studies and Sanskrit and Bengali বিভাগের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯২১ জুন - ১৯২৪ জুন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বৈদগ্ধ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ। ভারতবর্ষীয় জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সংস্কৃত সাহিত্য, উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য, বৌদ্ধবিদ্যাচর্চা, ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা, ইতিহাস, বাংলা লিপি, ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণ, জীবনী রচনা, স্মৃতিকথা, উপন্যাস রচনা প্রভৃতি তাঁর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার ও সম্পাদনা তাঁর এক অনন্য কীর্তি। বাঙালি কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত সংস্কৃত *রামচরিত* গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার ও সম্পাদনাও তাঁর একটি প্রধান কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে। উভয়ের বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। ফলে ছোটবেলা থেকেই হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখার সুযোগ পান। একটু বড় হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদের চারটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই লেখাগুলি যথ াক্রমে– 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' (নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ); 'বঙ্কিমচন্দ্র' (নারায়ণ, আষাঢ়, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ); 'বঙ্কিমচন্দ্র' (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ এবং ভাদ্র, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) এবং The Late Bankim Chandra Chatterji (The Calcutta University Magazine, 1 May 1894)। এই চারটি লেখাই

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ডে (নভেম্বর ২০০০) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখাটি তিনি যথাক্রমে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়ালে এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমের মর্মর মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে পাঠ করেন। এ সকল লেখা ও বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদের গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত নানা সমাচারের সন্ধান পাওয়া যায়।

রথের মেলা দেখা, ধরণী কথক ঠাকুরের কথা শোনার জন্য ছোটবেলায় হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যাতায়াত করেছেন। তখন ১১ বছর বয়সী হরপ্রসাদ কাঁঠালপাড়ার টোলের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির ফুলবাগান দেখার প্রবল আকর্ষণ ছিল কিশোর হরপ্রসাদের। কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হওয়া তাঁর জন্য দুরূহ ছিল । হরপ্রসাদের ভাষায়– " সে ফুল বাগান দেখিবার আমাদের খুবই শখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনোদিন সেদিকে যাই নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয় অনেক পরে। ১৮৭৬ খ্রি. হরপ্রসাদ তখন সদ্য বি.এ পাশ করেছেন। এম.এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা শুরু করেছেন। এ সময় 'ভারতমহিলা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে তিনি পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হন। এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস *'দুর্গেশনন্দিনী'* (১৮৬৫ খ্রি.) *'কপালকুণ্ডলা'* (১৮৬৬ খ্রি.), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩ খ্রি.), *'চন্দ্রশেখর'*(১৮৭৫ খ্রি.) এবং *'রজনী'* (১৮৭৭ খ্রি.) প্রকাশিত হয়েছে। তখন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক। মূলত হরপ্রসাদ তাঁর 'ভারতমহিলা' প্রবন্ধটি প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬)। তিনি হরপ্রসাদকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি হরপ্রসাদের পরিচয় জানতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর অনেক প্রশংসা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নন্দকুমারের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বঙ্কিমচন্দ্র নাকি খুব কম দেখেছেন। কেন এতদিন হরপ্রসাদ বঙ্কিমের কাছে আসেননি এ প্রশ্নের উত্তরে হরপ্রসাদ বলেছিলেন, সঞ্জীববাবুর ভয়ে। সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন । তিনি তখন হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার ভয়ে কেন ? হরপ্রসাদ বলেছিলেন, " শুনিয়াছি কামিনি গাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন ।" তখন সেখানে উপস্থিত সকলের হাসির মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। এমন আলাপচারিতার পর রাজকৃষ্ণবাবু হরপ্রসাদের

প্রবন্ধ প্রকাশের প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে:

> ... এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।' অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন,'কী কাজ?' রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।' বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাংলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা তো নিশ্চয়ই নদনদী পর্বত কন্দর লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম," আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্বত কন্দর' আছে", বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, 'প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।' তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'নন্দের ভাই বাংলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।' আমি তিনটি পরিচ্ছেদমাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ি গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন। ... আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকি অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এগুলি চলিবে কী ?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,' যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা।' বলিতে কী, সেদিন আমি ভারি খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ১৮-১৯)

হরপ্রসাদের রচনা ও রচনাশৈলী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বঙ্কিমের এই মন্তব্য হরপ্রসাদকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত এক দিকপাল বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন মূলত বাইশ-তেইশ বছরের এক ছাত্রকে প্রেরণা দিয়ে তাঁর চলার পথকে বেগবান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে হরপ্রসাদের 'ভারতমহিলা' প্রকাশিত হয়। এ ঘটনায় আমরা বুঝতে পারি, কতো বড়ো ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবীন হরপ্রসাদকে 'বঙ্গদর্শনে' এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের লেখকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে

দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চার বছর প্রকাশিত হয়। এরপর একবছর 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ছিলেন হুগলির ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি তাঁর বাড়ি থেকেই অফিসে যাতায়াত করতেন। বঙ্কিমের বাড়ি ছিল তৎকালীন শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের তীর্থস্থান। এ সময় তাঁর বাড়িতে বিকেল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হতো। উল্লেখ্য, সে সময়ের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) প্রমুখ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। নবীন হরপ্রসাদ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর স্নেহসান্নিধ্য লাভের একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ ছিল হরপ্রসাদের। কেবল নিজে নয়; অন্যেরাও বঙ্কিমচন্দ্রকে কী চোখে দেখতেন তার স্মৃতিচারণ করেছেন হরপ্রসাদ:

> যাঁহারা সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কী ভাবে দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে গুরু বলা যায় না, কারণ, তিনি উপদেশ দিতেন না। তাঁহাকে সখা বলিবেন, সে স্পর্ধা কেহ রাখিতেন না; অথচ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালোবাসিত, তাঁহার মুখে একটি ভালো কথা শুনিলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। কেহ কিছু লিখিলে যতক্ষণ বঙ্কিম না ভালো বলেন, ততক্ষণ সে লেখা লেখাই নয়। সে একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য চর্চা তাঁহার বাড়িতে, অন্তত দরবারে হইতে পারিত না। আর সে চর্চার মধ্যে তিনিই সর্বময় কর্তা। যাহা তিনি বলিতেন, মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহাতে মান-অপমানের কিছু ছিল না। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৩২)

১২৮৪ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক হন। কিন্তু লেখার দায়িত্ব ছিল মূলত বঙ্কিমচন্দ্রেরই। তিনি সব সময় হরপ্রসাদকে লিখতে উৎসাহ দিতেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে:

> তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এমন টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক-একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্য কখনও

> প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল– হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা– বঙ্কিমবাবুকে খুশি করিব। তিনি যদি কখনও কোনো প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম। অপ্রশংসা করা বা গালি দেওয়া, কখনো তিনি করেন নাই। যেবার কিছু বলিতেন না, বুঝিতাম, লেখাটা ভালো হয় নাই। সেবার চেষ্টা করিয়া জেরা করিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ২৫)

১৮৭৮ খ্রি. হরপ্রসাদ লখ্‌নৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদে কাজ পান। লখ্‌নৌ যাওয়ার পূর্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে দেখা করতে যান। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়ে ভিজে বাঁধানো সদ্য প্রকাশিত একখানি ' কৃষ্ণকান্তের উইল' হরপ্রসাদের হাতে দিয়ে বলেন, " রেলগাড়িতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে একখানি প্রথম বাহির হইল।" এ ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারি, হরপ্রসাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর স্নেহ ছিল। হরপ্রসাদই ছিলেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রথম পাঠক। লখ্‌নৌতে হরপ্রসাদ এক বছর ছিলেন। তখন তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রায়ই লেখা পাঠাতেন। এ সময় তাঁর লেখা সম্পর্কে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পেতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদকে কোনো চিঠিপত্র পাঠাতেন না; হরপ্রসাদও বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব বেশি পত্র পাঠাননি। এই সময় হরপ্রসাদ বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষিত বাঙালি যুবকের মনের গড়নের উপরে কীভাবে কালিদাস, বায়রন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রভাব পড়েছে তা চমৎকারভাবে এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লখ্‌নৌ প্রবাস থেকে পাঠানো হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এটি কোনো জার্মান পণ্ডিতের লেখা। এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

> বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক– শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক; শিক্ষিত যুবকের জীবন অনন্তবিবাদসংকুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়িতে, এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধী। এইজন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পত্রগুলিতেও এই বিরোধীভাব কতক কতক প্রকটিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশী বাঙালি নিরীহ ভালো মানুষ। বাঙালিরা যে স্বভাব ভালোবাসে, তাহারা সকলেই সেই স্বভাবের লোক– বুদ্ধিমান, চতুর,দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী।

> তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। ঐরূপ লোকের হৃদয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপদ। তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদের সেইভাবেই দেখাইয়াছেন। ... বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রনের মনুষ্যানুরাগ (humanitarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৪৮৭, ৪৯২)

তরুণ হরপ্রসাদের মানসলোকে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন। হরপ্রসাদ দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন – কাঞ্চনমালা ও বেনের মেয়ে। 'কাঞ্চনমালা' নামে উপন্যাসটি হরপ্রসাদের প্রথম জীবনের লেখা। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইতিহাস নির্ভর। এই উপন্যাসে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের সংঘাতের বিবরণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। এ উপন্যাসের লেখনীশৈলী ও ভাষাবিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীশৈলীর মতো। 'বঙ্গদর্শন' উপন্যাসটিতে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। তখন অনেকেই 'কাঞ্চনমালা' পাঠ করে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা মনে করেছিলেন। এর প্রধান কারণ এই উপন্যাসের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতো সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃত অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের ভাষাশৈলীর একটি নমুনা দেওয়া হলো:

> .....সেইঘোরাদ্বিপ্রহরা,শান্তনলিনী,কুমুদগন্ধামোদিনী,ঝিল্লীরবরূতমারুতসংসেবিনী, বিহগকুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জপুঞ্জমঞ্জুতারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয়কৃচিদুৎক্ষিপ্তনয়না কামিনী ধৌতবিধৌতসুরভিচর্চিত বদন শাট্যঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের নিকটাভিসারিকা হইতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ়প্রগাঢ় বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য মেধ্যামনঃসংযোগবৎ, পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রুদ্ধবাহ্যকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্চনমালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার হইল। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র, প্রথম খণ্ড, অক্টোবর ২০১২: ১০৪)

পরবর্তী কালে শাস্ত্রী মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য '*কাঞ্চনমালা*'র একটি মুখবন্ধ লিখেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীশৈলী সম্পর্কে সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন:

> আমাকে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় "সরু মোটা খেলে।" অর্থাৎ কখনও তিনি গুরুগম্ভীর সমাস-বহুল সংস্কৃত শব্দাবলীর প্রয়োগ করেন, আবার কখনও কখনও চলতি সহজ, এমন কি, গ্রাম্য ভাষা একই পুস্তকে ব্যবহার করেন। পিতৃদেবের মতে ইহাই ছিল 'সরু মোটা' লেখার লক্ষণ। 'কাঞ্চনমালা' পড়িলে মনে হয়, গ্রন্থকার ইহাতে বঙ্কিমবাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ 'সরু মোটা' ভাষায় লেখা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাই স্থানে স্থানে কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য, সমাসবহুল ভাষা, আবার স্থানে স্থানে সহজ, ঘরোয়া এবং অতি-পরিচিত ভাষা তাঁহার একই 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে পাওয়া যায়। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, অক্টোবর ২০১২: ৫৮৬)

বলা হয়, '*কাঞ্চনমালা*' পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত না হয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি অখুশি হয়েছিলেন। এ কারণেই মনে হয়, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার তেত্রিশ বছর পর '*কাঞ্চনমালা*' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিলম্ব প্রকাশের কারণ প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন: " কেন, কি বৃত্তান্ত – সে অনেক কথা–বলিয়া কাজ নাই।" এ সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য আছে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষণে: "আমার সহিত তাঁহার দুই-তিন বার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন কি, তাহার জন্য আমাকে কিছুদিন বাংলা লেখা ছাড়িতে হইয়াছিল।" গোপীনাথ কবিরাজ, শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য ও গণপতি সরকার 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

তরুণ বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় ব্যক্তিত্বের মূর্তি দর্শন করতেন। পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি হরপ্রসাদের আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও তিনি আপনশৈলীতে সাহিত্যবিচার এবং নিজস্ব মতপ্রকাশে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বকীয়তা প্রকাশে, নিজস্ব বিকাশের পথে তিনি সচেতনভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হয়েছেন। হরপ্রসাদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকে রচিত উপন্যাসগুলি কাব্যসৌন্দর্য ও রসসৌন্দর্যে উৎকৃষ্ট। এমন কি হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশতত্ত্ব তাঁর '*আনন্দমঠ*'(১৮৮৪), '*দেবী চৌধুরাণী*' (১৮৮৪), '*সীতারাম*' (১৮৮৭) উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন; হরপ্রসাদ তার সমর্থন করেননি, তিনি তাঁর মতামতকে ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন:

> যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য, পরম সৌন্দর্য

> অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম, তাহাই পরম ধর্ম। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটো জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতো হিন্দুধর্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে Overrule করিলেন। (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য বি সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র* দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০: ৩১)

১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় '*রঘুবংশ*' শিরোনামে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রঘুবংশ মহাকাব্যের আয়তন, কালিদাসের কোন বয়সে লেখা, এর কাব্যমূল্য ইত্যাদি বিষয় এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা, কালিদাস পরিণত বয়সে এটি রচনা করেন। এ সম্পর্কে 'রঘুবংশের গাঁথুনি' প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন:

> ... রঘুবংশ Hale's Longer English poems –এর মতো কতকগুলি কাব্যের সমষ্টি, তবে একটি বংশ ধরিয়াই যখন সব কাব্যগুলি লেখা হইয়াছে, তখন উহা এক সুতায় গাঁথা আছে। ... তবে এ কাব্যগুলি সবই পাকা হাতের লেখা, ইহাদের অর্থ অতি গভীর, এবং ইহাতে উপদেশ অতি মধুর ও হিতকর। (সত্যজিৎ চৌধুরী, ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র* পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ৪১০)

রঘুবংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের প্রতি অনেক অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, '*রঘুবংশ*' একেবারেই কাঁচা হাতের লেখা এবং কালিদাসের কম বয়সে লেখা। এ সম্পর্কে হরপ্রসাদ তাঁর 'রঘুবংশের গাঁথুনি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে দুইবার লিখিবার পর একদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করেন, " বঙ্গদর্শনে রঘুবংশের কথা তোমার লেখা ?" আমি বলিলাম, " আজ্ঞে হাঁ।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন," তুমি কি এইরূপ বরাবর লিখিবে ?" আমি বলিলাম," ইচ্ছা তো আছে।" তিনি তখন বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকেও তোমার বিরুদ্ধে সশস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম," কেন ?" তিনি তখন গরম হইয়া বলিলেন," আমি বহুদিন অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া দেশের রুচি একটু ফিরাইয়া আনিতেছি। তুমি যে আমার সব চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে, আমি তাহা সহিতে পারিব না। তুমি কি না বলো, রঘুবংশ পাকা হাতের লেখা। কাকে পাকা বলে, কাকে কাঁচা বলে, তুমি তাহার জান কী

> ?" দেখিলাম, তিনি বেশ একটু রাগত হইয়াছেন। তখন আমি বলিলাম," আপনি যদি রাগ করেন, আমি না-হয় লিখিব না।" কিন্তু তাহাতেও তাঁহার রাগ পড়িল না। তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ঐ কথাই তুলিতে লাগিলেন। (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র* পঞ্চম, খণ্ড, ২০০৬: ৪১০-৪১১)

এ ঘটনার পরে বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকতে হরপ্রসাদ আর রঘুবংশ নিয়ে লেখেননি। তবে হরপ্রসাদ রঘুবংশকে গভীর ভাবে পাঠ করেছিলেন, ডুব দিয়েছিলেন কালিদাসের কাব্যপাঠে। এভাবে তিনি তাঁর নিজের ধারণাকে পাকা করে তুলতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি রঘুবংশকে নিয়ে 'নারায়ণ' পত্রিকায় নয়টি প্রবন্ধ লিখেছেন– রঘুবংশের গাঁথুনি (শ্রাবণ, ১৩২৫), রঘুতে নারায়ণ (ভাদ্র, ১৩২৫), রঘু আগে কি কুমার আগে (আশ্বিন, ১৩২৫), অজবিলাপ ও রতিবিলাপ (কার্তিক, ১৩২৫), রঘুকাব্য বড়ো কিসে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৫), রঘুবংশে বাল্যলীলা (পৌষ, ১৩২৫), রামের ছেলেবেলা (ফাল্গুন, ১৩২৫), রঘুবংশে প্রেম (চৈত্র, ১৩২৫), রঘুবংশে প্রেম-বিরহ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬)। 'রঘুবংশের' নির্মাণ কৌশল বা গাঁথুনিটি নির্ণয় করার অধ্যবসায়ে তিনি মূলত কালিদাসের কবিত্বশক্তির ক্রমিক উন্নততর বিকাশ, তাঁর প্রকাশশৈলীর সৌন্দর্য ও সংযম লক্ষ করে ধরে ধরে অসাধারণ আলোচনা করেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল রঘুবংশ নিয়ে লেখা সকল প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে উপস্থাপন করবেন, তাঁর মতামত নিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে ছিলেন না। এ সম্পর্কে তিনি 'রঘুবংশের গাঁথুনি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> বঙ্কিমবাবুর সহিত কথাবার্তার পর আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যতক্ষণ এই সূত্রটুকু (unity of purpose) খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, ততদিন আমি আর রঘুবংশ সম্বন্ধে কিছুই লিখিব না। কিন্তু যদি সেটি খুঁজিয়া পাই, বঙ্কিমবাবুকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর আবার রঘুবংশের কথা লিখিব। সে সূত্রটি ধরিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুকে দেখাইবার আর সুযোগ হইল না; দেখাইতে পারিলে তিনি কী বলিতেন, তাহাও জানিবার কোনো সুযোগ হইল না। (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ৪১২-৪১৩)

সাহিত্যের দীক্ষাগুরু, অভিভাবক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিষ্যের প্রতি প্রবল কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন এ ঘটনায় তা প্রমাণিত। আর গুরুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়েও শিষ্য হরপ্রসাদ নিজ মতপ্রকাশে ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী, আপন আলোয় সমুজ্জ্বল এক আত্মনিবেদিত মহান গবেষক।

১৮৭২ খ্রি. (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ৫ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ প্রবন্ধ '*উত্তরচরিত*' প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, এর অনেক বছর পূর্বে ১৮৫৭ খ্রি. বিদ্যাসাগর মহাশয় '*সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব*' গ্রন্থে ভবভূতির উত্তরচরিত নিয়ে অসাধারণ মূল্যায়ন করেছেন। বিদ্যাসাগরের মতে, ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। তবে তাঁর দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা নাটকের সংলাপে অনুপযোগী।[১] উল্লেখ্য, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তরচরিতে' বিদ্যাসাগরের ভবভূতিভাবনা নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন:

> ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ,ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত বোধ হয় না।' আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্য রসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না। যাহা হউক, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মাধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন ? (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ২২৭)

ভবভূতির মূল্যায়ন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য আমাদের কাছে বিস্ময়করই বটে। '*উত্তরচরিত*' নিয়ে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের লেখা শাস্ত্রী মহাশয় পড়েছিলেন। হরপ্রসাদ ভবভূতিকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত' এই শিরোনামে। প্রবন্ধটি ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'নারায়ণ' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ভবভূতি' শিরোনামে তাঁর দ্বিতীয় লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায়। উল্লেখ্য, তখন হরপ্রসাদ বেঁচে ছিলেন না। কালিদাসের সাহিত্যপাঠের মতো ভবভূতির সাহিত্য তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে, ভবভূতি পাণ্ডিত্যের চেয়ে কবিত্বশক্তিকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। এখানে উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের '*উত্তরচরিত*' প্রবন্ধ পড়ে তিনি তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই 'তাঁর মতামতের' বিপক্ষে নিজস্ব মতামত যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেন।

বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র রামচন্দ্রকে কাপুরুষ বলায় হরপ্রসাদ গভীরভাবে রামচন্দ্রকে উপলব্ধি করে ভবভূতির রামচরিত্র নিয়ে এভাবে মন্তব্য করেছেন:

> বঙ্কিমবাবু বলিলেন, রাম কাপুরুষ, কিন্তু সীতা বিসর্জন মীমাংসায় উপনীত হইতে তো তাঁহার এক মিনিটও দেরি হইল না। লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি আত্মবলি দিলেন, তাহার উপর দুফোঁটা চোখের জল পড়িল বলিয়া তাঁকে কাপুরুষ বলিব ? বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, আর যে বলিতে হয় বলুক আমি তো পারিব না। আমি তো দেখি এ রাম রামায়ণ-এর রামের অপেক্ষা, প্রেমেও বড়ো, বিরহেও বড়ো, বীরত্বেও বড়ো। তবে মানুষ তো ? রক্ত মাংসের শরীর তো ? এ অবস্থায় নির্জনে বিশেষ সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ কিছুতেই পরিহার করা যায় না। (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ২২২)

বঙ্কিমের '*উত্তরচরিত*' পড়ে হরপ্রসাদ বেশ সাহস করেই মন্তব্য করেছিলেন, ' সংস্কৃত উত্তরচরিত বঙ্কিমবাবুর যে ভালো করিয়া পড়া ছিল, বোধ হয় না। কালিদাসের কাছে ভবভূতি কোথায় ঋণী আছেন বঙ্কিমবাবু তা ধরতে পারেননি।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসাহিত্যের মূল্য বিচারের সাথে পরিণত হরপ্রসাদের সাহিত্যদৃষ্টির ছিল যথেষ্ট ব্যবধান । এই নিয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে দুই-তিনবার ঘোরতর মতভেদ হয়। এমন কি শিষ্য গুরুর প্রতি অভিমান করে কিছুদিন বাংলা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর একবার অন্য একটা কারণে একটু বিবাদ হওয়ায় হরপ্রসাদ চার-পাঁচ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে যেতেন না। সময়টা ১৮৮০ সালের দিকে। তখন অনেকে হরপ্রসাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, এই শীঘ্রই যাব। আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, হয়তো বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে, তাই আসতে পারছে না। অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের মধ্যে মান-অভিমান থাকলেও বাইরের মানুষের সামনে তাঁরা পরস্পর ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। কেউ কোনো বিন্দু-বিসর্গ বোঝার পূর্বেই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের বিবাদ মিটে গিয়েছিল। এক সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব হরপ্রসাদের কাছে পত্রসহ এক বিদেশী অধ্যাপককে পাঠিয়েছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন, ইনি যা চান, তা যেন হরপ্রসাদ করে দেন। তাঁর নাম ইভান পাভ্‌লোভিচ মিনায়েফ (১৮৪০খ্রি.-১৮৯০খ্রি.)। তিনি সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের স্বনামধন্য অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি হরপ্রসাদকে অনুরোধ করেন। তখন হরপ্রসাদের প্রথমেই যে নামটি

স্মরণে এসেছিল, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। তখন হরপ্রসাদের মনে হয়েছে, " তাঁহার কাছে আগে না লইয়া গিয়া অন্য জায়গায় গেলে সহচারবিরুদ্ধ হইবে।" তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে অধ্যাপক ইভানের ইচ্ছার কথা বললেন। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদকে অনেকদিন পর নিজের বাড়িতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপক ইভানকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য হরপ্রসাদের প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কেবল তাই নয়, এই উপলক্ষে সেদিন সে সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি হেমচন্দ্র প্রমুখ বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় আমরা এটা বুঝতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র-হরপ্রসাদের মধ্যে কখনও সম্পর্কের টানাপোড়ন হলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গুরুর স্নেহশীলতায় আর শিষ্যের শ্রদ্ধায় বঙ্কিম-হরপ্রসাদের সম্পর্ক আত্মিক এবং সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্বল্প পরিসরে আরও স্বল্প উদ্ধৃতি সহযোগে হরপ্রসাদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত যে সমাচার আলোচিত হলো তা আকর্ষণীয় এবং অনুকরণীয়। এখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া পরিচ্ছন্ন এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এমন একটি মানদণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোনো হীনতা নিচুতা তাকে আঘাত করে দীর্ণ করতে পারেনি। কোনো আবিলতা স্বচ্ছতাকে আচ্ছাদিত করতে পারেনি। সম্পর্কে মাঝে মধ্যে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে, মান-অভিমানও হয়েছে। কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক নয়। যেখানে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সমন্বয় আছে, সেখানে মান-অভিমান থাকবে। তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট তা আদর্শিক এবং সাহিত্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গির। এই বৌদ্ধিক এবং বৈচারিক স্থান থেকে কেউ বিচ্যুতও হননি। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। গুরু ক্ষুণ্ন হবেন বা মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হবেন ভেবে অনেক সময় শিষ্য তাঁর ইচ্ছা কিংবা লেখা প্রকাশে বিরত থেকেছেন। এখানে মনে রাখতে হবে, গুরু বঙ্কিমচন্দ্র। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুক্ষেত্রে লোকশিক্ষা এবং সমাজশিক্ষা প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর আদর্শ প্রচারে প্রতিবন্ধকতা হতে পারে ভেবে তিনি কারও মত প্রকাশে কখনও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। হরপ্রসাদ তাঁকে ঠিকই বুঝেছিলেন। গুরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মর মূর্তি উন্মোচন করতে গিয়ে হরপ্রসাদের হৃদয়োত্থিত বক্তব্যের শেষাংশ এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য–

" তিনি জীবনে আমার Friend Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত। (*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, নভেম্বর ২০০০:

৪৬)। বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো এই অম্লান গুরু-শিষ্য সম্পর্ক আমাদের অনুসরণীয় হোক।

তথ্যসূত্র

১. ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন, কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও চমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য। (সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, ১৩৯৯: ১২১)

২. এই যে সীতা,– অদৃশ্য সীতা– ছায়া সীতা – ভবভূতি ইহা কোথায় পাইলেন ? বঙ্কিমবাবু ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু সে কথাটি বলেন নাই বরং বলিয়াছেন জিনিসটা একটু লম্বা হইয়াছে। ... তবে এ ছায়া-সীতা কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া বুঝিব ? এক উপায়– সেই উপায়– সংস্কৃত সাহিত্য সাগরে ডুব দাও। দেখ ভবভূতি কোথা হইতে এ ছায়া-সীতা আনিয়াছেন, এবার বেশি-দূর যাইতে হইবে না, অভিজ্ঞানশকুন্তলেই ছায়া-সীতার মূল পাওয়া যাইবে। কৌশলী কালিদাস শকুন্তলার ৬ষ্ঠ অঙ্কে একটি অপ্সরাকে তিরস্করণী বিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে দুষ্মন্তের বিরহযন্ত্রণা দেখাইয়াছেন ও তাহার মুখে শ্রোতাদের শকুন্তলার অবস্থা জানাইয়াছেন। সে অপ্সরা বারংবার বলিয়াছে যে শকুন্তলা যদি দুষ্মন্তের এইরূপ অবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রাজা যে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখ করিতেন না। ভবভূতি দেখিলেন, বাঃ এত বেশ সাজানোই আছে ! আমি কেন তিরস্করণী-আচ্ছাদিত তমসার সঙ্গে সীতাকে আনাইয়া, কালিদাস যাহা

করেন নাই তাহা করি; নাটক খুব জমিয়া যাইবে। বাস্তবিকও ভবভূতি তাহাই করিয়াছেন। ভাস হইতে কালিদাসের একটি সুসজ্জিত ঘটনা পাইলেন, তাহার উপর আর-একটুকু রসান দিয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আবার সীতার হাত ধরার চেষ্টাটা তিনি ভাসের বাসবদত্তা হইতে লইয়াছেন। । (সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, পঞ্চম খণ্ড, ২০০৬: ২২২)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত (২০১১)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা।

রমেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত ও নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত (২০০৭)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, *সদেশ*, কলিকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী (১৯৯৯)। *ভারতীয় সাহিত্যকার গ্রন্থমালা*। সাহিত্য অকাদেমি, কলিকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০১২)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা- সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০০০)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা- সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত (২০০৬)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*,পঞ্চম খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত (১৩৯৯)। *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*। কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা।

হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ (২০০৭)। *ছদ্মনামের অভিধান*। দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন

আনিসুজ্জামান *

লুডভিগ জোসেফ জোহান ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এক অভিজাত ও অত্যন্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ও ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কাটানো এ অস্ট্রিয়-ব্রিটিশ দার্শনিকের মূলকাজ যুক্তিবিদ্যা, ভাষাদর্শন, মনোদর্শন, ও গণিতের দর্শনে। ভিটগেনস্টাইনের মনোযোগী পাঠক ও গবেষক জানেন যে, তাঁর লেখার পদ্ধতি অন্যসব দার্শনিকের (কিছুটা ব্যতিক্রম স্পিনোজা) থেকে ভিন্ন। প্রথম কথা হলো: প্রচলিত ধারণা যে দর্শন অনুধ্যানমূলক[১] এবং দর্শনের কাজ বিশেষ ধরনের তত্ত্ব নির্মাণ-এর বিপরীতে তিনি মনে করতেন দর্শন একটি ক্রিয়া বিশেষ: "Philosophy is not a theory but an activity."[২] ঠিক একই ভাবে দর্শনের অন্যতম প্রধান শাখা নীতিবিদ্যার ব্যাপারেও ভিটগেনস্টাইনের ধারণা অভিনব। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিটগেনস্টাইনের নৈতিকতা সম্বন্ধে মূলধারার বিপরীত একটি অবস্থান উপস্থাপনের চেষ্টা করবো। ভিটগেনস্টাইন নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: "Ethics is the enquiry into the meaning of life, or into what makes life worth living, or into the right way of living".[৩] লক্ষ করার বিষয় হলো–– এ সংজ্ঞাটি কিন্তু নীতিবিদ্যার প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন, ব্যাপক এবং

* ড. আনিসুজ্জামান, প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১ আধুনিক দর্শনের জনক বলে পরিচিত ফরাসি দার্শনিক রেনে ডেকার্ট-এর একটি বইয়ের নামই Meditations। বলা বাহুল্য, এ বইটি তাঁর দার্শনিক চিন্তার ধরনের স্মারক।

২ Tractatus Logico-Philosophicus (TLP), 4.112, C K Ogden-এর অনুবাদ।

৩ Lecture on Ethics (LE), p.44

আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর দর্শন নির্মাণের ক্ষেত্রে যাঁদের প্রভাব পড়েছে, তাঁদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এ প্রভাবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব না। সেজন্য এখানে আমি জন্ম তারিখ অনুযায়ী কেবল তাঁদের নাম উল্লেখ করবো, যাতে আগ্রহী পাঠক ও গবেষক এসব দার্শনিকের লেখা পড়ে ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অধিক পরিজ্ঞাত হতে পারেন। দর্শনের ক্ষেত্রে ভিটগেনস্টাইনের উপর যাদের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: স্পিনোজা (১৬৩২ - ১৬৭৭), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), গ্যেটে (১৭৪৯ - ১৮৩২), শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০), কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫), টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ফ্রেগে (১৮৪৮ - ১৯২৫), বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২ - ১৯৭০), ও জি ই ম্যুর (১৮৭৩-১৯৫৮)।

আমি বলেছি যে, ভিটগেনস্টাইন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, প্রভাব বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক[৪] যিনি আড়াই হাজার বছর ধরে প্রচলিত দার্শনিক ধারার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন সেটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য কাদের উপর তাঁর দর্শনের গভীর প্রভাব পড়েছিল তাঁদেরও নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন খোদ তাঁর শিক্ষক রাসেল ও ম্যুর। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য হলেন রুডোলফ কারনাপ (১৮৯১ - ১৯৭০), গিলবার্ট রাইল (১৯০০-১৯৭৬), ফ্রাঙ্ক পি রামজে (১৯০৩ - ১৯৩০), রুশ রিজ (১৯০৫-১৯৮৯), এ জে এয়ার (১৯১০-১৯৮৯), নরমান ম্যালকম (১৯১১-১৯৯০), এলান টুরিং (১৯১২ - ১৯৫৪), জর্জ হেনরিক ভন রাইট (১৯১৬-১৯৯৭), পিটার গিচ (১৯১৬-২০১৩), পি এফ স্ট্রসন (১৯১৯ - ২০০৬), এলিজাবেথ এনসকম্ব (১৯১৯ - ২০০১), ডেভিড পিয়ারস (১৯২১ - ২০০৯), স্টিফেন টলমিন (১৯২২ - ২০০৯), পিটার উইনস (১৯২৬-১৯৯৭), নোয়াম চমস্কি (১৯২৮), জন সারলে (১৯৩২), ডি জেড ফিলিপস (১৯৩৪-২০০৬), হ্যান্স ব্লুগা (১৯৩৯-), পিটার হ্যাকার (১৯৩৯ -), সাউল ক্রিপকি (১৯৪০ -), ড্যানিয়েল ডেনেট (১৯৪২-), লারস হারজবার্গ (১৯৪৩-), ডেভিড কোবার্ন (১৯৪৮-) এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী এঁদের ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য ছাত্রছাত্রী দার্শনিকেরা যারা এ শতাব্দীতেও দর্শনের বিভিন্ন ধারাকে বিকশিত ও বেগবান করে চলেছেন এবং এ ধারা বহমান রেখেছেন।

[৪] Stanford Encyclopedia of Philosophy

ভিটগেনস্টাইনের লেখার পরিমাণ বিপুল; যদিও জীবদ্দশায় তাঁর কেবল একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। Ogden-এর অনুবাদে ৭৭ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি যুগান্তকারী। গ্রন্থটির নাম : *Tractatus LogicoPhilosophicus*। মূল বইটি জার্মান ভাষায় লেখা। কেমব্রিজের অধ্যাপক হয়েও ভিটগেনস্টাইন তাঁর মাতৃভাষা জার্মান ভাষায় লিখতেন। মৃত্যুর পর তাঁর অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অনেক গ্রন্থই ইংরেজিসহ বিশ্বের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রবন্ধ শেষে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের একটি তালিকা দিলাম, যাতে উৎসাহী পাঠক ও গবেষক বইগুলো পড়তে পারেন এবং আমি যে ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের অপ বা আংশিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি না তা উপলব্ধি করতে পারেন।

আমি ভিটগেনস্টাইনের অনেক লেখা এবং তাঁর লেখার কয়েকজন ব্যাখ্যাতার[৫] লেখা অধ্যয়ন করে আমার এ প্রবন্ধটি রচনা করেছি। ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন সম্বন্ধে আমি যেটা উপলব্ধি করেছি সেটি এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছি। ভিটগেনস্টাইন নিজে কোন এক স্থানে তাঁর নৈতিক মত উপস্থাপন করেননি। আমি যে তাঁর অবস্থানের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছি না সে লক্ষ্যে আমি তাঁর নিজের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে আমার অবস্থানকে তুলে ধরবো। আমরা জানি যে, তিনি কোন বিশেষ ধরনের নৈতিক মত উপস্থাপন করেননি। বস্তুত তিনি সব ধরনের মত উপস্থাপনের এক প্রকার বিরোধী ছিলেন। ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন বোঝার জন্য দর্শন, মানুষের আচরণ বা কাজ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যা ভাষাতাত্ত্বিক বা ধারণাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না; অথচ সমকালীন দর্শনের অন্যতম প্রধান যে শাখা–– ভাষাদর্শন এবং যার উপর ভিটগেনস্টাইনের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে, তার অন্যতম কাজ হচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তিনি নিজেও মনে করতেন যে, তথাকথিত অনেক দার্শনিক সমস্যা মূলত এক ধরনের ভাষাগত জট বা গেরো বিশেষ। ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ জট বা গেরো খুলে ফেলা প্রয়োজন (to unknot the knot) এবং এতে সমস্যাগুলো আর থাকবে না। অন্য কথায়, এগুলো আসলে কোন সমস্যা নয়–– এক ধরনের ছদ্ম সমস্যা (pseudo-problem)। কাজেই এদের সমাধান (solution) নয়, প্রয়োজন দ্রবীভূতকরণের (dissolution)। তাঁর ধারণা ছিল যে, নীতিবিদ্যা আসলে এ জগতের বাইরের –– অতিবর্তী :

---

৫ প্রবন্ধের শেষে তালিকা দেখুন।

"Ethics is transcendental"[৬]। অন্যত্র তিনি বলেছেন, নীতিবিদ্যা অতিপ্রাকৃতিক: "Ethics, if it is anything, is supernatural ... ."[৭]। মনে রাখা দরকার যে ভিটগেনস্টাইন নীতিবিদ্যাকে অতিপ্রাকৃতিক বা অতিবর্তী মনে করলেও, তিনি এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন: "My whole tendency and I believe the tendency of all men who ever tried to write or talk ethics or religion was to run against the boundaries of language. ... it [Ethics] is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot help respecting deeply and I would not for my life ridicule it."[৮] উল্লেখ্য, ট্র্যাকটাটুস-এর প্রথম বাক্য: "The world is everything that is the case. The world is the totality of facts, not of things."[৯] এজন্য ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক ভাবনা উপস্থাপন করা বেশ কঠিন। ভিটগেনস্টাইনের ধারণা ছিল, ধর্ম ও নৈতিকতা জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ভাষাতাত্ত্বিক বা যৌক্তিকভাবে মানবজীবনের এ দিকটি মূর্ত করা না গেলেও শিল্পের মাধ্যমে ও নান্দনিকভাবে এদের কিছুটা হলেও স্পষ্ট করা যায়।

ভিটগেনস্টাইনের ধারণা ছিল যে, জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না, কারণ ভাষার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্যে ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান ছিল বিশ্বাসের, যুক্তি ও বিশ্লেষণের নয়। নৈতিকতা সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। এজন্যে মানবজীবনের এ দিকটিকে তিনি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাইতেন না। এ প্রসঙ্গে ট্রাকটাটুস-এর শেষ বাক্য উল্লেখ্য। সম্ভবত এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন: "Whereof one cannot speak, thereof one must be silent."[১০] এই যে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্বন্ধে নিশ্চুপ থাকা, যেটা ট্রাকটাটুস-এর শেষ বাক্যে ধৃত হয়ে আছে সেটাকে দর্শনে Quietism বা Fideism নামে চিহ্নিত করা হয়। এটাকেই ভিটগেনস্টাইন unsayable বলেছেন।

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন তাঁর উপলব্ধ form of life[১১]-এর এর সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। এজন্যেই তিনি নৈতিকতাকে ভাষায় বিশ্লেষণ না করে,

[৬] TLP, 6.421 (পিয়ারস-এর অনুবাদ); also see, Notebooks (NB), p.162
[৭] LE, p.46.
[৮] Ibid., p.51
[৯] TLP, 1, 1.1 (Ogden)
[১০] Ibid., 7(Ogden)
[১১] Philosophical Investigations (PI), Sections 19, 241, etc.

কারণ তার মতে তা করা যায় না, জীবনে ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর এই যে form of life অথবা life-form তা ব্যক্ত হয় মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির (ways of life or life-styles) মাধ্যমে। কোন মানুষের জীবনের এ দিকটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে বা এ দিকটির প্রতি সুবিচার করতে চাইলে মানুষের ঐতিহাসিক ও জৈবিক উপলব্ধির (historical and biological understanding of humans) দরকার। এ জন্যেই তো তিনি বলেছেন: "What can be shown, cannot be said."[১২] আমরা জানি, তাঁর ট্র্যাকটাটুস-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা ভাষার চিত্র বা ছবিতত্ত্ব (Picture theory of language)।

সম্ভবত এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন: "The human body is the best picture of human soul.[১৩] ভিটগেনস্টাইন অন্যত্র বলেন: "The face is the soul of the body."[১৪]। আগেই উল্লেখ করেছি, ভিটগেনস্টাইনের মতে নৈতিকতা বা মূল্যের উৎস পার্থিব জগতের বাইরে। এটি সত্যি যে, ঘটনা জগতে ঘটে, কিন্তু মূল্যায়ন হয় বাইরে থেকে আসা কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে। ভিটগেনস্টাইনের কাছে ঘটনা হিসেবে একটি হত্যা ও একটি পাথরের পতন একই পর্যায়ের: "The murder will be on exactly the same level as any other event, for instance, the falling of a stone."[১৫] ভিটগেনস্টাইন দর্শনকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন শাখা বলে মনে করতেন না: "Philosophy is not one of the natural sciences."[১৬] তিনি মনে করতেন, দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তার যৌক্তিক স্পষ্টীকরণ: "The object of philosophy is the logical clarification of thoughts."[১৭] যেহেতু তাঁর প্রস্তাবিত চিত্র বা ছবিতত্ত্ব অনুযায়ী একটি বচন কেবল তখনই অর্থপূর্ণ হয়, যখন সেটিকে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত বা চিত্রায়িত করা যায় (Statements are meaningful if they can be defined or pictured in the real world.)।

আমরা জানি যে, ভিয়েনা গোষ্ঠীর যে মূলনীতি তার সূত্রায়নে ট্র্যাকটাটুস-এর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। আর বিশ্লেষণী দর্শনের বিকাশ ধারায় বিশেষ করে ১৯২০ ও ১৯৩০-এর

[১২] TLP, 4.1212, (Pears)
[১৩] PI, Part 2, p.178
[১৪] Culture and Value (CV), p.24
[১৫] LE, p.45
[১৬] TLP, 4.111 (Pears)
[১৭] Ibid., 4.112 (Ogden)

দশকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের উপর এর (Tractatus) গভীর প্রভাব পড়েছিল। এ সময় যেহেতু নীতিবিদ্যায় আবেগাত্মক তত্ত্বের (emotive theory in ethics) উপস্থাপন হয়, সেজন্য, অনেকে মনে করেন যে ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শন নেতিবাচক। ভিটগেনস্টাইনের সব লেখা বিবেচনায় নিলে এ মত পরিবর্তন করতে হয়।

Philosophical Investigations-এ ভিটগেনস্টাইন চিত্র বা ছবিতত্ত্ব থেকে, বলা চলে, অনেকটাই বেরিয়ে আসেন। এখানে তিনি দেখান যে, শব্দ হচ্ছে এক ধরনের "যন্ত্র" (tools) যা আমরা বিভিন্ন ধরনের "খেলা" (games) খেলতে ব্যবহার করি। অবশ্য তিনি এটাকে আক্ষরিক অর্থে নয় বরং এক ধরনের pattern of intention অর্থে বুঝিয়েছেন। এটি পরবর্তীকালে ভাষার ব্যবহার তত্ত্ব (meaning as use) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ভিটগেনস্টাইনের নৈতিক দর্শনের কথা বলতে যেয়ে আমি উপরে form of life এর কথা বলেছি। এটি মূলত ভাষার এক ধরনের সামাজিক কাজ বা ক্রিয়া (social function)। আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক আচরণ (cultural practice) ও মূল্যবোধ (values) বোঝাতে যেয়েও ভাষা ব্যবহার করি। আর এক্ষেত্রেই নৈতিকতার প্রসঙ্গ এসে যায়। এখানে ভাষার দুটো দিক দেখছি: একটি জ্ঞানগত দিক (cognitive aspect); Elastic sterf op fap (cultural aspect)।

ভিটগেনস্টাইনের মতে ভাল বা মূল্যবোধের সাথে যা কিছু সম্পর্কিত তাই ঐশী, তাই অতিপ্রাকৃতিক; যদিও এ কথাটা শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগে, কিন্তু এটাই ভিটগেনস্টাইনের মত। তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন: "What is good is Divine too. That, strangely enough, sums up my ethics. Only something supernatural can express the Supernatural."[১৮]

আগেই উল্লেখ করেছি, ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে। ভাষা কেবল প্রাকৃতিক বা অভিজ্ঞতার জগতের কথা ব্যক্ত করতে পারে। যেহেতু নৈতিকতার উৎস এ জগতের বাইরে, তাই নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট করে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভিটগেনস্টাইন বলেন: "So too it is impossible for there to be propositions of ethics. Propositions can express nothing that is higher. It is clear that ethics cannot be put into words.

[১৮] cv, p.10.

Ethics is transcendental (Ethics and Aesthetics are one and the same.)"[১৯]

প্রথম বা আপাতদৃষ্টিতে নৈতিকতা সম্বন্ধে ভিটগেনস্টাইনের মত বা অবস্থানকে পরস্পর বিরোধী, এমনকি রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। ভিটগেনস্টাইন এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন: "But this [Ethics] is really in some sense deeply mysterious!"[২০] তিনি অন্য আরেক জায়গায় বলেন: "It is clear that ethics cannot be expressed."[২১] ভিটগেনস্টাইন কেবল যে নীতিবিদ্যাকে অতিবর্তী মনে করতেন তাই না, তিনি যুক্তিবিদ্যাকেও অতিবর্তী (transcendental) মনে করতেন: "Logic is transcendental."[২২]

সাধারণভাবে যুক্তিবিদ্যা, বিশেষ করে নৈতিকতা সম্বন্ধে ভিটগেনস্টাইনের কথাকে হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হলেও, আসলে এটাই সত্যি। ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে, এ পার্থিব জগতে ঘটে, এটি ঘটনার বর্ণনার দিক, মূল্যায়নের দিক নয়। মানুষ মানব প্রদত্ত যুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও অনপেক্ষ বিচার করতে পারে না। এর কারণ মানুষের সব কিছুই স্থান ও কালের পরিসীমায় সংঘটিত হয়, সেজন্য তা হয় আপেক্ষিক। যে যুক্তি দেয়, যেজন্য যুক্তি দেয়, যার পক্ষে/বিপক্ষে যুক্তি দেয় তা দৈশিক ও কালিক দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটি আরও অধিক প্রযোজ্য। মানুষতো মানুষের কোন কাজের পুরোপুরি বিচার ও মূল্যায়ন করতে পারে না। তার পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা আছে। পক্ষপাতিত্বের (পক্ষে/বিপক্ষে যাওয়ার) বাস্তবতা আছে, ব্যবহৃত বা প্রয়োগমত মানদণ্ডের সীমাবদ্ধতা আছে। সেজন্য এসব ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতিক বা ঐশী দিশার প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয়, যদিও পরবর্তী সময়ে ভিটগেনস্টাইনের পরিবার অবস্থার চাপে খ্রিষ্টান হয়ে যায়, তার অবচেতন মনে ইহুদি ধর্মের আইন তথা ঐশী আইনের গভীরতা ও ব্যাপ্তির এক ধরনের উপলব্ধি ছিল ও সে আইনের প্রতি এক প্রকার আনুগত্য কাজ করছিল। এ কথা সত্যি যে, ভিটগেনস্টাইনকে খ্রিষ্টধর্মের ক্যাথলিক মতে ব্যাপ্টাইজ করা হয় এবং মৃত্যুর পর সেভাবেই তাঁকে কবরস্থও করা হয়, কিন্তু তাঁর উপলব্ধির গভীরে ছিল যে আসলে মানুষ মানুষকে বিচার করতে পারে না এবং মানুষের পক্ষে কোন মৌলিক মানবীয় মানদণ্ড অনুযায়ী চলা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে

[১৯] TLP, 6.42, 6.421 (Pears)
[২০] Notebooks (NB), p.160
[২১] TLP, 6.421 (Ogden)
[২২] Ibid., 6.13 (Pears)

মানব মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত দশটি আদেশ (Ten Commandments)-এ বিবৃত ও ধৃত হয়ে আছে।[২৩] এক্ষেত্রে অর্ন্তদৃষ্টিটা হলো যিনি সৃষ্টি করেছেন মূল বিধানও তিনিই দিতে পারেন। তবে স্রষ্টার কিছু কাজ ও গুণের প্রতিনিধি হিসেবে স্রষ্টা প্রদত্ত মৌলিক বিধির অধীনে মানুষ দেশকাল অনুযায়ী উপবিধি প্রণয়ন করতে পারে এবং মূল বিধির সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা প্রদান ও তা প্রয়োগ করতে পারে। সম্ভবত এ কারণেই ভিটগেনস্টাইন ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অতিজাগতিক বা পরাপ্রাকৃতিক উৎসের কথা বলেন: "The solution of the riddle of life in space and time lies outside space and time."[২৪]

কান্ট বিশুদ্ধ যুক্তি তথা বৌদ্ধিকভাবে অগ্রসর হয়ে noumenal world-এ যে me antinomies-এর সম্মুখীন হয়েছেন ভিটগেনস্টাইন এভাবেই সেগুলোর সমাধান নির্দেশ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কান্টও বিশুদ্ধ যুক্তির বাইরে গিয়ে, তথা Critique of Practical Reason এবং Critique of Judgment-এ যেয়ে নৈতিকতার সমস্যার সমাধান পেয়েছেন; অন্য কথায়, সমস্যা phenomenal world-এ, সমাধান noumenal world-এ। অন্যভাবে বললে, পার্থিব জগতে-দেশ-কালের জগতে পরম সত্তা ও সত্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable)-এদের সম্বন্ধে ভাষায় বলা যায় না; অনুচ্চারিতই থেকে যায় (inexpressible)। এই যে ঐশী উৎস এটা কেবল ভিটগেনস্টাইনের অনুমান ছিল না। দর্শনের প্রাসঙ্গিক শাখা ও গণিতের দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তিনি এ স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে: "There are, indeed, things that cannot be put into words. They make themselves manifest. They are what is mystical.[২৫] ভিটগেনস্টাইনের মতে, যুক্তিবিদ্যা, নৈতিকতা, ধর্ম, নন্দনতত্ত্ব –– উচ্চারিত ভাষার বাইরের, এরা অনুচ্চারিত ভাষার জগতের। আগেই উল্লেখ করেছি, ভালমন্দের মূল মানদণ্ড যে পার্থিব জগতের বাইরে থেকে তথা অতিপ্রাকৃতিক বা ঐশী জগৎ তথা স্রষ্টা থেকে আসতে হবে তা আমাদের ইহুদি-খ্রিষ্টীয় ঐশী দিশার (ওয়াহি-revelation) কথা মনে করিয়ে দেয়। ভিটগেনস্টাইন স্পষ্ট করে

[২৩] Exodus, 20:2-17, especially 2-6; Deuteronomy, 5:6-21, especially 6-10.
[২৪] 24 TLP, 6.4312 (Pears)
[২৫] Ibid., 6.522 (Pears)

বলেন: "The sense of the world must lie outside the world. In the world everything is as it is, and everything happens as it does happen: in it no value exists–– and if it did exist, it would have no value."[২৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, অর্থহীন বচনের (non-sensical proposition) যে অভিধা নৈতিক বচন লাভ করেছিল তা আর শেষ পর্যন্ত থাকেনি। নৈতিকতা এ পর্যায়ে এসে এক নতুন অর্থ, ব্যঞ্জনা ও গতিপথ বা দিক-নির্দেশ (direction) খুঁজে পায়, অর্থাৎ যা একসময় ছিল অনুচ্চারিত (inexpressible, unsayable or ineffable) তা হয়ে ওঠে উচ্চারণক্ষম (expressible, sayable), ভাষার মাধ্যমে নয়, যাপিত জীবন-ধরনের (form of life) মধ্য দিয়ে। অন্যভাবে বলা যায়, কান্টের দর্শনে যেমন বিশুদ্ধ যুক্তিতে আত্মা, পরজীবন ও ঈশ্বরের সন্ধান মেলে না, মেলে যুক্তি-উত্তর (যুক্তি-বিরোধী নয়) জীবন যাপনের মাধ্যমে, অনেকটা তেমনি ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে নৈতিকতা-র অর্থ ও তাৎপর্য-আসে এ জগতের বাইরে থেকে।

নিরেট বস্তুবাদে জগৎ অনাদি, জগতের কোন স্রষ্টা নেই। সৃষ্টবাদে জগৎ সময়ে সৃষ্ট। জগৎ স্রষ্টার (যিনি অতিবর্তী) ইচ্ছার ফল। এজন্যই তো গাযালি বলেছিলেন, আমি যে ইচ্ছা করতে পারি এটা নির্দেশ করে যে, আমি অস্তিত্বশীল এবং আমার অস্তিত্ব পরম ইচ্ছাময়ের একক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। ভিটগেনস্টাইনও আমাদের এ অসীম ইচ্ছার মুখোমুখি করান এবং সব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়ে মহান ঈশ্বর প্রকৃত ও পরম ইচ্ছা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সেখানেই নৈতিকতার উৎস খুঁজে পান।

ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে উৎসগত দিক থেকে নৈতিকতা অনেকটা ঐশী ধর্মের (প্রাকৃতিক ধর্ম[২৭] নয়) মতো; এর উৎস প্রাকৃতিক জগতের বাইরে এবং তা মানুষের ইচ্ছা নির্ভর নয়: "The world is independent of my will"[২৮]। আগেই উল্লেখ করেছি, ভিটগেনস্টাইনের মতে যুক্তিবিজ্ঞানের আসল উৎসও এ জগতের বাইরে, কিন্তু 'যুক্তি সর্বব্যাপ্ত: "Logic pervades the world: the limits of the world are also its limits."[২৯] ভিটগেনস্টাইনের মতে মানুষের মধ্যে

[২৬] Tbid., 6.41, (Pears)
[২৭] প্রাকৃতিক ধর্ম, যেমন, সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা প্যাগান ধর্ম।
[২৮] TLP, 6.373 (Pears); also, NB, p.150
[২৯] [bid, 5.61 (Pears)

এক অতিবর্তী সত্তার আকাঙ্খা রয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, ভিটগেনস্টাইন নৈতিকতা ও যুক্তির অতি-প্রাকৃতিক উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন যদিও ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা যায় না: "There are, indeed, things that cannot be put into words."[৩০]

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, পরবর্তী সময়ে ভিটগেনস্টাইন ছবি বা চিত্রতত্ত্বের বাইরে এসে ভাষার ব্যবহারের উপর জোর দেন এবং ছবিতত্ত্বকে সংশোধন করেন। ভাষার এ ব্যবহার সমাজের সাথে যুক্ত। ভিটগেনস্টাইন যেটা দেখাতে চাইছেন তাহলো একথা সত্যি যে, কাজটা ঘটে সমাজে, বাহ্যিক জগতে, পার্থিব জীবনে; কিন্তু কোনটা ভাল বা মন্দ, গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তার মূল মানদণ্ড আসতে হবে জগতের বাইরে থেকে –– মূল্যায়নটা হবে কোন অতি জাগতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে, কারণ মানদণ্ডটি এ জগতে নেই। তাঁর কথায়: "If there is any value that does have value, it must lie outside the whole sphere of what happens and is the case."[৩১]

অনেকে মনে করেন ভিটগেনস্টাইন নাস্তিক, অন্তত, অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। আমি যতোটা ভিটগেনস্টাইন অধ্যয়ন করে বুঝেছি, এটা ঠিক না। যেটা ঠিক সেটা হলো তিনি ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করতেন না, কারণ তিনি মনে করতেন এটা প্রকাশের বিষয় নয়, বিশুদ্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব তার বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যে ভিটগেনস্টাইন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে সেভাবেই নিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজের সৃষ্টিগত ক্ষমতাহীনতা ও অসহায়ত্ব ঐকান্তিকভাবে অনুভব করতেন এবং ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভর Pascual: "Go. on, believe! It does no harm. 'Believing' means submittir.g to an authority."[৩২৩২] পুন, "To believe in a God means to understand the question about the meaning of life. To believe in a God means to see that the facts of the world are not the end of the matter. To believe in God means to see that life has a meaning. "[৩৩] আবার, "Therefore that good and evil are somehow connected with the meaning of the world. The meaning of life, i.e., the

[৩০] Ibid, 6.522 (Pears)
[৩১] Ibid, 6.41 (Pears)
[৩২] CV, p.42
[৩৩] NB, p.152

meaning of the world we call God. ... To pray is to think about the meaning of life. I cannot bend the happenings of the world to my will: I am completely powerless."[৩৪]

দর্শন ও বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, বিশ্ব আবশ্যিক (necessary) নয়, আপতিক (contingent)। একমাত্র এবং একক সত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বই আবশ্যিক। ভিটগেনস্টাইন বলেন: "For all that happens and is the case is accidental. What makes it non-accidental cannot lie within the world, since if it did it would itself be accidental. It must lie outside the world."[৩৫] এ প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এক রাতে ভিটগেনস্টাইন রাসেলের সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে খুবই অস্থির চিত্তে ঘুরাঘুরি করতে দেখে রাসেল জিজ্ঞেস করেন: "Wittgenstein, do you think about logic or about your sins? About both was his answer."[৩৬]

ভিটগেনস্টাইন যে কেবল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করতেন তাই নয়, তাঁর জীবন ছিল দরবেশদের মতো। তিনি ছিলেন একজন গৃহী সন্ন্যাসী। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভিটগেনস্টাইন যে পরিবারে জন্মেছিলেন সেটি ছিল সে সময়ে রথচাইল্ড পরিবারের পর পুরো ইয়োরোপের দ্বিতীয় ধনী পরিবার, কিন্তু ঐশ্বর্য কখনও তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি চিরকুমার ছিলেন। সাংসারিক জীবনও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তিনি নাম যশের প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। নইলে কেম্ব্রিজের দর্শনের আকর্ষণীয় চেয়ার পরিত্যাগ করে কাউকে না জানিয়ে তিনি দক্ষিণ অস্ট্রিয়ার অজপাড়াগাঁয়ের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কীভাবে শিক্ষকতা করতে পারেন! সামাজিক অবস্থানের প্রতিও তাঁর কোন মোহ ছিল না, নইলে এটা কীভাবে সম্ভব যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিচয় গোপন করে লন্ডনের গাই'জ হাসপাতালে দারোয়ানের কাজ করেন। তাঁর বাসা ও অফিসে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভিয়েনায় তিনি তাঁর বোনের জন্য যে বাড়িটির নক্সা প্রণয়ন ও সেটি যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন তাও ছিল বাহুল্য বর্জিত–– সরলতাই ছিল তাঁর কাছে জীবনের সৌন্দর্য। বস্তুত তাঁর জীবন ছিল এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন।

---

[৩৪] Ibid., p.150

[৩৫] TLP, 6.41 (Pears)

[৩৬] McGuiness, Brian (1989a): ÒDer Grundgedanke des Tractatus (The Main Idea of the Tractatus)", in: Joachim Schulte (ed.): Texte zum Tractatus (Texts to the Tractatus), Frankfurt/Main 1989, p.48

জাগতিক বস্তু অর্জন, দৈহিক ভোগ সুখ ও সুনাম সুখ্যাতির উপরে উঠতে পারলেই মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়-- এ ছিল ভিটগেনস্টাইনের ঐকান্তিক বিশ্বাস। এটাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি এভাবে উচ্চারণ করেছেন: "I can only make myself independent of the world-and so in a sense master it-by renouncing any influence on happenings."[৩৭] ভিটগেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন নিজের ইচ্ছেমতো চলা অথবা অন্য কোন মানুষের ইচ্ছামতো চলা হচ্ছে প্রকৃত ও চূড়ান্ত অর্থে পরাধীনতা। সব জাগতিক বন্ধন ও আকর্ষণ মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার যে জীবন, সেটিই নৈতিক জীবন সম্ভব ও সহজ করে তোলে।

আমরা উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পেলাম যে, ভিটগেনস্টাইন কোন নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন না করলেও বা এ সম্বন্ধে কোন বিবৃতি না দিলেও নৈতিকতা ছিল তাঁর জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমার মনে হয়, অনেকটা মহামতি বুদ্ধের মতো তিনিও দার্শনিকদের বিভিন্ন তত্ত্বের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে বিরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাডেমিক পরিমণ্ডলে দেখেছিলেন যে, অনেক বড় বড় নৈতিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হচ্ছে, অথচ নৈতিক জীবন যাপন করা হচ্ছে না-- এটি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি চাচ্ছিলেন জীবনে নৈতিকতার চর্চা হোক-- মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করুক। জীবনোপলব্ধির এ বোধ থেকেই তিনি কোন ঘোষণা না দিয়ে, কাউকে না জানিয়ে নীরবে নিভৃতে ঐকান্তিকভাবে নৈতিক জীবন যাপন করে গেছেন। তিনি পার্থিব ভোগ সুখ সুনাম সুখ্যাতির উর্ধ্বে উঠে একজন সাধকের জীবন যাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এ ধরনের জীবনের মধ্যেই ধৃত হয় নৈতিকতা, আর নৈতিক জীবন যাপনই মানুষকে যেমন করে স্বাধীন, তেমনি করে সুখী। এজন্যই তো তিনি বলতে পেরেছেন: "The world of the happy man is a different one from that of the unhappy man."[৩৮] আর এটাই ব্যাখ্যা করে কেন মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, তাদের বলো যে আমি একটি অসাধারণ জীবন কাটিয়েছি।

বস্তুত, আমাদের ইচ্ছার বাইরে, এমনকি, অনেক সময় বিপরীতে, অনেক কিছুই আছে, অনেক রহস্যই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দর্শনের সেই পরিচিত প্রশ্ন: কেন কিছু না থেকে, কিছু হলো (Why should there be something, rather than

[৩৭] NB, p.150
[৩৮] 38 TLP, 6.43 (Pears)

nothing)? অথবা অনস্তিত্ব থেকে কেন অস্তিত্বের উদ্ভব হলো? এসব প্রশ্নের অনেক উত্তর দেওয়া যায়, দেওয়া হয়েছে–– কিন্তু এর কি কোন চূড়ান্ত মীমাংসা আছে–– আছে কি কোন এক বা একক উত্তর?

এমতাবস্থায় শান্তি ও স্বস্তির জীবন হচ্ছে মানুষের সসীম ইচ্ছাকে অসীম ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা, যেটা আমরা উপরে গাজালির বরাতে উল্লেখ করেছি। এমন কথাই ভিটগেনস্টাইনের লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে: "I am ... in agreement with that alien will, on which I appear dependent. ... That is to say: 'I am doing the will of God'. ... Certainly it is correct to say: Conscience is the voice of God.[৩৯]

ভিটগেনস্টাইনের যুগান্তকারী গ্রন্থ ট্র্যাকটাটুস লেখার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, আছেও। কিন্তু এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক; ভিটগেনস্টাইনের বন্ধু ও অন্যতম জীবনীকার Paul Engelmann এর মতে: "The book's point is an ethical one."[৪০]

এভাবে প্রবন্ধটি শেষ করি: যদিও ভিটগেনস্টাইন নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁর মত কোন একস্থানে উপস্থাপন করেননি, তথাপি আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করলাম যে, নৈতিকতা সম্বন্ধে তাঁর একটি অবস্থান তুলে ধরা সম্ভব; আর সে কাজটিই আমি এ প্রবন্ধে করার চেষ্টা করেছি।

ভিটগেনস্টাইনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকা

1. *Tractatus Logico-Philosophicus*, Tr. C K Ogden, London: Kegan Paul, 1922; Revised, 2021

2. *Some Remarks on Logical Form*, Aristotelian Society Supplementary Volume, Vol.9, Issue, 1, 15 July, 1929, Pp.162-171

3. *Philosophical Investigations*, Tr. GE M Anscombe, Oxford:

[৩৯] NB, p.154

[৪০] Letters from Wittgenstein with a Memoir, Tr. by L. Furtmüller, Oxford: Basil Blackwell, 1967, p.143

Basil & Blackwell, First published, 1953, Second edition 1958, Third edition, 1967

4. *Remarks on the Foundations of Mathematics*, Tr. G EM Anscombe, Oxford: Blackwell, 1956, Revised edition, 1978

5. *The Blue and Brown Books* (Paperback), Tr. GEM Anscombe, NY: Harper & Row, 1958, 1965, London: Blackwell, 2002

6. *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trs. D F Pears and B F McGuiness, 1. London, Routledge and Kegan Paul, First published 1961; Revised edition, 1974

7. *Notebooks (1914-1916)*, Tr. GE M Apscombe, NY: Harper and Brothers, 1961

8. *Lectures and Conversations on Aesthetics*, Psychology and Religious Belief, notes taken by Yorick Smythies, Rush Rhees, and James Taylor; Ed. by Cyril Barrett, Basil Blackwell, 1967

9. *On Certainty*, Trs. Denis Paul and GEB Anscombe; Edited by Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1969, 1975

10. *Pro-Tractatus*, Ed. Georg Henrik von Wright, Ithaca: Cornell University Press, 1971

11. *Letters to CK Ogden with comments on the English translation* of TLP, Ed. Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1973

12. *Letters to Russell*, Keynes and Moore, Ed. Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1974

13. *Philosophical Remarks*, Trs. Raymond Hargreaves and Roger White, Hoboken (New Jersey), Wiley-Blackwell, NY: Burns and Noble, 1975

14. *Remarks on Colour*, Trs. Linda L McAlister and Margarete Schättle, Ed. G. E. M. Anscombe, Oxford: Blackwell, 1977, 1991

15. *Philosophical Grammar*, Tr. Anthony Kenny, Berkeley: University of California Press, 1978

16. *Remarks on the Philosophy of Psychology*, Tr. GEM Anscombe, Vols. 1 & 2, Blackwell, 1980

17. *Philosophical Occasions 1912-1951* (Contains Remarks on Frazer's Golden Bough), Eds. James C Clagge and Alfred Nordmann, Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1993, 2010

18. *Culture and Value*, Tr. Peter Winch, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1980, Revised second edition, 1998

19. *Last Writings on the Philosophy of Psychology*, Vols. 1&2, Ed. Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1982, 1992

20. *Lecture on Ethics, Eds. Edoardo Zamuner*, Ermelinda Valentina Di Lascio and D K Levy, Oxford: Wiley-Blackwell, 2014 (The lecture was first delivered in November, 1929 to Heretics Society, Cambridge University)

ভিটগেনস্টাইনের যে সমস্ত ব্যাখ্যাতার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি

1. Norman Malcolm, *Ludwig Wittgenstein: A Memoir*, London: Oxford University Press, 1958

2. Rush Rhees, *Without Answers*, London: Routledge, 1969

3. Rush Rhees, *Discussions of Wittgenstein*, London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1972

4. Anthony Kenny, *Wittgenstein, Penguin Books*, Harmondsworth, 1975

5. Kerr Fergus, *Theology after Wittgenstein*, Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1989

6. Paul Johnston, *Wittgenstein and Moral Philosophy*, Routledge, First edition 1989

7. A Portrait of Wittgenstein as a Young Man: From the Diary of David Hume Pinsent, 1912-1914, Edited by Georg Henrik von Wright, Blackwell, 1990

8. Lars Hertzberg, *'Was Wittgenstein a Moral Philosopher'*, Studia Theologia, 1997, Pp. 144-155

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রসঙ্গে

প্রমথ মিস্ত্রী *

সারসংক্ষেপ

ভাষা মাত্রই ব্যাকরণ নির্ভর। সংস্কৃত ও বাংলা এর ব্যতিক্রম নয়। সংস্কৃত ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতম। উভয় ভাষার মধ্যে রয়েছে নাড়ির সম্বন্ধ। তাই ভাষা দুটো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ভাষার উদ্ভব স্তর – সংস্কৃত>প্রাকৃত>তদ্ভব বা বাংলা। যেমন – অদ্য>অজ্জ>আজ, কার্য>কজ্জ>কাজ ইত্যাদি। সে যাই হোক সংস্কৃত ভাষার বড় গুণ দানধর্ম। আর বাংলা ভাষার বড় গুণ গ্রহণধর্ম। বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অন্যকে (সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি) নিয়ে পথ চলা। যা অন্য ভাষায় বিরল। বাংলা ভাষার শব্দ গঠনে এখনও আমাদের সংস্কৃতের ওপর নির্ভর করতে হয়। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত উভয় ভাষার (সংস্কৃত ও বাংলা) রূপতত্ত্বের প্রত্যয় প্রক্রিয়া। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়যোগে গঠিত অনেক শব্দ (বিভক্তি পরিহার করে বা না করে) বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়েছে। কীভাবে উক্ত প্রত্যয় ও প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়ে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করেছে সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত একটি অতি প্রাচীন ভাষা (পাশ্চাত্য জার্মান Maxmuller ও Jacobi মনীষীদ্বয়ের মতে এ ভাষার উদ্ভবকাল যথাক্রমে

* ড. প্রমথ মিস্ত্রী, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ শতক ও ৪৫০০ শতক; আর প্রাচ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাবিদদ্বয়ের মতে এ ভাষার উদ্ভবকাল যথাক্রমে খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০–৮০০ শতক ও ১২০০ শতক)। অপরদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা এসেছে (উভয়ের মতে এ ভাষার উদ্ভবকাল যথাক্রমে খ্রিষ্টীয় ৭০০ শতক ও ১১০০ শতক)। এ ভাষা সরাসরি প্রাকৃত থেকে জন্ম নিলেও সংস্কৃত ভাষা দ্বারা অনেক উন্নত হয়েছে। সব ভাষার মতো এ দুটো ভাষায়ও রয়েছে ব্যাকরণের চারটি মৌলিক বিষয়। যথা– ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি রূপতত্ত্বের মধ্যে নিহিত। কারণ উভয় ভাষার শব্দ গঠনের (উপসর্গ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি) একটি অন্যতম প্রক্রিয়া প্রত্যয়। আধুনিক বাংলায় এটি অন্ত্যপ্রত্যয় নামে অভিহিত (রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য, ২০১৮: ১৬৬)। উভয় ভাষায় প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয় তবে বাংলা ভাষায় শব্দ তৈরির যতগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে তার প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতের অবদান বিদ্যমান। প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও সেটা পরিলক্ষিত। পাণিনির *'অষ্টাধ্যায়ী'*-র তৃতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় (অর্থাৎ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম) পর্যন্ত সমস্ত প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে। উভয় ভাষায় প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ১. কৃৎ প্রত্যয় ও ২. তদ্ধিত প্রত্যয়। (উভয় ক্ষেত্রে বিভাগ ও উপবিভাগে ব্যতিক্রমও আছে) 'অষ্টাধ্যায়ী'-র তৃতীয় অধ্যায়ের 'কৃদতিঙ্' ৩/১/৯৩ থেকে 'ক্তো ২ ধিকরণে চ ধ্রৌব্য-গতি-প্রত্যবসানার্থেভ্যঃ' ৩/৪/৭৬ সূত্র পর্যন্ত কৃৎ-প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে (পাণিনি, ২০১২: ১২৮-২১৫)। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের কৃৎ-প্রত্যয়ের উপবিভাগে (কৃৎ>বাংলা কৃৎ, সংস্কৃত কৃৎ) যে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে তার অনেকটাই সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ থেকে আগত (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২: ৯৩-৯৫)। এর ফলে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের আকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে (অনট্>অন প্রভৃতি) তদ্রূপ উক্ত প্রত্যয় দ্বারা সাধিত শব্দেরও কিছু রূপান্তর (ব্যতিক্রমও আছে) [নী + অনট্ = √নী + অন>নে + অন = ন্ + অয় +অন = নয়ন, নয়ন + সুপ্ = নয়নম্>নয়ন (বাংলা রূপ), ধৃ + তব্য = √ধ্ + অর্ + তব্য = ধর্তব্য, ধর্তব্য + সুপ্ = ধর্তব্যঃ>ধর্তব্য (বাংলা রূপ) প্রভৃতি] ঘটে। এসব শব্দ মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণেই নির্মিত হয়েছে। বাংলায় এগুলি সংস্কৃত বিভক্তি পরিহার করে ব্যবহৃত। তবে ব্যতিক্রমও আছে অর্থাৎ গোটা শব্দরূপেই গৃহীত। ব্যুৎপত্তি জানার জন্য আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণেরই দ্বারস্থ হতে হয় (রফিকুল ইসলাম

ও অন্যান্য, ২০১৮: ১৭৬)। আলোচ্য প্রবন্ধে সেটা আমরা বিস্তারিত অনুসন্ধানে তৎপর হব। বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষ আধিক্য থাকায় তা বর্তমানে বাংলা ব্যাকরণেরই অংশ বলে বিবেচিত হয়। তাই এগুলির সাধন প্রক্রিয়া ভালো করে না বুঝলে নির্ভুলরূপে ভাষায় প্রয়োগ করা অসম্ভব। এ প্রয়াস থেকেই আমার এ কাজে অবতীর্ণ হওয়া। আজ প্রমিত বাংলার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতের অবদান। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

> ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে বাংলা ভাষায় কোন শব্দের প্রভাব কতটুকু তার একটি শতকরা হিসাব দিয়েছেন। হারটি এরূপ – তৎসম ৪৪%, তদ্ভব ও দেশি ৫১.৪৫%, বিদেশি ৪.৫৫% (ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, ২০১৭: ১৯)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' গ্রন্থে বলেন– রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র বা জসীম উদ্‌দীন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকদের ভাষাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে শাব্দিক অনুপাত পাই তাকে মোটামুটি এইভাবে দেখানো যায় – তৎসম শব্দ ২৫%, অর্ধ-তৎসম ৫%, তদ্ভব (সংস্কৃত থেকে উদ্ভব) ৬০%, বিদেশী ৮%, দেশি ২% (ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ২০০৩: উপক্রমণিকা)।

উক্ত হিসাব থেকে আমরা বলতে পারি বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সংস্কৃতের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ পরিতাপের বিষয় আমাদের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষার্থীতো বটেই, অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিও উভয় ভাষার বানানের প্রতি উদাসীন। একারণে আমাদের মাতৃভাষার প্রতিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন – ভুল বানান লেখা, ভুল উচ্চারণ করা, অর্থ বিকৃত করা প্রভৃতি বিষয় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন– বাণ (শর, তীর)>বান (বন্যা, জলপ্লাবন), আষাঢ় (বর্ষণের মাস)>আসার (প্রবল বর্ষণ) প্রভৃতি। এসব দেখেই এ প্রবন্ধ লিখতে উদ্বুদ্ধ হই। প্রবন্ধে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় থেকে আগত প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি তথা বানানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ কীভাবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে প্রয়োগ হয়ে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ

ঋদোরপ্ [পাণিনি (পা.) ৩/৩/৫৭], এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬)। সংস্কৃতে প্রতি পূবর্ক

ই-ধাতুর উত্তর অল্ (অপ্, অচ্) প্রত্যয়যোগে 'প্রত্যয়ঃ' (প্রতি-√ই + অল্ = প্রত্যয়, প্রত্যয় + সুপ্ = প্রত্যয়ঃ>প্রত্যয়) শব্দটি গঠিত হয়েছে (পাণিনি, ২০১২: ১৮১)। ই-ধাতুর অর্থ যাওয়া, কিন্তু 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হলো ব্যাকরণের ভাষায় প্রকৃতি (ধাতু ও প্রাতিপদিক) অর্থাৎ, শব্দ ও ধাতুর পরে যুক্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রত্যয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'প্রত্যেতি পশ্চাদ্ আগচ্ছতি ইতি প্রত্যয়ঃ।' অর্থাৎ, যা পরে যুক্ত হয় তাই প্রত্যয় (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১: ১২২)। আর ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'প্রকৃতেঃ পরঃ প্রত্যয়ো বেদিতব্যঃ'। প্রত্যয়ঃ (পা.৩/১/১), পরশ্চ (পা.৩/১/২)। অর্থাৎ, যা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যয় (Suffix) বলে (পাণিনি, ২০১২: ১১২)। যেমন –

বিভক্তি: √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয়)

কৃৎ-প্রত্যয়: √গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)
>গন্তব্য (বাংলা রূপ)

তদ্ধিত-প্রত্যয় : দশরথ+ইঞ্ = দাশরথি, দাশরথি + সুপ্ = দাশরথিঃ (দশরথস্য অপত্যং পুমান্)>দাশরথি (বাংলা রূপ) [রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন]

স্ত্রী-প্রত্যয়: দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী (দেবতা)

ধাত্ববয়ব: √গম্ + ণিচ্ + লট্-তি = গময়তি (গমন করান)
গন্তুম্ ইচ্ছতি = √গম্+ সন্ + লট্-তি = জিগমিষতি (যেতে চায়)
পুনঃ পুনঃ গচ্ছতি = √গম্ + যঙ্ + লট্-তে = জঙ্গম্যতে (বার বার গমন করে)

এখানে বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত প্রভৃতি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দের জ্ঞান জন্মায়। তাই এগুলি প্রত্যয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ

সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয় প্রধানত দুই প্রকার। যথা –

১. কৃৎ
২. তদ্ধিত

তবে এর বাইরে আরো তিন প্রকার প্রত্যয় আছে। যথা –

১. বিভক্তি

২. স্ত্রী-প্রত্যয় ও
৩. ধাতুবয়ব

বিভাগটি গ্রাফে প্রদর্শিত হলো:

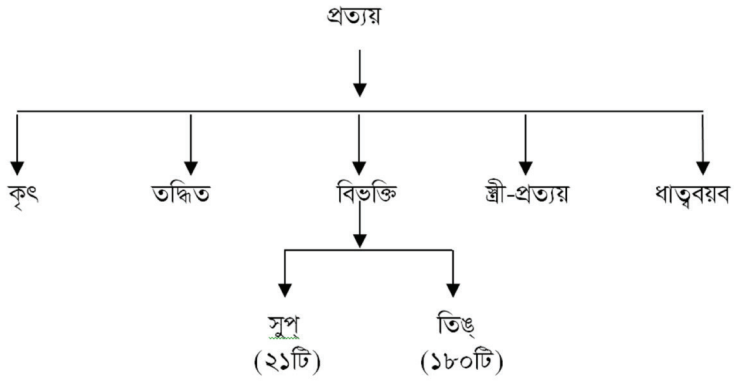

সারণি ১

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে শব্দবিভক্তির অপর নাম সুপ্‌বিভক্তি (সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি ২১টি) এবং ক্রিয়াবিভক্তির অপর নাম তিঙ্‌বিভক্তি (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি ১৮০টি)।

১. বিভক্তি (বি-√ভজ্ + ক্তি = বিভক্তি Suffixes): বিভক্তিশ্চ [পা. ১/৪/১০৪]।

সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ। যার দ্বারা সংখ্যা ও কারক বোঝায় তাকে বিভক্তি বলে। অন্যভাবে বলা যায় – ধাতুর উত্তর তিঙ্ (তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি) ও প্রাতিপদিকের উত্তর সুপ্ (সু, ঔ, জস্ প্রভৃতি) যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিভক্তি বলে (পাণিনি, ২০১২: ৬১)। যেমন –

তিঙ্ : √ভূ + লট্-তি = ভবতি (হয় বা হচ্ছে)

সুপ্ : নর + সু (ঃ) = নরঃ (একজন মানুষ, মানুষটি)>নর (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ' ধাতুর উত্তর তি এবং 'নর' প্রাতিপদিকের উত্তর সু (ঃ) যুক্ত হয়েছে। এগুলি বিভক্তি।

২. কৃৎ-প্রত্যয় [√কৃ (তুক্ = ৎ) + ক্বিপ্ = কৃৎ Primary Suffixes]:

ক) ধাতোঃ (পা. ৩/১/৯১)।

খ) কৃদতিঙ্ (পা. ৩/১ /৯৩)।

ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ প্রত্যয় বলে (পাণিনি, ২০১২: ১২৮)। যেমন –

গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য + সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'গম্' ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন তব্য প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এটি কৃৎ-প্রত্যয়।

৩. তদ্ধিত-প্রত্যয় (তৎ + হিত = তদ্ধিত Secondary Suffixes): তদ্ধিতাঃ (পা. ৪/১/৭৬)।

পাণিনীয় 'তস্মৈ হিতম্' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যেসব প্রত্যয় হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে (পাণিনি, ২০১২: ২৩৫)। অন্যভাবে বলা যায় – তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ (পদেভ্যো) হিতাঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতপ্রত্যয়া উচ্যন্তে। অর্থাৎ, শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় শিষ্ট অনুসারে প্রযুক্ত হয় তাদেরকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে (ড. বিশ্বরূপ সাহা, ১৯৯৭: ৬৩৯)। রূপান্তর, তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভ্যঃ হিতাঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতাঃ। অর্থাৎ, শব্দের উত্তর যে সকল প্রসিদ্ধ প্রত্যয় প্রয়োগ হয় তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলে (ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, ২০০৩: ৫২৬)। যেমন –

সর্বজন + খ (ঈন) = সর্বজনীন, সর্বজনীন + সুপ্ = সর্বজনীনঃ [সর্বজনেভ্যো হিতঃ]>সর্বজনীন (বাংলা রূপ)

রাবণ + ইঞ্ = রাবণি, রাবণি + সুপ্ = রাবণিঃ (মেনাদ, বীরবল) [রাবণস্য অপত্যম্]>রাবণি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে সর্বজন, রাবণি প্রাতিপদিকের উত্তর যথাক্রমে খ (ঈন) এবং ইঞ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলি তদ্ধিত-প্রত্যয়।

৪. স্ত্রী-প্রত্যয় (Feminine Suffixes): স্ত্রিয়াম্ (পা. ৪/১/৩)।

স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের উত্তর টাপ্, ঈপ্, ঙীপ্, ঙীষ্ (আ, ঈ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের স্ত্রী-প্রত্যয় বলে (পাণিনি, ২০১২: ২২২)। যেমন –

অজ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ = অজা, অজা + সুপ্ = অজা (স্ত্রী ছাগল)>অজা (বাংলা রূপ)
দেব + স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্ = দেবী, দেবী + সুপ্ = দেবী (দেবতা)>দেবী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে অজ, দেব শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্, ঙীপ্ (আ, ঈ) প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলি স্ত্রী-প্রত্যয়।

৫. ধাত্ববয়ব (ধাতু + অবয়ব = ধাত্ববয়ব Parts of root): যেসব প্রত্যয় ধাতুর অবয়ব স্বরূপ সেসব প্রত্যয় হচ্ছে ধাত্ববয়ব। অন্যভাবে বলা যায় – ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাদের ধাত্ববয়ব বলে। যেমন –

ধাতু: √ পঠ্ + ণিচ্ + লট্-তি = পাঠয়তি (পড়ানো)
পঠিতুম্ ইচ্ছতি = √ পঠ্ + সন্ + লট্-তি = পিপঠিষতি (পড়তে চায়)
পুনঃ পুনঃ পঠতি = √ পঠ্ + যঙ্ + লট্-তে = পাপঠ্যতে (বার বার পাঠ করে

প্রাতিপদিক : আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + কাম্য + লট্-তি
= পুত্রকাম্যতি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)
আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি = পুত্র + ক্যচ্ + লট্-তি
= পুত্রীয়তি (নিজের জন্য পুত্র কামনা করে)

এখানে 'পঠ্' ধাতুর উত্তর ণিচ্, সন্, যঙ্ এবং 'পুত্র' প্রাতিপদিকের উত্তর কাম্য, ক্যচ্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। এগুলি ধাত্ববয়ব।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ আর বাংলায় প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ মূলত একই। তবে বিভাগ ও উপবিভাগে কিছু পার্থক্য থাকায় বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়ের বিভাগ ও উপবিভাগ

সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন প্রত্যয় দুই শ্রেণির (সুকুমার সেন, ২০১৫: ২৫৪)। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁদের 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে বলেছেন প্রত্যয় সাধারণত দুই প্রকার (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২: ৯১–১০৩)। যথা –

১. কৃৎ-প্রত্যয় [ক্রিয়াধাতুতে যুক্ত হয়]

কৃৎ-প্রত্যয় আবার দুপ্রকার (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২: তদেব)। যথা –

ক) বাংলা কৃৎ ও
খ) সংস্কৃত কৃৎ

২. তদ্ধিত-প্রত্যয় [শব্দে যুক্ত হয়]

তদ্ধিত-প্রত্যয় আবার তিন প্রকার (মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, ২০০২: তদেব)। যথা–

ক) বাংলা তদ্ধিত
খ) সংস্কৃত তদ্ধিত ও
গ) বিদেশি তদ্ধিত

বিভাগটি গ্রাফে প্রদর্শিত হলো:

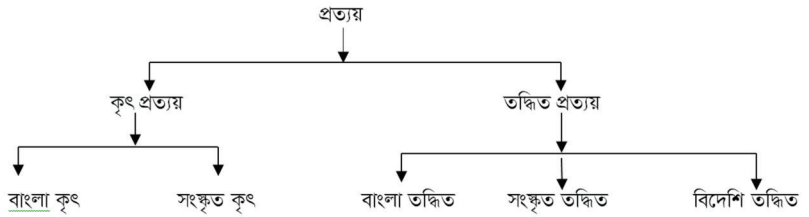

সারণি ২

উল্লিখিত উভয় বিভাগ ও উপবিভাগের "সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়" কীভাবে বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ হয়েছে তা অনুসন্ধানে আমরা তৎপর হব।

এক নজরে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ

সংস্কৃত ব্যাকরণের সুপ্ বিভক্তি জাত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপটিই (অদৃশ্যমান বিভক্তিরূপ) সাধারণত বাংলা ব্যাকরণের মূল শব্দ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রথমার রূপটি (দৃশ্যমান বিভক্তিরূপ) বিভক্তি পরিহার করে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন –

সুপ্ বিভক্তি:

সংস্কৃত গুণিন্ শব্দের প্রথমার একবচন: গুণিন্ + সুপ্ = 'গুণী', যা বাংলারও রূপ প্রভৃতি।

তাই সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এক নজরে প্রদর্শিত হলো:

কৃৎ-প্রত্যয়:

√নী + অনট্ = নী + অন>নে + অন = ন্ + অয় +অন = নয়ন, নয়ন + সুপ্ =
সংস্কৃত বাংলা
নয়নম্ > নয়ন (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে দৃশ্যমান বিভক্তিরূপ 'নয়নম্' বিভক্তি (সুপ্>অম্) পরিহার করে 'নয়ন' রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রকৃতির পরিবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় বুঝতে যা সহায়ক

সংস্কৃতে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর স্বকীয় স্বরধ্বনির বহু পরিবর্তন হয় (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৯: ১৪০)। এতে ধাতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে রূপেরও নানা প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয় [√হৃ (চুরি করা) + ঘঞ্ (অ) = হার (মালা, পরাজয়), আ-√হৃ + ঘঞ্ = আহার (খাওয়া); বি-√বহ্ (বহন করা) + ঘঞ্ = বিবাহ (পরিণয়, বিয়ে) প্রভৃতি]। প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বর্ণ (ইৎ বর্ণ) যুক্ত থাকার জন্যই এরূপ হয়ে থাকে (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৩৮০: ১৩৮)। তবে এরূপ ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, গুণ, সম্প্রসারণ পরিভাষার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তাই প্রত্যয়ান্ত শব্দে প্রকৃতির পরিবর্তনসহ অন্যান্য বিষয় বুঝতে যেসব বিষয় সহায়ক সেগুলি নিম্নরূপ:

প্রকৃতি (Base): মূল শব্দকে (ক্রিয়াবাচক, বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণ বাচক) প্রকৃতি বলে। যেমন –

ক্রিয়াবাচক	:	ভূ (হওয়া) গম্ (যাওয়া) দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।
বস্তুবাচক	:	সূর্য তরু জল ইত্যাদি।
বস্তুর বিশেষণ বাচক	:	সুন্দর মন্দ পুরাণ ইত্যাদি।

এখানে ভূ, সূর্য, সুন্দর প্রভৃতি মূল শব্দ। তাই এগুলি প্রকৃতি।

প্রকৃতি দুপ্রকার। যথা –

১. ধাতু (Verbal Root): ভূবাদয়ো ধাতবঃ (পা. ১/৩/১), ভট্টোজিদীক্ষিত (দী.): ক্রিয়াবাচিনো ভ্বাদয়ো ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।

ভূপ্রভৃতয়ো বাসদৃশ্য যে তে ধাতুসংজ্ঞকাঃ ভবন্তি। অর্থাৎ, ভূ (হওয়া) প্রভৃতি বা (প্রবাহিত হওয়া) সদৃশ যে শব্দস্বরূপ তাদের ধাতু বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় – ক্রিয়াবাচক ভূ (হওয়া) প্রভৃতি প্রকৃতির ধাতু সংজ্ঞা হয় (পাণিনি, ২০১২: ২৮)। যেমন –

ভূ (হওয়া)
গম্ (যাওয়া)
দৃশ্ (দেখা) ইত্যাদি।

এখানে 'ভূ', 'গম্' প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক। তাই এগুলি ধাতু।

২. প্রাতিপদিক (প্রতিপদ + ঠক্ = প্রাতিপদিক Nominal base):

ক) অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ (পা. ১/২/৪৫)।
খ) কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ (পা. ১/২/৪৬)।

প্রতিপদং গৃহ্যতি যৎ তৎ প্রাতিপদিকম্। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি পদ সিদ্ধির জন্য বিভক্তি প্রয়োগের পূর্বের মূল শব্দটি প্রাতিপদিক। অন্যভাবে বলা যায় – ধাতু, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট বিভক্তিহীন শব্দ (বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক) প্রাতিপদিক। আবার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত এবং সমাসবদ্ধ শব্দও প্রাতিপদিক (পাণিনি, ২০১২: ২২)। যেমন –

বস্তুবাচক : সূর্য
তরু
জল ইত্যাদি

বস্তুর বিশেষণ বাচক : সুন্দর
মন্দ
পুরাণ ইত্যাদি।

কৃদন্ত : কারক ($\sqrt{কৃ}$ + ণ্বুল্)
তদ্ধিতান্ত : আর্জুনি (অর্জুন + ইঞ্)
সমাসবদ্ধ : রাজপুরুষ (রাজ্ঞঃ পুরুষঃ>রাজন্ + পুরুষ>রাজপুরুষ ইত্যাদি।

এখানে 'সূর্য', 'সুন্দর' প্রভৃতি বিভক্তিহীন শব্দ এবং কারক, আর্জুনি, রাজপুরুষ যথাক্রমে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত এবং সমাসবদ্ধ শব্দ । তাই এগুলি প্রাতিপদিক।

প্রকৃতির স্বরগত পরিবর্তন : প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির স্বরগত কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির নাম বৃদ্ধি, গুণ ও সম্প্রসারণ। এই তিনটিকে একত্রে 'অপশ্রুতি' (ধ্বনির ক্রমানুসারে পরিবর্তন) বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

১. বৃদ্ধিঃ বৃদ্ধিরাদৈচ্ (পা. ১/১/১)।, দী.: আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞঃ স্যাৎ। [বৃদ্ধিঃ + আৎ + ঐচ্, ঐচ্ = ঐ, ঔ]

আ-কার, ঐ-কার এবং ঔ-কার বৃদ্ধি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায় – বৃদ্ধি হচ্ছে স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম (পাণিনি, ২০১২: ১)। যেখানে –

অ>আ
ই ঈ এ>ঐ
উ ঊ ও>ঔ
ঋ ৠ>আর্
ঌ>আল্ হয়। যেমন –

শরীর + ঠক = শারীরিক (ত্রি./বি-ণ)>শারীরিক (বাংলা রূপ)
বিধি + অণ্ = বৈধ (ত্রি./বি-ণ)>বৈধ (বাংলা রূপ)
নীতি + ঠক = নৈতিক (ত্রি./বি-ণ)>নৈতিক (বাংলা রূপ)
জন + একঃ (সুপ্) = জনৈকঃ>জনৈক (বাংলা রূপ)
উদার + যঞ্ = ঔদার্য, ঔদার্য + সুপ্ = ঔদার্যম্>ঔদার্য (বাংলা রূপ)
প্রো + ঊঢ়ঃ (সুপ্) = প্রৌঢ়ঃ>প্রৌঢ় (বাংলা রূপ)
বন + ওষধিঃ (সুপ্) = বনৌষধিঃ>বনৌষধি (বাংলা রূপ)
শীত + ঋতঃ (সুপ্) = শীতার্তঃ (শীত + আর্ তঃ)>শীতার্ত (বাংলা রূপ)
বি-√স্তৃ + ঘঞ্ (সুপ্) = বিস্তারঃ>বিস্তার (বাংলা রূপ)
হোতৃ + ঌকারঃ (সুপ্) = হোতৃঌকারঃ পক্ষে হোত্ঌকারঃ (বাংলায় প্রযোজ্য নয়)
[হোতৃ = পুরোহিত, ঋগ্বেদজ্ঞ]

উল্লেখ্য, হোত্ঌকারঃ-এর ক্ষেত্রে 'ঋতি সবর্ণে ঋ বা (বার্ত্তিক), ঌতি সবর্ণে ঌ বা (বার্ত্তিক)'– এই বার্ত্তিক সূত্রদ্বয় দ্বারা একবার ঋ-কার (ৃ) এবং একবার ঌ-কার হতে পারে। যেমন – হোতৃ + কার = হোতৃকারঃ, হোত্ঌকারঃ।

[স্মরণীয়, স্ত্রীলিঙ্গ ঈ (<ঙীপ্, ঙীষ্) প্রত্যয়, য্ ও স্বরাদি তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকলে 'যস্যেতি চ' (পা. ৬/৪/১৪৮) (ই + অস্য + ইতি) সূত্রানুসারে প্রকৃতির অন্তস্থিত অবর্ণান্ত (অ, আ), ইবর্ণান্ত (ই, ঈ) শব্দের অন্তস্বরের লোপ হয়। যেমন –

স্ত্রীলিঙ্গ ঈ (<ঙীপ্, ঙীষ্) প্রত্যয়:
কুমার্ (>কুমার্) + ঙীষ্ (ঈ) = কুমারী, কুমারী + সুপ্ = কুমরী>কুমারী (বাংলা রূপ)
সখ্া (>সখ্) + ঙীপ্ (ঈ) = সখী, সখী + সুপ্ = সখী>সখী (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

য্ ও স্বরাদি তদ্ধিত প্রত্যয়:
উদার্ (>উদার্) + যঞ্ (য) = ঔদার্য, ঔদার্য + সুপ্ = ঔদার্যম্ >ঔদার্য (বাংলা রূপ)
পাণিনিনা প্রোক্তম্ = পাণিনি (>পাণিন্) + ছ (ঈয়) = পাণিনীয়, পাণিনীয় + সুপ্ =
পাণিনীয়ম্ >পাণিনীয় (বাংলা রূপ)
কুন্ত্যা অপত্যম্ = কুন্তী (>কুন্ত) + ঢক্ (এয়) = কৌন্তেয়, কৌন্তেয় + সুপ্ =
কৌন্তেয়ঃ >কৌন্তেয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।]

এখানে অ>আ, ই ঈ এ>ঐ প্রভৃতি হয়েছে। তাই এগুলি বৃদ্ধি। উল্লেখ্য, ৯>আল্-এর উদাহরণ দুর্লভ।

লক্ষণীয়, সন্ধি ও তদ্ধিতে মূলত বৃদ্ধির কার্য হয়। স্মর্তব্য, সাধরণত প্রত্যয়ের ঞ্ (ঘঞ্), ক্ (ঠক্), ণ্ (ণ্বুল্) প্রভৃতি ইৎ অর্থাৎ লোপ পেলে প্রকৃতির আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়।

২. গুণ: অদেঙ্ গুণঃ (পা. ১/১/২), দী.: অদেঙ্ চ গুণসংজ্ঞঃ স্যাৎ। [অৎ + এঙ্, এঙ্ = এ, ও]
অ-কার, এ-কার এবং ও-কার গুণ সংজ্ঞপ্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়– গুণও স্বরধ্বনি পরিবর্তনের একটি নিয়ম (পাণিনি, ২০১২: ১)। যেখানে –

ই ঈ>এ
উ ঊ>ও
ঋ ৠ>অর্
৯>অল্ হয়। যেমন–
দেব + ইন্দ্রঃ (সুপ্) = দেবেন্দ্রঃ>দেবেন্দ্র (বাংলা রূপ)
মহা + ঈশঃ (সুপ্) = মহেশঃ>মহেশ (বাংলা রূপ)
সূর্য + উদয়ঃ (সুপ্) = সূর্যোদয়ঃ>সূর্যোদয় (বাংলা রূপ)
গঙ্গা + ঊর্মিঃ (সুপ্) = গঙ্গোর্মিঃ>গঙ্গোর্মি (বাংলা রূপ)
দেব + ঋষিঃ (সুপ্) = দেবর্ষিঃ (দেব + অর্ ষিঃ)>দেবর্ষি (বাংলা রূপ)
বি-√স্তৃ + অপঃ (সুপ্) = বিস্তরঃ>বিস্তর (বাংলা রূপ)
তব + ৯কারঃ (সুপ্) = তবল্কারঃ [৯>ল্]> তবল্কার (বাংলা রূপ)
এখানে ই ঈ>এ, উ ঊ>ও প্রভৃতি হয়েছে। তাই এগুলি গুণ।

উল্লেখ্য, সন্ধি ও কৃতে মূলত গুণের কার্য হয়। স্মর্তব্য, সাধরণত প্রত্যয়ের চ্ (তৃচ্), ট্ (ল্যুট্>অনট্), ল্ (অল্) প্রভৃতি ইৎ অর্থাৎ লোপ পেলে গুণ হয়।

৩. সম্প্রসারণ (Expansion): ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্ (পা. ১/১/৪৫)। [ইক্ + যণঃ, ইক্ = ই, উ, ঋ, ঌ]

য্ ব্ র্ ল্ স্থানে ই উ ঋ ঌ হলে সম্প্রসারণ বলে। অন্যভাবে বলা যায় – সম্প্রসারণ হচ্ছে অন্তঃস্থবর্ণের (য্ ব্ র্ ল্) পরিবর্তন (পাণিনি, ২০১২: ৮)। যেখানে –

য্>ই
ব্>উ
র্>ঋ
ল্>ঌ হয়। যেমন –

√যজ্ + ক্ত = ইষ্ট
√বচ্ + ক্ত = উক্ত
√বচ্ + লিট্-অ (ণল্) = উবাচ
ত্রি + তীয় = তৃতীয় ইত্যাদি।

এখানে য>ই, ব>উ প্রভৃতি হয়েছে। তাই এগুলি সম্প্রসারণ। উল্লেখ্য, ল্>ঌ-এর উদাহরণ দুর্লভ।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় –

১. টি: অচো২ ন্ত্যাদি টি (পা. ১/১/৬৪)। [অচঃ + অন্ত্য + আদি, অচ্ = অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ]

শব্দের অন্ত্য স্বর অথবা অন্ত্য স্বর থেকে শুরু করে পরবর্তী হসন্ত ব্যঞ্জন বর্ণসমূহকে 'টি' বলে (পাণিনি, ২০১২: ১১)। যেমন –

শক = শ্ + অ + ক্ +অ
কুল = ক্ + উ + ল্ + অ
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + অ + স্
পতৎ = প্ + অ + ত্ + অ + ৎ ইত্যাদি।

এখানে শব্দগুলির রেখাঙ্কিত বর্ণ বা বর্ণসমূহ টি।

২. উপধা: অলো২ ন্ত্যাৎপূর্ব উপধা (পা. ১/১/৬৫)। [অলঃ + অন্তাৎ, অল্ = সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ]

শব্দের অন্ত্যবর্ণের ঠিক পূর্ব বর্ণকে (অল্) 'উপধা' বলে (পাণিনি, ২০১২: ১২)। যেমন –

শক = শ্ + অ + ক্ +অ
কুল = ক্ + উ + ল্ + অ
মনস্ = ম্ + অ + ন্ + অ + স্
পতৎ = প্ + অ + ত্ + অ + ৎ ইত্যাদি।

এখানে শব্দগুলির রেখাঙ্কিত বর্ণ উপধা।

৩. লঘু (ঝযড়ৎঃ): হ্রস্বং লঘু (পা. ১/৪/১০)।

হ্রস্বস্বরকে লঘু বলা হয় (পাণিনি, ২০১২: ৪৫)। যেমন –
অ ই উ ঋ ঌ
উল্লেখ্য, স্বরধ্বনির লঘু স্বর পাঁচটি।

লক্ষণীয় যে, হ্রস্বস্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণও লঘু হয়। যেমন –
ক (ক্ + অ), খি (খ্ + ই) ইত্যাদি।

৪. ইৎ [ই (তুক্ = ৎ) + ক্বিপ্ = ইৎ Indicatory letter]: 'উপদেশে২ জনুনাসিক ইৎ' (পা. ১/৩/২) – 'তস্য লোপঃ' (পা. ১/৩/৯)।

কস্মৈচিৎ কার্যায়োচ্চর্যমাণো বর্ণ ইৎসংজ্ঞো ভবতি। ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ কার্যের জন্য প্রাতিপদিক, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, আগম, আদেশ প্রভৃতির অঙ্গরূপে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ উচ্চারিত হয় তাকে ইৎ বলে। সংক্ষেপে বলা যায় – প্রত্যয়ের সঙ্গে বাড়তি কিছু বর্ণ থাকে। উক্ত প্রত্যয় ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় প্রত্যয়ের বাড়তি অংশ যা লোপ পায় তাকে ইৎ বলে (পাণিনি, ২০১২: ২৮–২৯)। যেমন –

√গম্ + ক্ত = গম্ + ত = গত, গত + সুপ্ = গতঃ > গত (বাংলা রূপ)
কুশল + অণ্ = কৌশল, কৌশল + সুপ্ = কৌশলম্ >কৌশল (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'ক্ত' ও 'অণ্' প্রত্যয়ের যথাক্রমে 'ক্' ও 'ণ্' লোপ পেয়েছে অর্থাৎ ইৎ হয়েছে। এই 'ক্' ও 'ণ্' বলে দিচ্ছে গম্ ও কুশল-এর যথাক্রমে ম্ লোপ হবে এবং আদ্যস্বর 'কু'-এর বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ 'কু' >কৌ হবে।

উল্লেখ্য, এই উদাহরণদ্বয় থেকে প্রমাণিত প্রত্যয় নিরর্থক নয়। অর্থাৎ প্রত্যয়েরও অর্থ আছে।

৫. অপৃক্ত (অমিশ্রিত): একস্বরবিশিষ্ট ইৎহীন প্রত্যয়কে অপৃক্ত বলে (পাণিনি, ২০১২: ২১–২২)। যেমন –

র = √নম্ + র = নম্র, নম্র + সুপ্ = নম্রঃ >নম্র (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে 'র' একস্বরবিশিষ্ট ইৎহীন প্রত্যয়। এটি অপৃক্ত।

৬. আদেশ: প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের (বা এর অংশবিশেষের) যে রূপ পরিবর্তন, তাকে আদেশ বলে। অন্যভাবে বলা যায় যা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের স্থান দখল করে তাকে আদেশ বলে (ড. বিশ্বরূপ সাহা, ১৯৯৭: ৩৫)। যেমন –

প্রকৃতি : বৃদ্ধ (জ্য) + ইষ্ঠ = জ্যেষ্ঠ
√স্থা (তিষ্ঠ) + লট্-তি = তিষ্ঠতি
√অস্ (ভূ) + লিট্-অ = বভূব ইত্যাদি।

প্রত্যয় : নর + টা (ইন) = নরেণ
নর + ঙসি (আৎ) = নরাৎ
নর + ঙস্ (স্য) = নরস্য ইত্যাদি।

এখানে জ্য, ইন প্রভৃতি প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের স্থান দখল করেছে। অতএব এগুলি আদেশ।

স্মর্তব্য, আদেশ শত্রুর মতো এসে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের স্থান দখল করে কার্য সম্পাদন করে। তাই বলা হয় –

'শত্রুবদাদেশঃ।' [শত্রুবৎ + আদেশঃ]

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয় (Primary Suffixes): কৃৎ-এর ব্যুৎপত্তি হলো √কৃ (তুক্ = ৎ আগম) + ক্বিপ্ (সবটাই ইৎ) = কৃৎ ['হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্' (পা. ৬/১/৭১) সূত্রানুসারে]। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'করে যে'(doer)। যা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রাতিপদিক বা ধাতুতে পরিণত করে তাই কৃৎ (ধাতুজ-শব্দগঠক অর্থাৎ, কৃৎ-

এর 'কৃ' ধাতুই বলছে 'আমি ধাতু থেকে শব্দ গড়ি') (জ্যোতিভূষণ চাকী, ২০০১: ১২২)। ধাতোঃ (পা.৩/১/৯১), কৃদতিঙ্ (পা.৩/১/৯৩) [কৃৎ + অতিঙ্ (ন তিঙ্)]। অর্থাৎ, ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন যেসব প্রত্যয় হয়, তাদেরকে কৃৎ-প্রত্যয় বলে (পাণিনি, ২০১২: ১২৮)। যেমন –

√গম্ + তব্য = গন্তব্য, গন্তব্য+ সুপ্ = গন্তব্যঃ (যাওয়া উচিত, যাবে)>গন্তব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এখানে গম্ ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় ভিন্ন তব্য প্রত্যয় হয়েছে। তাই এটি কৃৎ প্রত্যয়।

উল্লেখ্য, 'কর্তরি কৃৎ' (পা. ৩/৪/৬৭) সূত্রানুসারে সাধারণত কর্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয়। আর 'তয়োরেব কৃত্যক্তখলর্থাঃ (পা. ৩/১৪/৭০), তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬), কেলিমর উপসংখ্যানম্ (বা) সূত্র ও বার্ত্তিক অনুসারে কর্ম ও ভাববাচ্যে কৃত্য প্রত্যয় অর্থাৎ তব্য, অনীয় প্রভৃতি হয়। স্মর্তব্য, বসেস্তব্যৎ কর্তরি ণিচ্চ (বা) অনুসারে কর্তৃবাচ্যে তব্যৎ প্রত্যয় হয়।

কৃৎ প্রত্যয়ের বিভাগ

পাণিনীয় মতে, কৃৎ-প্রত্যয়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. কৃত্য-প্রত্যয়: তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ প্রভৃতি।
২. পূর্ব কৃৎ-প্রত্যয়: ক্ত, তৃচ্, ণ্বুল্, ণিনি, শতৃ, শানচ্ প্রভৃতি।
৩. উত্তর কৃৎ-প্রত্যয়: ক্তি, অল্, ঘঞ্ প্রভৃতি।

বাংলা ভাষায় প্রয়োগকৃত সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

পাণিনীয় মূল প্রত্যয় দ্বারা শব্দ গঠনের সময় সংস্কৃত কিংবা বাংলা উভয় ভাষাতে মূল প্রত্যয়ের কিছু অংশ ইৎ যায় (ব্যতিক্রমও আছে)। অর্থাৎ পুরোটা ব্যবহৃত না হয়ে যতটুকু কার্যকরী সেটুকু ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত কিংবা বাংলা উভয় ভাষাতে বিষয়টি ছকে প্রদর্শিত হলো:

ক্রমিক নং	পাণিনীয় মূল প্রত্যয়	সংস্কৃত/বাংলা ব্যবহৃত অংশ
১	অল্ (অপ্, অচ্)	অ
২	ঘঞ্	অ

৩	ণ্বুল্	অক
৪	অনট্	অন
৫	অনীয়র্/অনীয়	অনীয়
৬	ণিনিণিন্	ইন্
৭	ইষ্ণুচ্	ইষ্ণু
৮	উকঞ্/ঊকঞ্	উক/ঊক
৯	ক্ত	ত
১০	তব্যৎ/তব্য	তব্য
১১	তৃচ্	তৃ/তা
১২	ক্তিন্	তি
১৩	শানচ্	আন>মান
১৪	ণ্যৎ/ঘ্যণ্	য
১৫	যৎ	য
১৬	র	র
১৭	বরচ্	বর

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন>উক্ত শব্দ বাংলায় প্রয়োগ

সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য কৃৎ-প্রত্যয় রয়েছে। সেসবের মধ্যে যেসব সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলা ভাষায় অধিক প্রচলিত তাই বর্তমান প্রবন্ধের অলোচ্য বিষয়। সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী নির্মিত হলেও বাংলায় সামান্য পরিবর্তন (সংস্কৃত বিভক্তি পরিহার করে বা না করে) হয়ে গোটা শব্দরূপেই গৃহীত হয়েছে। তাই বাংলায় ঐসব প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি জানার জন্য আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণেরই সাহায্যপ্রার্থী হতে হয়। নিম্নে বাংলা ভাষায় আগত সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোকেই প্রদত্ত হলো:

১। ক) ঋদোরপ্ (পা. ৩/৩/৫৭), খ) এরচ্ (পা. ৩/৩/৫৬)।
[ঋদোঃ + অপ্, এঃ + অচ্]

অল্ (>অপ্, অচ্) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে অল্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় অল্ প্রত্যয়ের 'ল্' ইৎ হয় এবং 'অ' (/= য়) থাকে (পাণিনি, ২০১২: ১৮১)। যেমন –

√জি + অল্ = জয়, জয় + সুপ্ = জয়ঃ>জয় (বাংলা রূপ)
বি-√নী + অল্ = বিনয়, বিনয় + সুপ্ = বিনয়ঃ>বিনয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, হন্ ধাতুর সাথে অল্ প্রত্যয় যুক্ত হলে হন্>বধ্ আদেশ হয়। যেমন –

√হন্ (বধ্) + অল্ = বধ, বধ + সুপ্ = বধঃ>বধ (বাংলা রূপ)

২। ভাবে (পা. ৩/৩/১৮)।

ঘঞ্ প্রত্যয়: ধাতুর সাথে ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ঘঞ্ প্রত্যয়ের 'ঘ্' ও 'ঞ্' ইৎ হয় 'অ' থাকে (পাণিনি, ২০১২: ১৭৪)। যেমন –

√যুজ্ + ঘঞ্ = যোগ, যোগ + সুপ্ = যোগঃ>যোগ (বাংলা রূপ) [জ্ স্থলে গ্]
বি-√বহ্ + ঘঞ্ = বিবাহ, বিবাহ + সুপ্ = বিবাহঃ>বিবাহ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ হলে 'চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ' (পা. ৭/৩/৫২)

সূত্রানুসারে ধাতুর অন্তস্থিত বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের (চ্ জ্) স্থলে প্রথম বর্ণ (ক্ গ্) হয় (পাণিনি, ২০১২: ৫৮৯)। যেমন –

√পচ্ + ঘঞ্ = পাক, পাক + সুপ্ = পাকঃ>পাক (বাংলা রূপ)
√ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগ, ত্যাগ + সুপ্ = ত্যাগঃ>ত্যাগ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুলিঙ্গ।

৩। ক) ণ্বুল্তৃচৌ (পা. ৩/১/১৩৩), খ) কর্তরি কৃৎ (পা. ৩/৪/৬৭)।
[যুবোরনাকৌ (পা. ৭/১/১), এচো ২ য়বায়াবঃ (পা. ৬/১/৭৮)]

ণ্বুল্ (ণক>অক) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে ণক প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ণক প্রত্যয়ের 'ণ্' ইৎ হয় এবং 'অক' থাকে (পাণিনি, ২০১২: ১৩৫, ২১৩)। যেমন –

√পঠ্ + ণক = পাঠ্ + অক = পাঠক, পাঠক + সুপ্ = পাঠকঃ>পাঠক (বাংলা রূপ)
[বৃদ্ধি সূত্র]
√নী + ণক = নৈ + অক = ন্ + আয়্ + অক = নায়ক, নায়ক + সুপ্ =
নায়কঃ>নায়ক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ণক প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিতভাবে কতগুলি শব্দ গঠিত হয়।

(ক) ণক প্রত্যয় পরে থাকলে ণিজন্ত (ণিচ্ + অন্ত) ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন –

√পূজ্ + ণিচ্ = √পূজি + ণক = পূজ্ + অক = পূজক, পূজক + সুপ্ = পূজকঃ>পূজক (বাংলা রূপ)

√জন্ + ণিচ্ = √জনি + ণক = জন্ + অক = জনক, জনক + সুপ্ = জনকঃ>জনক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(খ) আ-কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়্' হয়। যেমন–

√দা + ণক = দা + অক = দা + য়্ + অক = দায়ক, দায়ক + সুপ্ = দায়কঃ>দায়ক (বাংলা রূপ)

বি-√ধা + ণক = বি-ধা + অক = বি-ধা + য়্ + অক = বিধায়ক + সুপ্ = বিধায়কঃ>বিধায়ক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৪। ল্যুট্ চ (পা. ৩/৩/১১৫)।

ল্যুট্ (>অনট্) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে অনট্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় অনট্ প্রত্যয়ের 'ট্' ইৎ হয় 'অন' থাকে (পাণিনি, ২০১২: ১৯১)। যেমন –

√নী + অনট্ = নী + অন>নে + অন = ন্ + অয়্ + অন = নয়ন, নয়ন + সুপ্ = নয়নম্>নয়ন (বাংলা রূপ)

√শ্রু + অনট্ = শ্রু + অন = শ্র্ (অ) + উ>ব্ + অন = শ্রবণ, শ্রবণ + সুপ্ = শ্রবণম্>শ্রবণ (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

৫। তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।

তব্য প্রত্যয়: কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর পরে তব্য প্রত্যয় হয় (পাণিনি, ২০১২: ১২৮)। যেমন –

√কৃ + তব্য = ক্ + অর্ + তব্য = কর্তব্য, কর্তব্য + সুপ্ = কর্তব্যঃ>কর্তব্য (বাংলা রূপ) [গুণ সূত্র]

√পঠ্ + তব্য = পঠ্ + (= অ>ই) + তব্য = পঠিতব্য, পঠিতব্য + সুপ্ = পঠিতব্যঃ>পঠিতব্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৬. তব্যত্তব্যানীয়রঃ (পা. ৩/১/৯৬)।

অনীয় প্রত্যয়: কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর পরে অনীয় প্রত্যয় হয় (পাণিনি, ২০১২: ১২৮)। যেমন –

√দৃশ্ + অনীয় = দ্ + অর্ + শ্ + অনীয় = দর্শনীয়, দর্শনীয় + সুপ্ =
দর্শনীয়ঃ>দর্শনীয় (বাংলা রূপ) [গুণ সূত্র]
√শ্রু + অনীয় = শ্র (অ) + উ>ব্ + অনীয় = শ্রবণীয়, শ্রবণীয় + সুপ্ =
শ্রবণীয়ঃ>শ্রবণীয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৭। ক) নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ (পা. ৩/১/১৩৪),
খ) সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছিল্যে (পা. ৩/২/৭৮)।

ণিনি (>ণিন্>ইন্) প্রত্যয় : ধাতুর সাথে ণিন্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ণিন্ প্রত্যয়ের 'ণ্' ইৎ হয় এবং 'ইন্' থাকে। 'ইন্' স্থলে আবার 'ঈ' হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৩৫ ও ১৫৩)। যেমন –

√দ্রুহ্ + ণিন্ = দ্রোহিন্, দ্রোহিন্ + সুপ্ = দ্রোহী>দ্রোহী (দ্রুহ্ + ইন্ =
দ্রুহ্ + ঈ) [বাংলা রূপ]
পরি-√শ্রম্ + ণিন্ = পরিশ্রমিন্, পরিশ্রমিন্ + সুপ্ = পরিশ্রমী>পরিশ্রমী
(পরি-শ্রম্ + ইন্ = পরিশ্রম + ঈ) [বাংলা রূপ]
সত্য-√বদ্ + ণিন্ = সত্যবাদিন্ + সুপ্ = সত্যবাদী>সত্যবাদী
(সত্য-বদ্ + ইন্ = সত্য-বদ্ + ঈ) [বাংলা রূপ] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, হন্ ধাতুর সাথে ণিন্ প্রত্যয় যুক্ত হলে হন্>ঘাত আদেশ হয়। যেমন–

আত্ম-√হন্ (ঘাত) + ণিন = আত্মঘাতিন্, আত্মঘাতিন্ + সুপ্ =
আত্মঘাতী>আত্মঘাতী (বাংলা রূপ)

কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় বিশেষ কৃৎ-প্রত্যয়

৮। অলংকৃঞ্-নিরাকৃঞ্-প্রজনোৎপচোৎপতোন্মদ-রুচ্যপত্রপ-বৃতু-বৃধু-সহ-চর-ঈষ্ণুচ্ (পা. ৩/২/১৩৬)।

ইষ্ণুচ্ (>ইষ্ণু) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ের চ্ ইৎ হয় ইষ্ণু ধাতুর সাথে যুক্ত হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৬২)। যেমন –

√ক্ষয় + ইষ্ণুচ্ = ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু + সুপ্ = ক্ষয়িষ্ণুঃ>ক্ষয়িষ্ণু (বাংলা রূপ)
√বৃধ্ + ইষ্ণুচ্ = বর্ধিষ্ণু, বর্ধিষ্ণু + সুপ্ = বর্ধিষ্ণুঃ>বর্ধিষ্ণু (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

৯। জাগরূকঃ (পা. ৩/২/১৬৫)। [জাগঃ + ঊকঃ]

ঊক/ঊক প্রত্যয়: ধাতুর সাথে ঊক/ঊক প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করার সময় ঊক/ঊক প্রত্যয়ই হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৬৭)। যেমন –

√ভূ + ঊক = ভৌ + ঊক = ভাবুক, ভাবুক + সুপ্ = ভাবুকঃ>ভাবুক (বাংলা রূপ)
√জাগৃ + ঊক = জাগ্ + অর্ + ঊক = জাগরূক, জাগরূক + সুপ্ =
জাগরূকঃ>জাগরূক (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১০। ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা (পা. ১/১/২৬)।
ক্ত প্রত্যয়: ধাতুর সাথে ক্ত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ক্ত প্রত্যয়ের 'ক্' ইৎ হয় 'ত' থাকে (পাণিনি, ২০১২: ৫)। যেমন –

√জ্ঞা + ক্ত = জ্ঞা + ত = জ্ঞাত, জ্ঞাত + সুপ্ = জ্ঞাতঃ>জ্ঞাত (বাংলা রূপ)
√খ্যা + ক্ত = খ্যা + ত = খ্যাত, খ্যাত + সুপ্ = খ্যাতঃ>খ্যাত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ক্ত প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিতভাবে কতগুলি শব্দ গঠিত হয়।

(ক) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর উত্তর ই-কার (ি) হয়। যেমন –

√পঠ্ + ক্ত = পঠ্ + ই + ত = পঠিত, পঠিত + সুপ্ = পঠিতঃ>পঠিত (বাংলা রূপ)
√লিখ্ + ক্ত = লিখ্ + ই + ত = লিখিত, লিখিত + সুপ্ = লিখিতঃ>লিখিত
(বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(খ) ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর অন্তঃস্থিত 'চ্' ও 'জ্' স্থলে 'ক্' হয়। যেমন –

√মুচ্ + ক্ত = মু + চ্>ক্ + ত = মুক্ত, মুক্ত + সুপ্ = মুক্তঃ>মুক্ত (বাংলা রূপ)
√ভুজ্ + ক্ত = ভু + জ্>ক্ + ত = ভুক্ত, ভুক্ত + সুপ্ = ভুক্তঃ>ভুক্ত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(গ) ক্ত প্রত্যয় পরে থাকলে উল্লিখিত পরিবর্তন ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ পরিবর্তন হয়। যেমন –

√স্বপ্ + ক্ত = স্ব>সু + প্ + ত = সুপ্ত, সুপ্ত + সুপ্ = সুপ্তঃ>সুপ্ত (বাংলা রূপ)
[সন্ধি সূত্রে ব = উ]
√বচ্ + ক্ত = ব>উ + চ্>ক্ + ত = উক্ত, উক্ত + সুপ্ = উক্তঃ>উক্ত
(বাংলা রূপ) [সন্ধিসূত্রে ব = উ]
√হন্ + ক্ত = হন্ + ন্>ইৎ + ত = হত, হত + সুপ্ = হতঃ>হত (বাংলা রূপ)
√বপ্ + ক্ত = ব>উ + প্ + ত = উপ্ত, উপ্ত + সুপ্ = উপ্তঃ>উপ্ত (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১১। ণ্বুল্তৃচৌ (পা. ৩/১/১৩৩)।
তৃচ্ (তৃ/তা) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে তৃচ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় তৃচ্ প্রত্যয়ের 'চ্' ইৎ হয়, 'তৃ' থাকে। তৃ স্থলে 'তা' হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৩৫ ও ৫৪২)। যেমন –

√নী + তৃচ্ = নেতৃ, নেতৃ + সুপ্ = নেতা>নেতা (নে + তৃ = নে + তা) (বাংলা রূপ)
√ক্রী + তৃচ্ = ক্রেতৃ, ক্রেতৃ + সুপ্ = ক্রেতা>ক্রেতা (ক্রে + তৃ = ক্রে + তা)
[বাংলা রূপ] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, তৃচ্ প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিত শব্দটি গঠিত হয়। [দ্, ধ্]

√যুধ্ + তৃচ্ = যোদ্ধৃ, যোদ্ধৃ + সুপ্ = যোদ্ধা>যোদ্ধা (যোধ্ + তৃ = যোধ্ + তা
= যোধ্ + দা) [বাংলা রূপ]

১২। ক) স্ত্রিয়াং ক্তিন্ (পা. ৩/৩/৯৪), খ) উদিতো বা (পা. ৭/২/৫৬)।

ক্তিন্ (>ক্তি>তি) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে ক্তিন্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় ক্তিন্ প্রত্যয়ের ক্ ও ন্ ইৎ হয় 'তি' থাকে (পাণিনি, ২০১২: ১৮৭ ও ৫৬৯)। যেমন –

√গম্ + ক্তিন্ = গ + ম্>ইৎ + তি = গতি, গতি + সুপ্ = গতিঃ>গতি (বাংলা রূপ)
√প্র-গম্ + ক্তিন্ = প্র-গ + ম্>ইৎ + তি = প্রগতি, প্রগতি + সুপ্ =
প্রগতিঃ>প্রগতি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ক্তিন্ প্রত্যয়যোগে বিশেষ নিয়মে নিম্নলিখিতভাবে কতগুলি শব্দ গঠিত হয়।

(ক) ক্তিন্ প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যেমন –

√মন্ + ক্তিন্ = ম + ন্>ইৎ + তি = মতি, মতি + সুপ্ = মতিঃ>মতি
(বাংলা রূপ) ইত্যাদি।
(খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা (অন্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ) অ-কারের বৃদ্ধি (আ) হয়। যেমন –
√শম্ + ক্তিন্ = শ + ম্>ন্ + তি = শান্তি, শান্তি + সুপ্ = শান্তিঃ>শান্তি
(বাংলা রূপ) [বৃদ্ধি ও সন্ধি সূত্র] ইত্যাদি।

(গ) কোনো কোনো ধাতুর 'চ্' এবং 'জ্' স্থলে 'ক্' হয়। যেমন –

√বচ্ + ক্তিন্ = ব>উ + চ্>ক্ + তি = উক্তি, উক্তি + সুপ্ = উক্তিঃ>উক্তি (বাংলা রূপ) [সন্ধিসূত্রে ব = উ]

√ভজ্ + ক্তিন্ = ভ + জ্>ক্ + তি = ভক্তি, ভক্তি + সুপ্ = ভক্তিঃ>ভক্তি (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধঃ [দ্, ধ্]

√গৈ + ক্তিন্ = গ্ + ঐ>ঈ + তি = গীতি, গীতি + সুপ্ = গতিঃ>গীতি (বাংলা রূপ)

√বুধ্ + ক্তিন্ = বুধ্ + তি>দি = বুদ্ধি, বুদ্ধি + সুপ্ = বুদ্ধিঃ>বুদ্ধি (বুধ্ + তি = বুধ্ + দি) [বাংলা রূপ] ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৩। লটঃ শতৃশানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে (পা. ৩/২/১২৪), আনে মুক্ (পা. ৭/২/৮২)।

শানচ্ প্রত্যয়: ধাতুর সাথে শানচ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় শানচ্ প্রত্যয়ের 'শ' ও 'চ' ইৎ হয়, আন থাকে [√শী + শানচ্ = শয়ান, শয়ান + সুপ্ = শয়ানঃ>শয়ান (বাংলা রূপ)]। উল্লেখ্য, 'আনে মুক্' (পা. ৭/২/৮২) সূত্রানুসারে 'আন' স্থলে 'মান' [(মুক্ = ম্) + আন = মান] হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৬০, ৫৭৪)। যেমন –

√সেব্ + শানচ্ = সেব্ + আন>মান = সেবমান, সেবমান + সুপ্ = সেবমানঃ>সেবমান (বাংলা রূপ)

√চল্ + শানচ্ = চল্ + আন>মান = চলমান, চলমান + সুপ্ = চলমানঃ>চলমান (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১৪। ঋহলোর্ণ্যৎ (পা. ৩/১/১২৪)। [ঋহলোঃ + ণ্যৎ, ঋ হল্ (ক্–ল্)]

ণ্যৎ (ঘ্যণ্) প্রত্যয়: কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর পরে ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। ণ্যৎ প্রত্যয়ের ণ্, ৎ ইৎ হয় এবং য-ফলা (্য) থাকে (পাণিনি, ২০১২: ১৩৩)। যেমন –

√কৃ + ণ্যৎ = কৃ + য = ক্ + আর্ + য = কার্য, কার্য + সুপ্ = কার্যম্>কার্য (বাংলা রূপ)

√ধৃ + ণ্যৎ = ধৃ + য = ধ্ + আর্ + য = ধার্য, ধার্য + সুপ্ = ধার্যম্>ধার্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতে 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ের পরিবর্তে বাংলায় ঘ্যণ্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

১৫। অচো যৎ (পা. ৩/১/৯৭)। [অচঃ + যৎ, অচ্ = অ–ঔ]

যৎ (>য) প্রত্যয়: কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও ঔচিত্য অর্থে 'যৎ' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যৎ প্রত্যয়ের ৎ ইৎ হয় এবং য (>য়) থাকে। উল্লেখ্য, 'যৎ' প্রত্যয় যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে 'ঈদ্যতি' (৬/৪৬৫) সূত্রানুসারে ঈ-কার আদেশ হয় (পাণিনি, ২০১২: ১২৯, ৫২২)। যেমন –

√দা + যৎ = দী>দে + য য় = দেয়, দেয় + সুপ্ = দেয়ম্>দেয় (বাংলা রূপ)
পরি-√মা + যৎ = পরি-মী>মে + য>য় = পরিমেয়, পরিমেয় + সুপ্ = পরিমেয়ম্>পরিমেয় (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর যৎ প্রত্যয়ের স্থলে য-ফলা (্য) হয়। যেমন –

√গম্ + যৎ = গম্ + য–ফলা (্য) = গম্য, গম্য + সুপ্ = গম্যম্>গম্য (বাংলা রূপ)
√লভ্ + যৎ = লভ্ + য-ফলা (্য) = লভ্য, লভ্য + সুপ্ = লভ্যম্>লভ্য (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১৬। নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ (পা. ৩/২/১৬৭)।

র প্রত্যয়: ধাতুর সাথে 'র' প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় র প্রত্যয়ই হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৬৮)। যেমন –

√হিন্স্ + র = হিংস্র, হিংস্র + সুপ্ = হিংস্রঃ>হিংস্র (বাংলা রূপ)
√নম্ + র = নম্র, নম্র + সুপ্ = নম্রঃ>নম্র (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

১৭। স্থেশভাসপিসকসো বরচ্ (পা. ৩/২/১৭৫)।

বরচ্ (>বর) প্রত্যয়: ধাতুর সাথে বরচ্ প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন করার সময় বরচ্ প্রত্যয়ের চ্ ইৎ হয় বর ধাতুর সাথে যুক্ত হয় (পাণিনি, ২০১২: ১৬৯)। যেমন –

√নশ্ + বরচ্ = নশ্বর, নশ্বর + সুপ্ = নশ্বরঃ>নশ্বর (বাংলা রূপ)
√স্থা + বরচ্ = স্থাবর, স্থাবর + সুপ্ = স্থাবরঃ>স্থাবর (বাংলা রূপ) ইত্যাদি।

এভাবে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়েছে। যার ফলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ও উক্ত প্রত্যয়জাত শব্দের গুরুত্ব ও ব্যবহার বিস্তৃত হয়ে আছে। তাই আজ আমাদের উভয় ভাষার প্রত্যয় ও প্রত্যয়জাত শব্দ এবং শব্দের সঠিক বানান জানার জন্য প্রত্যয়ের জ্ঞান আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রত্যয়ের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এটি শুধু উভয় ভাষায় নতুন শব্দ গঠনই করে না শব্দের রূপ পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন, শব্দের বানান শুদ্ধ করা প্রভৃতি কাজ করে। তাই উভয় ভাষায় প্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যয়ের অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দেখা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রত্যয়সহ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাকরণের বিচার-বিশ্লেষণে অনেকটা শূন্যতা দেখা যায়। তাই এ শূন্যতা আজ সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলা ভাষায় প্রয়োগ হয়ে অনেকটা দূর করেছে। সংস্কৃতে প্রত্যয়ের নিয়ম বা সূত্র সুনির্দিষ্ট, কিন্তু সংখ্যায় অনেক। পক্ষান্তরে বাংলায় প্রত্যয়ের নিয়ম স্বল্প এবং সংখ্যায়ও অল্প। তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রত্যয় বাংলা প্রত্যয়কে পথ দেখিয়ে চলছে। তাই প্রত্যয়ের সঠিক নিয়ম-কানুন জানা থাকলে সহজেই প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় বা প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ করা যায়। এ প্রবন্ধটি উভয় ভাষার সকল পাঠক ও গবেষককে গাণিতিকভাবে পথ দেখাবে কীভাবে প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় ও প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ করতে হবে। আর এজন্য প্রত্যয়ের নিয়ম বা সূত্র সঠিকভাবে বুঝে বেশি বেশি দৃষ্টান্ত (উদাহরণ) হাতে-কলমে চর্চা করা প্রয়োজন। প্রবন্ধটিতে উভয় ভাষার ব্যাকরণে প্রত্যয়ের স্বরূপ, নিয়ম, দৃষ্টান্তসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটেছে শুধু শব্দের বিভক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাংলায় সে ব্যতিক্রম মুখ্য নয়। তবে আজ সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার শব্দগঠনসহ শুদ্ধ বানান লিখনে প্রত্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এক কথায় বলব প্রত্যয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উভয় ভাষার সম্মানও অক্ষুণ্ন থাকবে।

সহায়কপঞ্জি : (+ টীকা)

সংস্কৃত

১. পাণিনি [অধ্যাপক ডঃ তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (সম্পা.)] (২০১২)। *অষ্টাধ্যায়ী*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা

পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ী :

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের মধ্যমণি পাণিনি। তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়ে অনেক মতভেদ লক্ষ করা যায়। তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম কিংবা তারও বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়ার কারণে এই নাম। প্রতিটি অধ্যায় আবার চারটি পাদে বিভক্ত। সমগ্র গ্রন্থটি সূত্রাকারে নিবদ্ধ। সূত্রের মোট সংখ্যা ৩৯৯৬।

[উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে পাণিনির সূত্রগুলি উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

২. ড. বিশ্বরূপ সাহা (১৯৯৭)। *বেদভাষানির্মিতি বা সংস্কৃত ব্যাকরণ*। সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলিকাতা

৩. ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (২০০৩)। *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র*। সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলকাতা

বাংলা

১. জ্যোতিভূষণ চাকী (২০০১)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা

২. ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস (২০১৭)। *বাংলা ভাষার উৎস ও উপাদান*। বেদবাণী প্রকাশনী, গোপালগঞ্জ

৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৩৮০)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা

৪. মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (২০০২)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (২০০৩)। *ব্যাকরণ মঞ্জরী*। মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

৬. রফিকুল ইসলাম, পবিত্র সরকার, মাহবুবুল হক [সম্পা.] (২০১৮)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ*। বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা

৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯)। *ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

৮. সুকুমার সেন (২০১৫)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। আনন্দ পাবলিকেশন প্রা. লি., কলকাতা

নিবন্ধমালা: ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২০
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মার পরিশুদ্ধি ও জ্ঞান : ইমাম গাযালির মতের পর্যালোচনা

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস *

ভূমিকা

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। আত্মা দেহের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক শক্তি। এ শক্তির বলিষ্ঠতা, পূতঃপবিত্রতা, জ্ঞান ও ক্ষমতা মানুষকে সুপথে প্রাগ্রসর করে। পক্ষান্তরে এ শক্তির ক্ষীণতা, হীনতা, অপরিশুদ্ধি ও কলুষতা মানুষকে অধঃপতিত করে। উৎকর্ষের উঁচু স্তরে এ শক্তি জগৎ-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ এবং ঐশী সত্তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। কলুষিত ও অপরিশুদ্ধ আত্মায় সত্তার জ্ঞান উন্মোচিত হয় না। পরিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মায় অতীন্দ্রিয় ও ঐশীজগতের বাস্তবতা (হাকীকত) উদ্ভাসিত হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও সূফি ইমাম গাযালি (১০৫৫-১১১১খ্রি.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন এবং পরিশুদ্ধ আত্মায় (কলবে সালীম) বাস্তবতা তথা হাকীকতের জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের আলোচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ইমাম গাযালির মতানুসারে আত্মার স্বরূপ-প্রকৃতি, পবিত্রতা অর্জনের উপায়, আত্মার জ্ঞানগত শক্তি অর্থাৎ জ্ঞানের উৎস হিসেবে আত্মা, আত্মায় উদ্ভাসিত জ্ঞানের প্রকৃতি, সীমা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক ও বিচারমূলক অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হবে।

আত্মার প্রকৃতি

ইসলামি সাহিত্যে আত্মা বোঝাতে চারটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা: কলব, রূহ, নফস

* আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং আকল। ইমাম গাযালিও আত্মা বোঝাতে এ চারটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ চারটি শব্দের প্রত্যেকটির দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনা রয়েছে। এক অর্থে কলব হচ্ছে বাম স্তনের কিছুটা নিম্নে অবস্থিত ত্রিকোণাকৃতির একটি লম্বা মাংসপিণ্ড। একে হৃদপিণ্ড বলে অভিহিত করা হয়। এ পিণ্ডের মধ্যস্থানে শূন্যগর্ভ আছে, এতে কাল রক্ত থাকে। আরেক অর্থে কলব হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক লতিফা বা সূক্ষ্ম বিষয়। মানুষের স্বরূপ-প্রকৃতি এ সূক্ষ্ম বিষয়ের সাথে যুক্ত। এ কলবকেই হিসাব-নিকাশের অধীন হতে হয়। আবার রূহ এক অর্থে একটি সূক্ষ্ম দেহ, এর উৎস হৃদপিণ্ডের শূন্যগর্ভ। এ শূন্যগর্ভ থেকে রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে রূহ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণচাঞ্চল্য বজায় রাখে। আরেক অর্থে রূহ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়। কলবের দ্বিতীয় অর্থের সাথে রূহের এ অর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে নফস বলতে এক অর্থে মানুষের কুপ্রবৃত্তির বিষয়াবলিকে বোঝায়। কাম-ক্রোধ, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, চাতুরতা, শঠতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবকে নফস বলে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় অর্থে নফস হচ্ছে আধ্যাত্মিক লতিফা বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়। এটি নফসের প্রথম অর্থে মন্দ স্বভাবকে দূর করে মানুষকে উন্নততর স্তরে উপনীত করতে পারে। এটি হচ্ছে প্রশান্ত আত্মা (নফসে মুতমায়িন্নাহ)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে আকল। এক অর্থে আকল হচ্ছে একটি বৃত্তি। এটি থাকার কারণে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। দ্বিতীয় অর্থে আকল হচ্ছে সূক্ষ্ম বিষয়, যা দিয়ে মানুষ জগৎ-জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এ শব্দ চতুষ্টয়ের প্রথম অর্থে আত্মা সকল প্রাণির মধ্যে আছে, আর দ্বিতীয় অর্থে আত্মা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়কে বোঝায় যা কেবল মানুষের মধ্যে আছে।[১] এ দ্বিতীয় অর্থেই আমরা আত্মা, অন্তর, হৃদয়, কলব শব্দগুলো এখানে ব্যবহার করবো। এরূপ সূক্ষ্ম বিষয়কে নির্দেশ করে আল্লাহ্ বলেন–"বলুন, আত্মা আমার আদেশের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

সূক্ষ্ম বিষয় হিসেবে আত্মা অশরীরী, অবিভাজ্য, অপরিমেয় এবং নিরাকার। আল্লাহর আদেশ হিসেবে এটি আধ্যাত্মিক, অজড়ীয় এবং অপার সম্ভাবনাময়। এর রয়েছে জ্ঞান অর্জন এবং তা কার্যকর করার ক্ষমতা। এটিকে স্বীয় আদেশ বলে আল্লাহ আত্মাকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন । এ কারণে আত্মা চেতনা, বুদ্ধি-বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা – ইত্যাদি গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে অনুমান করা যায়।

দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক

দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র সত্তা। দেহের বিস্তৃতি আছে। মাটি, পানি, আগুন এবং বায়ু দ্বারা দেহ সৃষ্টি। কিন্তু আত্মা অধ্যাত্ম দ্রব্য এবং এর উৎস ঐশী। তবে আত্মা কালক্রমে দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। আত্মা দেহে আশ্রয় গ্রহণ করলেই দেহে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আবার আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দেহের বিনাশ বা মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের পূর্বে সকল মানুষের আত্মা একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং এসব আত্মার নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি নিয়েছেন। এসব আত্মা 'আলমে আরওয়াহ' বা রূহের জগতে অবস্থান করে। আল্লাহ পর্যায়ক্রমে একেক আত্মাকে একেক মাতৃগর্ভে ভ্রূণে প্রেরণ করেন।[৩] পার্থিব জীবনে আত্মা দেহের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতিত আত্মার কর্মতৎপর হওয়ার কোনো উপায় থাকে না। আত্মা দেহে অবস্থান করে পার্থিব পরীক্ষার মোকাবিলায় আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে সঠিক জীবনাচারের মাধ্যমে নিজেকে উৎকর্ষের শিখরে উন্নীত করে অথবা আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে ভ্রান্ত জীবনাতিপাতের মাধ্যমে নিজেকে অপদস্ত করে।

মানবাত্মার পরম লক্ষ্য

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য (ultimate end)কে নীতিবিদ্যা ও দর্শনে পরম কল্যাণ (summum bonum) বলে অভিহিত করা হয়। ইমাম গাযালির মতে এ পরম কল্যাণ হচ্ছে 'আস সা'আদা আল হাকীকিয়াহ' – প্রকৃত সৌভাগ্য। আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান লাভের মধ্যে এ সৌভাগ্য নিহিত। আল্লাহর মা'রিফাত লাভে যে আত্মা যত উন্নতি লাভ করতে পারে, সে আত্মা তত সৌভাগ্যশালী হতে পারে।[৪] ইমাম গাযালির মতে সুখ-শান্তি ও পরম সৌভাগ্য সাতটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত: যথা : মৃত্যুহীন জীবন, বেদনাহীন সুখ, অভাবহীন সম্পদ, খুঁতহীন পূর্ণতা, দুঃখহীন আনন্দ, অপদস্ততাহীন সম্মান এবং ত্রুটিহীন জ্ঞান। এগুলো অর্জন করা মর্ত্যজীবনে সম্ভব নয়। অবিনশ্বর জীবনে এটি সম্ভব। এটি সম্ভব কেবল আল্লাহপ্রেমের মাধ্যমে। এবং আল্লাহপ্রেম অর্জন করতে হয় ইহজগতে কঠোর সাধনার মাধ্যমে। আর আল্লাহপ্রেমের গভীরতা নির্ভর করে আল্লাহর মা'রিফাত তথা জ্ঞান লাভের সাফল্যের উপর।[৫] কিন্তু অপবিত্র ও কলুষিত আত্মার পক্ষে আল্লাহর জ্ঞান বা মা'রিফাত লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ পূতঃপবিত্র। তাই আল্লাহর জ্ঞান লাভের জন্যে নিষ্কলুষ ও পরিশুদ্ধ আত্মা প্রয়োজন। তাহলে পরিশুদ্ধ আত্মা কী? কী এর গুণ-বৈশিষ্ট্য? তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এসবের আলোচনার পূর্বে মানুষের স্বভাব- প্রকৃতির কতিপয় বিষয় আলোকপাত করা হলো।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি

মানুষ সৎস্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ কারণেইতো আমরা বলি শিশুরা নিষ্পাপ। আস্তে আস্তে শিশু তার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজ থেকে নানা স্বভাব-প্রকৃতির শিকার হয়। তার চেতনার বিভিন্ন স্তরে এসব স্বভাব-প্রকৃতি হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। তার এসব স্বভাবের কোনটি কোনটি তার এবং সমাজের জন্যে ক্ষতিকর আবার কোন কোনটি তার নিজের এবং সমাজের জন্যে মঙ্গলজনক। ইমাম গাযালি মানুষের এ স্বভাব-প্রকৃতিকে চার শিরোনামে অভিষিক্ত করেছেন।[৬] যথা:

১. ইতর প্রাণির স্বভাব
২. হিংস্র প্রাণির স্বভাব
৩. শয়তানের স্বভাব
৪. ফেরেশতাদের স্বভাব

এর প্রথম দুটিকে তিনি যথাক্রমে শূকর ও কুকুরের স্বভাবের সাথে তুলনা করেছেন। আর চতুর্থটিকে প্রজ্ঞাশীল সত্তার গুণ বলে অভিহিত করেছেন। অতিরিক্ত লোভ ও অধিক আহার শূকরের স্বভাব। এ কারণে তার মধ্যে কামস্বভাব প্রবল হয়ে থাকে। এমন নয় যে, শূকর তার আকার আকৃতির কারণে নিন্দনীয়; বরং সে তার স্বভাব-প্রকৃতির কারণে ঘৃণ্য। কুকুরের স্বভাব হচ্ছে হিংস্রতা ও শত্রুতা। মারামারি করা, যুদ্ধ বিগ্রহ করা, অন্যকে হত্যা করা ইত্যাদি হচ্ছে হিংস্র জন্তুর স্বভাব। শয়তান মানুষের মধ্যে এই দুই ধরনের প্রাণির স্বভাবকে জাগ্রত করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। শয়তান মানুষের লোভ ও ক্রোধকে উত্তেজিত করতে থাকে। অপকর্মে লিপ্ত থাকা, ছলচাতুরি, শঠতা, প্রতারণা, কপটাচারণ ইত্যাদি শয়তানের স্বভাব। ফেরেশতাগণ কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, শঠতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দোষ হতে মুক্ত। তারা কেবল ঐশী সত্তার আদেশ-নিষেধ পালনে মশগুল থাকে। মানুষের প্রজ্ঞা শূকর, কুকুর ও শয়তানের স্বভাবকে অবদমিত ও নিয়ন্ত্রণে রেখে ফেরেশতাদের স্বভাব অর্জন করতে পারে। মানুষ যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হতে ব্যর্থ হয়, এবং তার মধ্যে শূকর, কুকুর ও শয়তানের স্বভাব প্রবল হয় তখন সে নিজেকে ক্রোধ, লালসা,শঠতা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির দাসে পরিণত করে এবং এসব প্রবৃত্তি তার নিকট মনিব বলে বিবেচিত হয়। এসবের আদেশ পালন করাই তখন তার জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। কামনাসদৃশ শূকরের অনুগত্যের ফলে মানুষের মধ্যে নির্লজ্জতা, দুশ্চরিত্র, ব্যয়বাহুল্য, কৃপণতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রবলরূপ ধারণ করে। আবার ক্রোধসদৃশ কুকুরের আনুগত্যের ফলে–আত্মপ্রশংসা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, পরনিন্দা, অপরকে হেয় জ্ঞান করা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবের আধিক্য তার মধ্যে বিরাজমান থাকে। আর শয়তানী স্বভাবের আনুগত্যের ফলে মানুষের মধ্যে প্রতারণা, ছলচাতুরী, ধূর্তামি, প্রবঞ্চনা,

মিথ্যাচার, অশ্লীলতা ইত্যাদি স্বভাবজাত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাসুলভ স্বভাব প্রবল হলে মানুষের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস এবং জগৎ-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন তথা মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ হয়। এর ফলে তার মধ্যে সততা, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য, সংসারানাসক্তি, আল্লাহভীতি, সদানন্দ, লজ্জাশীলতা, দয়া-মায়া, স্বশাসন, ধৈর্য, ক্ষমা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি সৎস্বভাবের উন্মেষ ঘটে।[৭]

ইমাম গাযালির মতে, মানব অন্তরের চারটি শক্তি বা বৃত্তি রয়েছে।[৮] এগুলো হলো:

ক) কুওয়াতে ইলম অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি

খ) কুওয়াতে গদব অর্থাৎ ক্রোধশক্তি

গ) কুওয়াতে শাহওয়াত অর্থাৎ কামশক্তি

ঘ) কুওয়াতে 'আদল অর্থাৎ ভারসাম্য স্থাপনের শক্তি

কুওয়াতে ইলম তথা জ্ঞানশক্তির দ্বারা মানুষ সত্য-মিথ্যা, হক ও বাতিল, ভাল-মন্দ ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারে। পরিচালনা ও শাসন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, সূক্ষ্ম জ্ঞান, অভিমত প্রদানের দক্ষতা, যুক্তি প্রদান, অভিমত খণ্ডন ও তত্ত্ব রচনার বৃত্তি ইত্যাদি মানবের মাঝে এ শক্তি থাকার কারণে পরিলক্ষিত হয়।

কুওয়াতে গদব তথা ক্রোধশক্তির দ্বারা মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ-ক্ষোভ, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, প্রতিশোধ নেওয়া, কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব করা ইত্যাদি বৃত্তি সৃষ্টি হয়। আবার এ শক্তি থাকার কারণে মানুষ দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের পালন গুণে গুণান্বিত হয়। এ শক্তির কারণেই মানুষ উদ্যমী হয় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে নিজেকে নির্লিপ্ত না রেখে কর্মসচেষ্ট রাখে।

কুওয়াতে শাহওয়াত তথা কামশক্তির দ্বারা মানুষের মাঝে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ভোগ-স্পৃহা এবং জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি হয়। এ শক্তির কারণে মানুষ ক্ষুধা পেলে খাবার গ্রহণ করে। সুস্বাদু জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্য ও নান্দনিক বিষয় তাকে তাড়িত করে। এ শক্তির কারণে মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, দয়া-মায়া ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। আবার অসংযত ও ঔদ্ধত্য আচরণও মানবের মাঝে পরিলক্ষিত হয় এ শক্তি নিহিত থাকার কারণে।

কুওয়াতে 'আদল তথা ন্যায়পরতা ও ভারসাম্য স্থাপনের শক্তি দ্বারা মানবের উল্লিখিত তিনটি গুণের প্রত্যেকটির মধ্যে পৃথকভাবে সমতা বিধান করা হয়। এটি প্রত্যেক গুণকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করে। এর রয়েছে শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও সমতা বিধানের ক্ষমতা। এটি এ তিন শক্তিকে পরিমিত রাখে এবং সীমা অতিক্রম করতে নিষেধ করে। জ্ঞান, ক্রোধ, কাম – এ তিন শক্তির প্রত্যেকটির

আধিক্য এবং স্বল্পতা রয়েছে। আধিক্য এবং স্বল্পতা কোনটিই মানবাত্মার জন্য কল্যাণকর নয়। কুওয়াতে আদল তথা ভারসাম্য স্থাপনের শক্তি এ দ্বিবিধ অবস্থাকে মধ্যবর্তী অবস্থানে দৃঢ় রাখতে ভূমিকা পালন করে।

কুওয়াতে ইলম তথা জ্ঞান শক্তির অতিরঞ্জনের ফলে মানবের মাঝে ধোঁকা, প্রতারণা, শঠতা, ছল-চাতুরী ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে। জ্ঞান-গরিমার এ কার্যকলাপকে আমাদের সমাজে বুদ্ধির কারিশমা বলে অভিহিত হতে দেখি। বিপরীতক্রমে, জ্ঞানশক্তির স্বল্পতা মানবের মাঝে দূরদর্শিতার অভাব, অসচেতনতা, অপরিপক্কতা, নির্বুদ্ধিতা, উন্মাদনা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। কুওয়াতে আদল তথা ভারসাম্য শক্তির কাজ হচ্ছে–এ অতিরঞ্জন ও স্বল্পতার মাঝে সমতা স্থাপন করা–যাতে জ্ঞান-বুদ্ধির চাতুর্যপূর্ণ প্রয়োগ অথবা অপর্যাপ্ত প্রয়োগ রোধ করা যায়। জ্ঞানশক্তির মধ্যে সমতা তথা ভারসাম্য স্থাপনের ফলে জ্ঞানশক্তিতে যে গুণটির উন্মেষ ঘটে তার নাম হচ্ছে প্রজ্ঞা (wisdom)। প্রজ্ঞা অর্জিত হলে বুদ্ধির ঔদ্ধত্য, চাতুর্য, নির্বুদ্ধিতা, উন্মাদনা ইত্যাদি প্রজ্ঞার দাসে পরিণত হয়। প্রজ্ঞা প্রবৃত্তির রিপুগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। জ্ঞানশক্তি তখন প্রজ্ঞার নির্দেশ পালনের জন্য বাধ্য ও অনুগত কর্মীর ন্যায় প্রস্তুত থাকে। প্রজ্ঞার এ কর্তৃত্বপরায়ণতা ও ভারসাম্য স্থাপনের ক্ষমতার কারণে প্রজ্ঞাকে একটি মহিমান্বিত শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রজ্ঞার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবের কল্যাণকর শক্তি। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–"যে প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছে, সে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে।"[৯]

অনুরূপভাবে ক্রোধশক্তিরও রয়েছে অতিরঞ্জন ও স্বল্পতা। এ শক্তির বাহুল্যের ফলে মানবের মাঝে অহংকার, দাম্ভিকতা, আস্ফালন, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি স্বভাব জন্মলাভ করে। বিপরীতক্রমে, এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, অপমানবোধ, হীনতা, লাঞ্ছনা, ভয়, সংকোচবোধ ইত্যাদি স্বভাব সৃষ্টি হয়। এ দুই চরম অবস্থা অর্থাৎ ক্রোধের বাহুল্য ও স্বল্পতার মধ্যে ভারসাম্য তথা সমতা স্থাপিত হলে মানবের মাঝে যে মধ্যবর্তী গুণের উন্মেষ ঘটে তার নাম হচ্ছে বীরত্ব (শাজা'আত)। বীরত্ব গুণের উন্মেষের কারণে মানবের মাঝে দয়া, ঔদার্য, সাহসিকতা বিনয়, স্থৈর্য, সহনশীলতা, ক্রোধ-ক্ষোভ অবদমন ক্ষমতা, মেজাজের গাম্ভীর্য ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটে। এ গুণ মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় করে এবং সৎগুণাবলিকে শাণিত করে আর অপস্বভাবকে নির্মূল করে।

মানব অন্তরের আরেকটি অভ্যন্তরীণ গুণ হচ্ছে কামশক্তি। এরও রয়েছে অতিরঞ্জন ও স্বল্পতা। এর বাহুল্য থেকে লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, অপব্যয়, লৌকিকতা, অশ্লীলতা, হিংসা, গরীব-মিসকীনকে হেয় মনে করা, যশ-খ্যাতির মোহ ও দুনিয়াসক্তি ইত্যাদি বদ স্বভাবের সৃষ্টি হয়। বিপরীতক্রমে এর স্বল্পতার কারণে কৃপণতা, পরিবার-পরিজনের জন্য পর্যাপ্ত খরচ না করা, আর্ত-পীড়িতদের প্রতি মর্মযন্ত্রণার

সৃষ্টি না হওয়া, উদ্যমী না হওয়া, নিজের এবং পরিজনদের প্রতি যত্নশীল না হওয়া, আয়-উপার্জনের প্রতি উদাসীন থাকা, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনীহা-- ইত্যাদি বদস্বভাব জন্ম লাভ করে। এ দুই চরম অবস্থা তথা কামশক্তির বাহুল্য ও স্বল্প অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য তথা সমতা স্থাপিত হলে মানবের মাঝে যে মধ্যবর্তী গুণের উন্মেষ ঘটে, তার নাম হচ্ছে পরসায়ী তথা পবিত্র ও সংযমী অবস্থা। এ সংযমী গুণের উন্মেষের কারণে মানবের মাঝে দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, সবর, অল্পেতুষ্টি, পরহেযগারী, নির্লোভ, নির্মোহ ইত্যাদি গুণের স্থিতি ও প্রকাশ ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ তার কুওয়াতে 'আদল তথা বিচার ও ভারসাম্য স্থাপনের শক্তির সাহায্যে জ্ঞানার্জনের শক্তি, ক্রোধশক্তি এবং কামশক্তির মধ্যে পরিমিত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ প্রবৃত্তির বদ রিপুগুলো নির্মূল করে সৎস্বভাবের উন্মেষ ঘটাতে পারে। এ অবস্থায় মানুষ সচ্চ-রিত্রবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী বলে অভিষিক্ত হয়। আর প্রবৃত্তির এ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সে শরী'আতের বিধি-নিষেধ অকুণ্ঠচিত্তে পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

আত্মার পরিশুদ্ধি কী

অন্তরকে সকল মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত রাখাই হচ্ছে অন্তরাত্মার পরিশুদ্ধি। অন্য কথায়-- তাকওয়াপূর্ণ ও আল্লাহভীরু অন্তরই হচ্ছে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। কেননা এ অন্তর আল্লাহর ভয়ে সকল ধরনের গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। এ আত্মা অত্যন্ত সচেতন থাকে যাতে তার চিন্তা-চেতনা ও কর্মে কোন ধরনের অনৈতিক কাজ, অপরাধ ও গুনাহ সংঘটিত না হয়। গুনাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ ও রাসূল (স.)-এর অবাধ্যতার মাধ্যমে। এ অবাধ্যতা প্রকাশিত হয় তার প্রবৃত্তির বাহুল্য ও স্বল্প গুণের কারণে। তাই আল্লাহর ভয়ে ভীত আত্মা নিজের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে স্বীয় স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখে। যে আত্মা গুনাহ ও খেয়াল-খুশির কলুষতা থেকে মুক্ত, পূতঃপবিত্র ও পরিশুদ্ধ আল কুরআন সে আত্মাকে সফল; পক্ষান্তরে যে আত্মা গুনাহের দ্বারা আচ্ছাদিত, পঙ্কিল ও কলুষ, সে আত্মাকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছে।[১০]

পরিশুদ্ধ আত্মা প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট চিত্ত থাকে। এ আত্মা শোকর, সবর, ভয়-আশা, পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত, আল্লাহপ্রেম, সন্তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, তাফাক্কুর, ধ্যানমগ্নতা, ইখলাছ, আত্মমূল্যায়ন, মৃত্যুচিন্তায় বিভোর- ইত্যাদি গুণাবলি দ্বারা বিভূষিত হয়ে যায়।[১১]

আত্মার অপরিশুদ্ধি কী

আত্মার অপরিচ্ছন্নতা, অপবিত্রতা ও কলুষতাই আত্মার অপরিশুদ্ধি। মানুষ তার প্রবৃত্তির প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারালে প্রবৃত্তি তাকে অনৈতিক, অসৎ, মন্দ ও পাপ কাজে

লিপ্ত করে। পাপ একটি মারাত্মক বিষ। এ বিষ তার অন্তরকে অন্ধ, বধির ও পঙ্গু করে ফেলে। অর্থাৎ এ বিষের প্রভাবে তার অন্তরে মরিচা পড়ে। অন্তর কালো ও অস্বচ্ছ হয়ে যায়। লোহায় মরিচা ধরলে তা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। অনুরূপ গুনাহ ও পাপের কারণে মানুষের অন্তর কালিমালিপ্ত হয় এবং তা কলুষতায় পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলছেন–"তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[১২] এ অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। কালক্রমে এ অন্তর সত্য শ্রবণ, সৎপথে চলা এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতা হারায়।

এ অন্তর খায়েশাত তথা প্রবৃত্তি মন্দ স্বভাবের দাস হিসেবে অবদমিত হয়। এটি বদ অভ্যাস দ্বারা কলুষিত। এ অন্তরে প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশির বক্ষ উন্মোচিত থাকে। সৎস্বভাবের দ্বার বন্ধ থাকে। প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। ঈমানের শাসন দুর্বল হয় এবং বিশ্বাসের প্রভা ম্লান হয়ে যায়। এ অন্তরে আল্লাহর ওয়াদা, শাস্তি ও পরকালভীতির অস্তিত্ব থাকে না। এ অন্তর তমসাচ্ছন্ন। এতে হেদায়াতের আলো প্রবেশ করে না। হিতাহিত জ্ঞান ও সুমতি মোটেই থাকে না। সুদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে না। এ অন্তরাধিকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়াল-খুশীর ইচ্ছানুযায়ী প্রবহমান হয়। ফলে সুন্দর ও কমনীয় বস্তু দেখলে এ আত্মা লোলুপদৃষ্টি প্রদান করে। জাঁকজমক, প্রতিপত্তি ও অহংকারের সামগ্রি দেখলে তা অর্জন করার জন্য পাগলপারা হয়ে যায়। নিজের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। বুদ্ধি লোপ পায়। অন্তর কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্তর্দৃষ্টির আলো ঘোলাটে হয়ে যায়। সেহেতু এ আত্মা লজ্জা-শরম, ঈমান ও ভদ্রতাকে শিকায় রেখে ইতর প্রাণী, হিংস্র প্রাণী, মোনাফেকী ও শয়তানী অভিপ্রায় চরিতার্থ করার তাগিদে সচেষ্ট থাকে।[১৩]

আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের উপায়

আত্মশুদ্ধি বা পবিত্রতা দুভাবে অর্জিত হয়। যথা:

এক) আল্লাহর দান;

দুই) সাধনা।

এক) আল্লাহর দান

মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কৃপায় জন্মলগ্ন থেকেই অনেককে সচ্চরিত্র, পবিত্র ও আত্মশুদ্ধির অধিকারী করেছেন। কাম-ক্রোধ, কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির মন্দ রিপুগুলো তাঁদের উপর প্রবল হতে পারে না। এগুলো তাঁদের অন্তরাত্মার অধীন এবং অনুগত। তাঁরা তাঁদের প্রবৃত্তিগুলোকে অনায়াসে আল্লাহর আনুগত্যে কাজে লাগাতে পারেন। এ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন নবী-পয়গম্বরগণ।

দুই) সাধনা

সাধনা দ্বারা চরিত্রের সংশোধন ও পরিশুদ্ধি সম্ভব। হিংস্র কুকুরকে যেমন মানুষ প্রশিক্ষণ তথা সাধনায় নিবিষ্টের মাধ্যমে বশে আনতে পারে, প্রশিক্ষিত করতে পারে, তেমনি মানুষ তার কাম, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। সাধনার মাধ্যমে মন্দ স্বভাব নির্মূল করা, মানবীয় বৃত্তিকে পরিমিত রাখা এবং সৎস্বভাবের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়।

সাধনার রয়েছে দু'টি দিক: নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক হচ্ছে শত্রুর বিনাশ সাধন অর্থাৎ প্রবৃত্তির যে গুণাবলি পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা আত্মার শত্রু, আত্মবিকাশের শত্রু। এ শত্রু অবদমন ব্যতিত আত্মার পরিশুদ্ধি সম্ভব হয় না। বিপরীতক্রমে, আত্মার উৎকর্ষ ও বিকাশে যে গুণাবলি সহায়ক, যে গুণাবলি আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনে ভূমিকা রাখে, সে গুণাবলিকে আত্মার ইতিবাচক গুণ, বন্ধু ও মিত্র বলে অভিহিত করা যায়।

আত্মার নেতিবাচক দিক তথা শত্রু নিয়ে আলোচনা করা যাক। আত্মার প্রধান শত্রু হচ্ছে শয়তান। আল কুরআনে শয়তানকে মানবের সুস্পষ্ট শত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৪] মানুষের আরেকটি শত্রু হচ্ছে তার নফস বা কুপ্রবৃত্তি। এ কুপ্রবৃত্তি হচ্ছে শয়তানের শত্রুতা করার প্রধান মাধ্যম। শয়তান মানুষের মন্দ স্বভাবকে ব্যবহার করে মানুষকে তার কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। শয়তান মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দুনিয়াসক্তি, মর্যাদাপ্রীতি, লৌকিকতা, পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি – ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে। ফলে মানুষ তার সৎ গুণাবলি হারায় এবং তার গুণ-বৈশিষ্ট্য ইতর প্রাণী, হিংস্র প্রাণী ও শয়তানী গুণ-বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়।[১৫]

এবার আত্মার ইতিবাচক দিক তথা বন্ধু ও মিত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। কুপ্রবৃত্তি কুকুরের ন্যায়। তাই কষ্ট দেয়া ব্যতিত তা সংশোধিত হয় না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধচারণই তার অভ্যন্তরীণ রোগের মহৌষধ। এ জন্য মুজাহাদার অর্থাৎ প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করে প্রবৃত্তিকে দমনে রাখার চেষ্টা-তদবির করতে হয়। ইমাম গাযালি (র.)-এর মতে মুজাহাদার মাধ্যমে মানবাত্মায় নিম্নোক্ত গুণাবলি আয়ত্ত করা আবশ্যক। যথা: তওবা (কৃত গুণাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং গুণাহ হতে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা), ছবর (লোভ, ক্রোধ, কামনা ইত্যাদির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্তিকে দমনে রাখার কষ্ট সহ্য করা এবং আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা না হয়ে অটল থাকার শক্তি), শোকর (সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা), খওফ (ভয়), যুহদ (পার্থিব ভোগ-বিলাসে অনাসক্তি), মুহাসাবা (কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ করা), মুরাকাবা (সকল কর্ম আল্লাহ প্রত্যক্ষ

করছেন – এ ধ্যান অর্জন করা), রজা (আল্লাহর রহমতের জন্য আশান্বিত থাকা), তাফাক্কুর (প্রকৃতিতে আল্লাহর মহিমার উপলব্ধি), মহব্বত (আল্লাহর প্রেম), শওক (অনুরাগ ও প্রেরণা), রেযা (তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি), তাওহীদ (আল্লাহর একত্বের জ্ঞান), তাওয়াক্কুল (সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা), এখলাছ (পুণ্য কাজ কেবল আল্লাহর জন্যই করা), ছেদক (সত্যাপরায়ণতা) প্রভৃতি কর্ম।[১৬] এসব গুণ অর্জনের জন্যে মরমি সাধনার প্রয়োজন হয়।

এভাবে সাধনার মাধ্যমে আত্মার নেতিবাচক গুণের বিনাশ সাধন এবং ইতিবাচক গুণের পরিপোষণের মাধ্যমে আত্মা পবিত্রতা অর্জন ও পরিশুদ্ধি লাভ করে। এ পরিশুদ্ধ আত্মা প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য উপযুক্ত হয়।

পরিশুদ্ধ আত্মার সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক

যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য আত্মার পবিত্রতা অর্জন আবশ্যক। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ইমাম গাযালির মতে যথার্থ জ্ঞান কী? কে জ্ঞান অর্জন করে? কীসের জ্ঞান অর্জন করে? কীভাবে জ্ঞান অর্জন করে? এসব প্রশ্নের আলোচনা করা প্রয়োজন।

যথার্থ জ্ঞান কী

ইমাম গাযালির মতে, বস্তুকে স্বরূপে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। অর্থাৎ যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমন জানাকে বলা হয় ইল্‌ম বা জ্ঞান।[১৭] আর নিশ্চিত ও যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বস্তুর এমন জ্ঞান যাতে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না, কোন ভ্রান্তি বা অলীক অনুমানের অবকাশ থাকে না। এ জ্ঞান হবে অকাট্য এবং সংশয়াতীত। একে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা সফল হয় না।[১৮]

কে জ্ঞান অর্জন করে

দেহের উপর কর্তৃত্ব করে আত্মা। আত্মাই দেহের পরিচালক। দেহ ও আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা। মানুষ ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি যা কিছু অর্জন করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তার জ্ঞান। শ্রেষ্ঠ বস্তু তার শ্রেষ্ঠ সত্তা দিয়ে অর্জন করবে–এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। সেহেতু জ্ঞান ও তার আধেয় সম্পর্কে সমধিক অবহিত হওয়ার ক্ষমতা আত্মার রয়েছে। অর্থাৎ আত্মাই হচ্ছে জ্ঞাতা। আত্মাই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করে।

ইমাম গাযালির মতে মানবাত্মার বাহ্যজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের ক্ষমতা রয়েছে। বাহ্যজগতের যাবতীয় কার্য ও বিষয়সমূহের অনুভূতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানবাত্মায় পৌঁছে। এ অনুভূতিকে আত্মা স্বীয় ক্ষমতায় জ্ঞানে পরিণত করে থাকে। গণিতবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব, শরী'আত ইত্যাদি বিদ্যা আত্মা অনুভূতিকে জ্ঞানে পরিণত করার ক্ষমতা বলে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। আত্মা সরল ও অবিভাজ্য হলেও এর মধ্যে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটতে পারে। আবার চিন্তাশক্তির সাহায্যে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে আকাশে উঠতে পারে। এক পলকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের ব্যবধান ও দূরত্ব নির্ণয় করতে পারে। গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী মৎস্যকে ডাঙায় উত্তোলন করতে পারে। হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি ক্ষমতাশালী জন্তুকে সুকৌশলে বশ করতে পারে। বুদ্ধি ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মা এ সমস্ত জ্ঞান লাভ করে থাকে। বিপরীতক্রমে, বাহ্য জগৎ ছাড়াও আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্ম ও গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানও আত্মা করায়ত্ত করতে পারে। মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম কৃপা যে, মানুষকে আল্লাহ জড়জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের সক্ষমতা দিয়েছেন।[১৯]

আত্মা কীসের জ্ঞান অর্জন করে

জ্ঞানের আধেয় (object) কী–এ প্রশ্ন দার্শনিকদের প্রাচীন কাল থেকে আকৃষ্ট করেছে কিন্তু সমকাল পর্যন্ত তাঁরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেননি। জগৎদৃষ্টি ও জীবনবোধের ভিন্নতার কারণে মতানৈক্য হওয়াই স্বাভাবিক। ইমাম গাযালি আমাদের বসবাসের বাহ্য জগৎকে একমাত্র জগৎ হিসেবে দেখেননি। তিনি বিভিন্ন ধরনের জগতের কথা বলেছেন। তাঁর মতে জগৎ বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, তাই জ্ঞানের আধেয়ও বিভিন্ন রয়েছে। তাঁর মতে জগৎ তিন ধরনের।[২০] যথা :

১. আলম ই মূলক বা মাহসুসাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গাহ্য বাহ্য জগৎ
২. আলম ই মালাকুত অর্থাৎ অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় জগৎ
৩. আলম ই জাবারুত অর্থাৎ মধ্যবর্তী জগৎ তথা চিন্তা, ইচ্ছা বা মনের জগৎ

রূপ-রস-গন্ধে ভরা আমাদের চারপাশের যে পরিবর্তনশীল জগৎ তা-ই আলমই মূলক বা মাহসুসাতের জগৎ অর্থাৎ বস্তুজগৎ বা অবভাসিক জগৎ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এ জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের আধেয় হচ্ছে বস্তু জগৎ বা অবভাসিক জগৎ।

এ জগৎ-জীবনে কতিপয় প্রত্যয় রয়েছে যা আমাদের জীবনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহতার সাথে যুক্ত; কিন্তু এগুলো ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, স্পর্শ করা যায় না। এগুলো অদৃশ্য। যেমন:আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলি, আত্মা, ফেরেশতা, শয়তান, জান্নাত-জাহান্নাম, কবর, পুনরুত্থান দিবস ও পুনরুত্থিত হবার পরের ঘটনাবলি ইত্যাদি। এসব বিষয় অধ্যাত্ম। আত্মার সাথে এসবের সম্পর্ক নিবিড় এবং প্রত্যক্ষ। এ সবের জগৎকে ইমাম গাযালি আধ্যাত্মিক জগৎ বলে অভিহিত করেছেন। এ জগৎ অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী। এ আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান হচ্ছে আত্মার জ্ঞানের আধেয়।

আরেকটি জগৎ হচ্ছে আলম-ই জাবারুত অর্থাৎ মধ্যবর্তী বা মনোজগৎ। বুদ্ধি (reason), ইচ্ছা (রিষষ), শক্তি (power) ইত্যাদি এ জগতের হাতিয়ার। এ হাতিয়ার বা বৃত্তি দিয়ে উপর্যুক্ত দুটি জগৎ অর্থাৎ আলম-ই-মূলক এবং আলম-ই মালাকুত-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। এ জগতের বৃত্তি বা কৌশলগুলো বাহ্য জগতের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মানুষ একদিকে যেমন একটি জৈবিক সত্তা অন্যদিকে আবার একটি আধ্যাত্মিক সত্তা। কেননা মানুষ দেহ ও আত্মা এ দু'টি উপাদানে গঠিত। দেহকে যেমন তার সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির আলোকে পরিপোষণ করতে হয়, তেমনি আত্মার স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং আত্মার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের নীতিতেও তাকে দৃঢ় থাকতে হয়। দেহের সাথে বাহ্য জগতের আর আত্মার সাথে অধ্যাত্ম জগতের সম্পর্ক নিকটতম। এ দু জগতের উপকারী জ্ঞান মানবকল্যাণে নিবিষ্ট করা আলম ই জাবারুতের উদ্দেশ্য।

কীভাবে জ্ঞান অর্জিত হয়

ইমাম গাযালি (র.) জ্ঞানের উৎপত্তি হিসেবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রাধিকার তথা ওহী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সুন্নাহ, মরমি অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে স্বীকার করেন। এর একেকটি একেক ধরনের জ্ঞান প্রদান করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতার জ্ঞান প্রদান করে। আর বুদ্ধি সার্বিকীকরণ ও প্রত্যয় গঠন করে, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশেষ থেকে সাধারণ, বৈচিত্র্য থেকে ঐক্য গঠনের জ্ঞান প্রদান করে। কুরআন এবং সুন্নাহ ইহকাল ও পরকালের সত্য জ্ঞান প্রকাশ করে। মরমি অভিজ্ঞতা মরমি সাধকের নিকট আধ্যাত্মিক জগতের সত্য উন্মোচন করে।[২১] আমরা এখানে জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস, তাদের প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি আলোচনা না করে, কেবল আত্মপরিশুদ্ধির সাথে যে জ্ঞানের সম্পর্ক তৎবিষয়ে আলোচনার পরিধি সীমিত রাখবো।

পরিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মায় আধ্যাত্মিক জগতের বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয় যেমন স্বচ্ছ আয়নার সামনে বস্তু রাখলে আয়নায় ঐ বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয়। ইমাম গাযালির মতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দুই ধরনের। ইলমুল মু'আমালা ও ইলমুল মুকাশাফা।

ইলমুল মু'আমালা হচ্ছে অন্তরের ভাল ও মন্দ অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানের বিদ্যা। অজান্তেই স্বীয় মনে কতিপয় মন্দ প্রত্যয় বিরাজ করতে পারে। যেমনঃ দারিদ্র্যের ভয়, তাকদীরের প্রতি অসন্তোষ, হিংসা-দ্বেষ পোষণ, বড়ত্ব অন্বেষণ, প্রশংসা কামনা, সাংসারিক ভোগ-বিলাসের জন্য দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ, হিংস্রতা, লোভ, কৃপণতা, লালসা, ধনবানদের সম্মান আর গরীবদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য পোষণ, অনর্থক চিন্তা, বেশি কথা বলতে পছন্দ করা, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চাকচিক্যময় পোশাক পরা, ধর্মীয় কাজে উদাসীন থাকা, অন্যের দোষ অন্বেষণ, জীবনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া, অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকা, অপমানবোধ করলে কঠোরভাবে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়া, সত্য বিষয়ের প্রতিশোধে নিরুদ্দ্যম হওয়া, কেবল ইবাদতের উপর ভরসা করা, প্রতারণা-ছলনা করা, কঠোর প্রাণ হওয়া, রূঢ়ভাষী হওয়া, বৈষয়িক কাজে বেশি ব্যস্ত থাকা, পার্থিব কাজের ব্যর্থতায় কাতর হওয়া, জুলুমের মানসিকতা থাকা, লজ্জা-শরম কম থাকা, নির্দয় ও নিষ্ঠুর হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই অন্তরের মন্দ অবস্থা। এসব মানসিকতা সকল পাপাচারের মূল। এসবের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার জানা ইলমুল মু'আমালার অন্তর্গত। আবার অন্তরের রয়েছে কতিপয় ভালো অবস্থা। যেমন সবর, শোকর, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সংসার বর্জন, আল্লাহভীতি, অল্পেতুষ্টি, দানশীলতা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা, আল্লাহর নিকট উত্তম প্রত্যাশা করা, সৎভাবে জীবনযাপন করা, সততা ইত্যাদি। এগুলোর স্বরূপ জানা, অর্জনের উপায় জানা, এগুলোর ফলাফল ও আলামত চেনা, এগুলোর উত্তরোত্তর শক্তিশালী করার উপায় জানা প্রভৃতি ইলমুল মু'আমালার অর্ন্তভুক্ত।[২২]

অপরটি হচ্ছে ইলমুল মুকাশাফা। এটিকে ইলমে বাতেনও বলা হয়। এ জ্ঞান মরমি সাধকের জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অন্তরাত্মা মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে, অন্তরে একটি ঐশী নূর বা আলোর সৃষ্টি হয়। এ আলোর প্রভায় মানব অন্তরে গূঢ় রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সকল দ্বার উন্মোচিত হয়। পূর্বে যেসব বিষয় কেবল শ্রুত ছিল, অস্পষ্ট ছিল, যেসবের কেবল বর্ণনা জানা ছিল, এ নূরের প্রভাবে সেসব বিষয়ের এখন সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, মহান আল্লাহর মা'রিফাত অর্জিত হয়, আল্লাহর গুণাবলি ও কর্মের জ্ঞান অর্জিত হয়। তাওহীদ বা আল্লাহর গুণাবলি ও কর্মের জ্ঞান অর্জিত হয়। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব স্বরূপে তার নিকট

উদ্ভাসিত হয়। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ঘাঁটিসমূহ এবং সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়। নবুওয়ত, নবীর অর্থ, ওহী, ফেরেশতা ও শয়তানের প্রকৃতি, মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার অবস্থা, নবীদের নিকট ওহী অবতরণের অবস্থা, আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা, ইলহাম ও শয়তানের কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য , জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব, পুলসেরাত, মীযান ও হিসাবের পরিচয়, হিসাব দিবসে আমলনামার স্বরূপ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁকে দেখার অর্থ, তাঁর নৈকট্যশীল হওয়া ও প্রতিবেশি হওয়ার উদ্দেশ্য, জান্নাতীদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য হওয়া ইত্যাদি অন্তরের এ নূরের কারণে প্রত্যক্ষ করা যায়।[২৩]

কিন্তু অন্তর রুগ্ন ও অসুস্থ হলে তাতে নূরের প্রাপ্তি ঘটে না। ইমাম গাযালি (র.)-এর মতে, কারো অন্তর যদি তার মূল কাজ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, তার অন্তর রোগাক্রান্ত। অন্তরের মূল কাজ হচ্ছে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মা'রিফাত, মহব্বত, ইবাদত, আল্লাহর যিকির প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তিময় আনন্দ পাওয়া এবং নফসের খায়েশের উপর এ আনন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া। একই সাথে একাজে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়োজিত করা।[২৪] আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী একজন মুসলিমের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবকিছুর প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন–– (হে নবী আপনি তাদেরকে) বলুন, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, সমাজ, অর্থসম্পদ-যা উপার্জন কর, ব্যবসায়-বাণিজ্য-যার মন্দার ভয় কর এবং বসবাসের স্থান–যা তোমাদের পছন্দনীয়–ইত্যাদি যদি তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা অপেক্ষা, তবে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।[২৫]

তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)কে প্রাণাধিক প্রিয় না বানিয়ে পারে না। মা'রিফাতের জন্য সে ব্যাকুল থাকে। প্রেমাস্পদের পরিচয়, সাক্ষাৎ, দর্শন ও সান্নিধ্য লাভের জন্যে সে উন্মাদবৎ হয়ে যায়। আত্মা হতে আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান লাভের ব্যাকুলতা বিলুপ্ত হলে বুঝতে হবে সে আত্মা রোগগ্রস্ত। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাদ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকলে, অথবা সে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করলে, সে রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। উপযুক্ত চিকিৎসা করে খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস ফিরিয়ে আনা না হলে সে যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞান বিমুখ আত্মা, আল্লাহর মা'রিফাতে অনাসক্ত, রোগগ্রস্ত আত্মা যদি তত্ত্বজ্ঞানের অনাসক্তি নামক রোগ দূর করে আল্লাহর মা'রিফাত লাভের স্পৃহা জন্মাতে না পারে, তাহলে পরলোকে এ আত্মা হতভাগা হয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট আযাব ভোগ করবে।[২৬]

ইমাম গাযালির মতে, আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জনের উপায় ৩টি।[২৭] যথা :

ক) নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে
খ) মৃত্যুর পর চাক্ষুষভাবে
গ) জীবিতাবস্থায় এলহামের মাধ্যমে

ক) নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে

নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদি প্রায় বন্ধ থাকে। আর আত্মার অন্তর্জ্ঞানের দ্বার আধ্যাত্মিক জগতের দিকে উন্মুক্ত থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের কিছু আশ্চর্য বস্তু এবং লওহে মাহফুজের মধ্যস্থিত অজ্ঞাত ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কিছু কিছু বিষয় পবিত্র ও পুণ্যাত্মাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কখনও কখনও স্বপ্নে অজ্ঞাত বস্তু ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়; আবার কখনও কখনও সাদৃশ্য বা উপমা স্বরূপ বস্তু বা বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। এ অবস্থায় স্বপ্নের তা'বীর বা তাৎপর্য বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। তবে নবী-পয়গম্বরদের স্বপ্ন সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে।

খ) মৃত্যুর পর চাক্ষুষভাবে

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ বাহ্য জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। জড়জগৎ হতে মানুষের মধ্যে তখন কোন তথ্য আসে না। তখন আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আত্মার জ্ঞানদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়। আত্মা ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে তখন আর কোন পর্দা থাকে না। এ অবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় রহস্য আত্মার নিকট উন্মোচিত হয়। যেমন আল্লাহ বলছেন–"আমি তোমা হতে পর্দা উঠিয়ে নিয়েছি, তাই আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর হয়েছে।"[২৮]

গ) জীবিতাবস্থায় এলহামের মাধ্যমে

জাগ্রতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান কখনও কখনও আত্মায় এসে থাকে। কখনও কখনও মানবমনে সদ্ভাবের উদয় হয়। এটাই এলহাম। আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় মন্দ স্বভাবকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়; কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে; বাহ্যিক জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে; আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকে এবং তার অন্তরে আল্লাহ ব্যতিত কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে–এ অবস্থায় আত্মার অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধিত হয়। এমতাবস্থায় আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে তার

মনে সদ্ভাবের উদয় হয়। এটিই এলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। নবী-পয়গম্বরদের মধ্যে কোন ধরনের সাধনা ব্যতিতই এলহাম হতে পারে। আবার আল্লাহ যে কোন অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির মধ্যে এলহাম দিতে পারেন।[২৯]

তাকওয়াপূর্ণ অন্তরে ইলমে বাতেনের বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর মন্দ স্বভাবের দমন এবং সৎস্বভাবের পরিপোষণের মাধ্যমে তা পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়। এ মঞ্জরিত অন্তর পূতঃপবিত্রতার প্রভায় পরিণত হয় একটি স্বচ্ছ আয়নায়। এ অন্তর আয়নায় লাওহে মাহফুজে চিত্রিত ঘটনাবলি থেকে কতিপয় ঘটনা বা তথ্য ক্ষণকালের জন্য প্রতিফলিত হয়। লাওহে মাহফুজ এমন একটি সুরক্ষিত ফলক, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয় চিত্রিত আছে। এই ফলক থেকে অন্তরের উপর জ্ঞান এমনভাবে প্রতিফলিত হয়, যেমন এক আয়নার ছবি অন্য আয়নায় প্রতিফলিত হয়।[৩০]

তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে আয়নায় বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয় না। ইমাম গাযালি পাঁচটি প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন। এক, আয়না মানসম্মত না হওয়া, অপূর্ণ হওয়া। দুই, ময়লা জমে থাকা। তিন, বস্তুটি আয়নার সম্মুখে না থাকা, কোন পাশে বা পেছনে থাকা। চার, বস্তু ও আয়নার মাঝখানে কোন পর্দা থাকা। পাঁচ, বস্তুটির অবস্থান ও দিক জানা না থাকা। এরূপ আয়নার ন্যায় অন্তরের জ্ঞান প্রতিফলিত হওয়ার ব্যাপারেও পাঁচটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, অন্তর অসম্পূর্ণ হওয়া। যেমন–শিশুর অন্তর। এ অন্তর ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে জ্ঞেয় বস্তু প্রতিফলিত হয় না। দ্বিতীয়ত, গুনাহ ও পাপাচারের ময়লা। গুনাহের কারণে অন্তরে মরিচা পড়ে, কালিমালিপ্ত হয়। ফলে অন্তরের ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায়। পাপাচারের ময়লা দূর করে অন্তর পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এ অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হয় না। তৃতীয়ত, জ্ঞাতব্য বস্তুর প্রতি বিমুখ হওয়া। এমন অন্তর সত্যপরায়ণ, ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে, আবার জীবিকা অন্বেষণ ও পার্থিব কার্যাবলিতে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু এ অন্তর তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষী নয়; বরং, অন্য কিছুর কল্পনায় মগ্ন থাকে, যে বিষয়ের কল্পনায় মগ্ন থাকে সে বিষয়ই এ অন্তরের নিকট উদঘাটিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান এ অন্তরে ধরা দেয় না। চতুর্থত, অন্তর ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মাঝে পর্দা থাকা। পিতৃপুরুষের অনুসরণ অথবা কোন বিষয়ের প্রতি সুধারণার কারণে শৈশব থেকে সে বিষয়টি অন্তরে জগদ্দল পাথরের ন্যায় থাকে। এ অন্তর তার এ বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীত কিছু উদঘাটন করতে পারে না। এ কারণে অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক এবং বিভিন্ন মতের বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি থেকে দূরে রয়েছেন। এ অন্তর সৎকর্মপরায়ণ এবং অন্য বহু বিষয় পারদর্শী। অন্য বিষয়ের প্রতি নিমগ্নতা এ অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর্দা হিসেবে

কাজ করে। পঞ্চমত, বস্তুর উল্টো দিকে আয়না রাখা হলে তাতে বস্তুর ছবি পড়বে না । অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আত্মার একটি সুনির্দিষ্ট সাধন-পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। পদ্ধতিটি যদি তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনুকূল না হয়, বিপরীতধর্মী হয়, তাহলেও অন্তরাত্মার তত্ত্বজ্ঞান প্রতিফলিত হবে না।[৩১]

মানুষের অন্তরাত্মার রয়েছে অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। মানুষ তার মন্দ স্বভাবের দ্বারা এ ক্ষমতাকে নষ্ট করে ফেলে। তখন অন্তরে নূর বা আলোর পরিবর্তে অজ্ঞতা ও অন্ধকার সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ বলেন–"নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। তবে বক্ষঃস্থিত অন্তর অন্ধ হয়।"[৩২] একটি হাদীসে বিশ্বনবী (স.) মানবাত্মার জ্ঞানগত সক্ষমতার কথা বলেছেন এভাবে:"যদি আদম সন্তানের অন্তরের চারপাশে শয়তানগুলো ঘোরাফেরা না করত, তাহলে সে আকাশের ফেরেশতা ও রহস্যাবলি সরাসরি অবলোকন করতে সক্ষম হত।"[৩৩]

মানুষ ত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা তদবির করতে পারে। আত্মপরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের মুজাহাদা, রিয়াযত ও সাধনা করতে পারে। মন্দ স্বভাব দমন এবং সৎ স্বভাব অর্জন করতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর কৃপা না হলে সে তত্ত্বজ্ঞান লাভে ধন্য হতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহ হলেই সে মা'রিফাতের আলোয় প্রদীপ্ত হয়। তবে ইসলামের বিধি-বিধানের উপর দৃঢ়পদ থাকা মানব সৌভাগ্যের নির্দেশ করে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা–"আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি ঐশী জ্যোতিতে নিপতিত থাকে।"[৩৪]

ইমাম গাযালির মতের পর্যালোচনা

ইমাম গাযালি (র.) তত্ত্বজ্ঞান লাভের পাত্র হিসেবে মানবাত্মার উপযোগিতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তিনি মানবপ্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখা-বিশ্লেষণ করেছেন। একটি পাত্রে মধু বা কোন খাবার রাখতে চাইলে, পাত্রটিকে প্রথমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। খাবার সংরক্ষণের জন্য পাত্রটি মজবুত কি-না, কোন ছিদ্র আছে কিনা অথবা নিকটতম সময় পাত্রটি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি যাচাই করতে হয়। আবার ভেতরে ময়লা আছে কি না তা পরখ করতে হয়। ময়লা থাকলে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করতে হয়। খাবার রাখার পর পাত্রটি উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হয়। পাত্রটি ছিদ্র হয় কি না, বাহির থেকে কোন দূষিত পদার্থ পাত্রে প্রবেশ করে কি না, পাত্রে রাখা বস্তুটি সজীব বা প্রাণবাহী হলে সেটি রোগাক্রান্ত হচ্ছে কি না, অথবা পরিমিতভাবে সুস্থতার সাথে সেটি বিকশিত হচ্ছে কি না ইত্যাদি সতর্কতার সাথে

পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং প্রয়োজন মাফিক পরিচর্যা করতে হয়। এ প্রক্রিয়ায়ই পাত্রে রাখা বস্তুর সংরক্ষণ, বিকাশ ও উৎকর্ষ এবং তা দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধি সম্ভব হয়। এভাবেই ইমাম গাযালি (র.) মানবাত্মাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তথা বিশুদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, বিকাশ ও উৎকর্ষ এবং তা দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্য তথা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সক্ষমতা দেখিয়েছেন। ময়লা দূর করা মানে আত্মার মন্দস্বভাবগুলো দূর করা, পাত্র এবং পাত্রস্থিত বস্তুর সতর্ক পর্যবেক্ষণ মানে সাধনার মাধ্যমে আত্মার সৎস্বভাবগুলো পরিপোষণ ও বিকাশ সাধন এবং প্রয়োজন মাফিক পরিচর্যা মানে আত্মাকে দূষিত না করে সৎস্বভারের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মাকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ততায় দৃঢ়ভাবে বহাল রাখা বোঝায়।

প্রত্যেক শিশুই সৎস্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, পরিবার ও সমাজ প্রভৃতির প্রভাবে তার মধ্যে মন্দ স্বভাবের উপাদানসমূহ প্রবিষ্ট হয়। কিছু কিছু সৎ স্বভাবেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে মন্দ স্বভাবের ব্যাপ্তির কারণে সৎস্বভাব আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। মন্দ স্বভাব খুব সহজে মানবমনে তার আশ্রয়স্থল পেয়ে যায়। কেননা মানবপ্রকৃতিতে রয়েছে ভাল-মন্দ সংঘটনের প্রবণতা। এ প্রবণতায় শয়তান ইন্ধন দিয়ে মানুষকে মন্দ কর্মে অনায়াসে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়। এতদ্ব্যতীত রূপ-রস-গন্ধে ভরা বাইরের চাকচিক্যময় ও মোহনীয় জগৎ তার মন্দ স্বভাবের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে ভূমিকা রাখে। ফলে মানবের মধ্যে লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ-হিংস্রতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, যশ-খ্যাতি প্রাপ্তি ও শোষণের মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচার-আচরণ, লেন-দেন ও পারস্পরিক মিথ স্ক্রিয়ায়। স্বভাব-চরিত্রে সে ইতর প্রাণী, কুকুর ও শূকরে পরিণত হয়ে যায়। ইমাম গাযালি (র.) মানবপ্রকৃতির এ মন্দ স্বভাবগুলোর প্রখরতা সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। একই সাথে তিনি মানবাত্মার একটি পরিচালকগুণের উল্লেখ করেছেন। আর সেটি হচ্ছে 'কুওয়াতে আদল' তথা মধ্যপন্থা বা ভারসাম্য স্থাপনকারী শক্তি। এ শক্তি কাম-ক্রোধ-লাভ ইত্যাদির অতিরঞ্জন ও স্বল্পতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। ফলে মানুষ হয়ে উঠে সচ্চরিত্রবান ও উত্তম ব্যক্তিত্বমাধুর্যে সুশোভিত একজন মানুষ। ইমাম গাযালির মানবপ্রকৃতির এ চিত্রায়ন যথার্থ ও সঠিক। একজন মানুষ যদি তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী নাও হয় অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ হয়, তবুও তাকে স্বভাবের মন্দ রিপুগলো পরিত্যাগ করতে হবে। এ রিপুগলো বিদ্যমান থাকলে শরী'আতের বিধি-বিধানের পালনও যথার্থ ফলপ্রসূ হয় না। কাম-ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ মানুষের পুণ্যগুলোকে নিঃশেষ করে ফেলে। অর্থাৎ একজন নামাজ রোজা ও

দান-খয়রাতের মাধ্যমে যে পুণ্য অর্জন করে তা আবার কাম-ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ ইত্যাদির মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়। অন্য দিকে এ মন্দ রিপুগুলো মানুষকে গুণাহ ও পাপকার্যে লিপ্ত করে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যকে খুন করে, লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করে, কামের বশবর্তী হয়ে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ এ রিপুর কারণে সমাজে অনৈতিকতা, অন্যায়-অপকর্ম এমনকি নির্যাতন-শোষণের ঘটনারও সয়লাব ঘটে। তাই মানবস্বভাবের মন্দ রিপুর দমন ও নিয়ন্ত্রণ কেবল তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়; বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সুষ্ঠুজীবনের জন্যেও অপরিহার্য। এ থেকে বলা যায় যে, ইমাম গাযালি (র.) মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ, মানবপ্রবণতার মন্দ রিপুর দমন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দিশা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক, সৎচরিত্রবান ও সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হতে শিখিয়েছেন।

বাহ্য জগতের অনুভূতি প্রাপ্তির জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় ত্রুটিযুক্ত হলে সঠিক অনুভূতি পাওয়া যায় না। আবার সার্বিকতা, সম্প্রত্যয়, বিমূর্ততা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্যে বুদ্ধির সক্ষমতা প্রয়োজন। বুদ্ধি অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত হলে (যেমন শিশু ও উন্মাদ) জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। বাহ্য জগৎ ছাড়াও আরেকটি জগৎ আছে যেটিকে বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। ইমাম গাযালি এটিকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলে অভিহিত করেছেন। এটিকে কলব বা অন্তরাত্মা দিয়ে জানা যায়। এ জন্য কলব বা অন্তরাত্মার সক্ষমতা প্রয়োজন। এ সক্ষমতার নাম হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি। অপবিত্র ও অপরিশুদ্ধ আত্মায় আধ্যাত্মিক জগৎ তথা আল্লাহ, আত্মা, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির জ্ঞান উন্মোচিত হয় না। ইমাম গাযালি (র.)-এর জ্ঞানতত্ত্বের এটি একটি সার্থকতা যে, তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। আর এর মাধ্যম হচ্ছে কলব বা হৃদয়বৃত্তি। আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টিকারী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট সত্তার জগৎ তথা অধ্যাত্ম জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি হৃদয়বৃত্তির অপার ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। তাঁর বিচারবাদী পদ্ধতির অপারগতার কারণে তিনি এ জগতের জ্ঞান লাভ করতে পারেননি–এ কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। আবার জড়বাদী, প্রকৃতিবাদী, ভাষা দার্শনিকসহ অনেকে আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সক্ষম হননি।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সমকালীন বিশ্বখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইকবাল আধ্যাত্মিক জগৎ, মরমি অভিজ্ঞতা এবং হৃদয়বৃত্তির অপার ক্ষমতা স্বীকার করেন। এসব ক্ষেত্রে

ইমাম গাযালির সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, ইমাম গাযালি মরমি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার নির্ভরতা ব্যতিরেকে ধর্মের স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং ইমাম গাযালি মরমি অভিজ্ঞতায় অসীমের রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন বলেও তিনি মনে করেন।[৩৫] আল্লামা ইকবালের এ মন্তব্য যথার্থভাবেই সঠিক। আল্লামা ইকবাল এও মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম গাযালি স্বজ্ঞা তথা মরমি অভিজ্ঞতায় অত্যধিক বিমোহিত হওয়ার কারণে মানবের চিন্তাশক্তিকে একান্ত সীমাবদ্ধ এবং তা চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ বলে মনে করেছেন। তাই তিনি চিন্তাশক্তি এবং স্বজ্ঞার মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভেদ রেখা এঁকেছেন। স্বজ্ঞা ও চিন্তাশক্তির মধ্যে যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে – তা তিনি অবলোকন করতে সক্ষম হননি।[৩৬] আমাদের মনে হয় "চিন্তাশক্তি চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ" এটি চিন্তাশক্তি সম্পর্কে ইমাম গাযালির মতের যথার্থ প্রতিফলন নয়। কেননা ইমাম গাযালি চিন্তাশক্তির অপার ক্ষমতা স্বীকার করেন। যেমন ইমাম গাযালি বলেন, "চিন্তাশক্তির সাহায্যে আত্মা এক মুহূর্তে পৃথিবী হতে আকাশে উঠতে পারে। এক নিমিষে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। এক নক্ষত্র হতে অন্য নক্ষত্রের ব্যবধান ও দূরত্ব নির্ণয় করতে পারে...।"[৩৭] চিন্তাশক্তি বলতে তিনি তাফাক্কুর অর্থাৎ ধ্যান-চিন্তনকে বুঝিয়েছেন। তাফাক্কুর হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ধ্যান ও চিন্তনের মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা উপলব্ধির শক্তি। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স.)-এর বর্ণনানুসারে মানুষকে আল্লাহ অজ্ঞানতা ও মুর্খতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন।[৩৮] এ অজ্ঞানতা ও মুর্খতার অন্ধকার ভেদ করার জন্য তার একটি আলোকের প্রয়োজন। এ আলোকের সাহায্যে সে তার চলার পথ নির্ধারণ করতে পারে, ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। স্থায়ী কল্যাণের দিকে ধাবিত হতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানের আলো ব্যতিত মানুষের এসব উপলব্ধি হয় না। আর তাফাক্কুর তথা ধ্যান-চিন্তন ব্যতিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাফাক্কুরের ফলে মানবের মাঝে ত্রিবিধ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক) মা'রিফাত বা তত্ত্বজ্ঞান (খ) 'হালাত' বা অবস্থান্তর (গ) আমল বা বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম। এদের মধ্যে বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম মনের অবস্থার অধীন। মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে কর্মোদ্যম সৃষ্টি না হলে বাহ্যিক ক্রিয়া-কর্ম ঘটে না। মনের অবস্থা আবার মা'রিফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের অধীন। আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তাফাককুর বা ধ্যান-চিন্তনের মাধ্যমে।[৩৯] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তত্ত্বজ্ঞান, মানসিক ঘটনা এবং বাহ্যিক

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গতি সৃষ্টি ইত্যাদির সাথে চিন্তাশক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এর থেকে বলা যায় যে, ইমাম গাযালি জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে চিন্তাশক্তিকেও সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাফাক্কুর, মরমি অভিজ্ঞতা বা হৃদয়ান্মোচনের ফলে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তা কি আদৌ জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান, না ভ্রান্তি উৎপাদক (delusory) মাত্র? আমরা সাধারণত এটা লক্ষ করি যে, সুস্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক অবস্থায় যে প্রত্যক্ষণ হয়, অস্বাভাবিক ও অসুস্থ অবস্থায় তার চেয়ে ভিন্নতর উপলব্ধি হয়। যেমন, তীব্র জ্বরে মানুষ প্রলাপ বকে। ভীষণ ভয় পেলে মুখ শুকিয়ে যায়, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কখনও কখনও বাকরুদ্ধ হতে দেখি। মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত হলে চারপাশে মহাসমুদ্র বা সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত অবলোকন করার কথা শুনেছি অনেকের কাছে। আবার মলিন বদনে, ছেঁড়া বসনে অনেকে নাকি রাজা-মহারাজা হয়ে ভবঘুরে হয়ে ঘুড়ে বেড়ায় রাজপথের সড়কে-সহাসড়কে। এ রকম মরমি অভিজ্ঞতায় ভাবাবিষ্টতার ফলে যে উপলব্ধি ঘটে তা স্বাভাবিক প্রত্যক্ষণ নয় বলে অনেকে মনে করেন। বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন যে, মরমি অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক উপলব্ধি, তাই একে ভ্রান্তি উৎপাদক (delusory) বিবেচনা করা উচিত। বার্ট্রান্ড রাসেল যুক্তি দেন যে, উপবাস থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন, বাহ্যিক প্রত্যক্ষণ থেকে সতর্কতার সাথে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিযুক্ত রাখা ইত্যাদি কারণে প্রত্যবেক্ষকের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, ফলে পর্যবেক্ষণও ভিন্নতর হয়। বিভিন্ন সাধনার কারণে মরমির শরীর ও মনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, যেমন শরীর ও মনে পরিবর্তন ঘটে একজন মদ্যপায়ীর, ফলে তার পর্যবেক্ষণ অস্বাভাবিক ও অবাস্তব হয়। এ কারণে মরমির পর্যবেক্ষণ ভ্রান্তি উৎপাদকের চেয়ে বেশি কিছু।[৪০] বার্ট্রান্ড রাসেলের এ যুক্তি সঠিক নয়। মদ্যপ, উন্মাদ বা শরীর ও মনের পরিবর্তনের কারণে পর্যবেক্ষণ অস্বাভাবিক হয়–– রাসেলের এ যুক্তি যথার্থ। কিন্তু "মরমি অভিজ্ঞতা ভ্রান্তি উৎপাদকের চেয়ে বেশি কিছু"–– এ মত সঠিক নয়। মদ্যপ, উন্মাদ এবং শরীর ও মনের পরিবর্তনের ফলে বিকৃত এবং ভ্রান্তি উৎপাদক পর্যবেক্ষণ ঘটে পদার্থিক জগৎ এবং আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতার জগৎ সম্পর্কে। কিন্তু মরমি অভিজ্ঞতা এ বাহ্য জগৎ সম্পর্কে নয়; বরং, অতীন্দ্রিয় জগৎ তথা আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে। আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞেয় বস্তু ও জ্ঞান নিঃসন্দেহে ভিন্ন কিছু।[৪১] বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্য সঠিক হত, যদি বাহ্য জগতের অভিজ্ঞতা লাভের যে মাধ্যম অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সেই একই মাধ্যম দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের কথা বলা হত। বাহ্য জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগৎ ভিন্ন। সেহেতু আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভের মাধ্যমও

ভিন্ন। আর সেটি হলো আত্মা। বাহ্য জগতের সাথে ইন্দ্রিয়ের সাদৃশ্য আছে, অন্য দিকে আধ্যাত্মিক জগতের সাথে আত্মার সাদৃশ্য রয়েছে। অতএব, উপযোগী মাধ্যম দিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের অভিজ্ঞতা ভ্রান্তি উৎপাদক নয়; বরং বাস্তবানুগ (veridical) হবে। সমকালীন অনেক চিন্তাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক মরমি অভিজ্ঞতার বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে সি ডি ব্রড, উইলিয়াম জেমস এবং আল্লামা ইকবাল উল্লেখযোগ্য।

সি ডি ব্রডের মতে, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির মধ্যে মরমি ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব আছে।ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এর প্রমাণ মেলে। এ অভিজ্ঞতায় বিভিন্নতা থাকলেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে মরমি অভিজ্ঞতাকে পৃথক করে। এ ধর্মীয় ও মরমি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ কতিপয় সত্তা (reality) অথবা সত্তার কতিপয় দিকের সংস্পর্শে আসে। ধর্মীয় ও মরমি অভিজ্ঞতা ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে তারা সত্তার এমন সংস্পর্শে আসতে পারে না।[৪২]

উইলিয়াম জেমস বিভিন্ন ধর্মানুসারী মরমিদের মরমি অবস্থা আলোচনার পর এটি দেখিয়েছেন যে, মরমি অবস্থাগুলো বিকাশের উঁচু স্তরে মরমির উপর কর্তৃত্ব করে। এ মরমি অবস্থাগুলো এক ধরনের সচেতনতা। এ মরমি অবস্থাগুলো কতিপয় বিষয়াবলি মরমির নিকট উন্মোচিত করে।[৪৩]

আল্লামা ইকবাল স্বয়ং একজন মরমি কবি ও দার্শনিক। তাঁর মতে, মানবজাতির ধর্মীয় ও মরমি অভিজ্ঞতা ঘাটলে এটা প্রমাণ হবে যে, মানব ইতিহাসে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এত বেশি স্থায়ী ও আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে বহমান যে, তাকে অলীক ও ভ্রান্ত নিরীক্ষণ (illusion) বলে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বরং, মরমি অভিজ্ঞতায় যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা অন্যান্য অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সত্যের মতই বাস্তব ও মূর্ত। কেউ যদি এ অভিজ্ঞতাকে আত্মিক, মরমি বা অতিপ্রাকৃতিক বলে অভিহিত করে, তাহলেও অভিজ্ঞতা হিসেবে এর কোন মূল্যহানি হয় না। কেননা এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় স্বজ্ঞা বা হৃদয়বৃত্তি দিয়ে। আর হৃদয়বৃত্তি রহস্যময় বিশেষ কোন বৃত্তি নয়। বরং, এটি হচ্ছে সত্তাকে জানার মোক্ষম মাধ্যম বিশেষ। এ অভিজ্ঞতা গ্রহণে স্বজ্ঞা ও হৃদয়বৃত্তির কেবল আধিপত্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই।[৪৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মরমি অভিজ্ঞতা তথা কলবের উন্মোচিত অবস্থা বা স্বজ্ঞা ভ্রান্তি উৎপাদক নয়; বরং বাস্তব সত্য প্রদায়ক।

ইমাম গাযালি (র.) অভিজ্ঞতাবাদীদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। আবার বুদ্ধিবাদীদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, সার্বিকীকরণ, প্রত্যয় গঠন ও বিমূর্ত জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়। আবার যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য তথা অবরোহ যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের বাক্যসমূহ অর্থপূর্ণ। এঁদের থেকে ইমাম গাযালির পার্থক্য এখানে যে, তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, এর বাইরেও আরেকটি বিশাল জগৎ আছে, যে জগৎ স্থায়ী ও অনন্ত। সে জগতের নাম আধ্যাত্মিক জগৎ। কেউ কেউ এ জগতের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ এ জগৎ স্বীকার করলেও এ জগতের জ্ঞান লাভ করা যায় না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা এ জগতের প্রকৃতি এবং এর জ্ঞান লাভের মাধ্যম আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। ফলে তারা এ পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে তাদের জ্ঞানের চৌহদ্দিকে সীমাবদ্ধ করেছেন। বিপরীতক্রমে, ইমাম গাযালি হৃদয়ের আলোকচ্ছটায় তাদেরকে আলো দেখানোর প্রয়াস পান। আর যুক্তিশীলতার সাথে এ বলে তাদেরকে প্রদীপ্ত করেন যে, তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও তোমার মাঝে একটি দীপশিখা আছে, এ দীপশিখা সৎস্বভাবের দ্বারা বিকশিত হতে হতে একটি পরিচ্ছন্ন সূর্যে পরিণত হয়। এ পরিচ্ছন্ন সূর্যের নাম হচ্ছে পবিত্র আত্মা। এ আত্মা ঐশী আলোয় দীপ্যমান। এ দ্বীপ্তির প্রভা বাধা-বন্ধনহীন। এর গতি অপরিমেয়। এ দীপ্তির গতি কেবল মহাদীপ্তির দিকে। আবার মহাদীপ্তিও যেন এ দীপ্তিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মহাদীপ্তির আকর্ষণে দেহাভ্যন্তরের দীপ্তি এক বিশালতায় বিচরণ করে। তখন এ দীপ্তির নিকট আধ্যাত্মিক জগতের মাঠ-ঘাট, অলি-গলি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন গূঢ়তত্ত্বের মহাজগতে সে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এ সসীম জগতে থেকেও সে হয়ে যায় অসীম জগতের বাসিন্দা। সসীমকে ছেড়ে অসীমের সান্নিধ্য তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে রাখে। সে তখন তার জীবনকে প্রলম্বিত ভাবে। তখন তার হৃদয় নয়নের সামনে আল্লাহ, আত্মা, জান্নাত, ফেরেশতা প্রভৃতি ঐশী সত্তা উন্মোচিত হয়ে যায়। সে তখন অপরূপ-অনুপম চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগের আশায় উদ্বেলিত থাকে। এ সবই সম্ভব হয় আত্মার পবিত্রতা অর্জন ও পরিশুদ্ধির কল্যাণে। ইমাম গাযালি (র.) এভাবে আত্মার পরিশুদ্ধির মাধমে তত্ত্বজ্ঞানার্জন এবং অনন্ত-অসীমের অভিযাত্রায় মানবকে প্রাগ্রসর করার পথ-পদ্ধতির দিশা দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ অভিযাত্রা ক্ষণস্থায়ী ও জীবনাবসানের মাধ্যমে শেষ হয় না; বরং চিরস্থায়ী স্বপ্ন বাস্তবায়নে মানুষকে বিভোর রাখে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, যাদের আত্মার পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় না, মরমি অভিজ্ঞতায় যাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, তারা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান কী করে লাভ করবে? এর একটি সহজ উত্তর হচ্ছে যে, তারা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করবে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং নবী (সা.)-এর সুন্নাহ থেকে। আবার প্রশ্ন হতে পারে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আল কুরআন ও সুন্নাহয় রয়েছে, তাহলে মরমি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কী? নিঃসন্দেহে আল কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহ, আত্মা, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, শয়তান, কবর, পুনরুত্থান, বিচারদিবস ইত্যাদির বিশদ আলোচনা রয়েছে। মরমি অভিজ্ঞতায় ইত্যাদি বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান, স্বরূপ ও বাস্তবতা উপলব্ধির চেষ্টা করা হয় মাত্র।

ইমাম গাযালি (র.) আয়নার সাথে আত্মার তুলনার চতুর্থ প্রতিবন্ধকতায় এটি দেখিয়েছেন যে, শৈশব থেকে মানবমনে কোন সুধারণা জগদ্দল পাথরের ন্যায় থাকলে অথবা তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতিত অন্য কিছুতে নিবিষ্ট থাকলে, তাদের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে তিনি মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন আকীদাগত বাদানুবাদে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করেছেন। ইমাম গাযালি (র.)-এর এ মত সঠিক নয়। অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত থাকলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। ইমাম গাযালি স্বয়ং একজন দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং সূফী। একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর লিপ্ততা নানা বিষয়ে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের একজন তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁর উক্ত উপমার বিপরীত উদাহরণ তিনি নিজেই। এটা সুবিদিত যে, মহানবী (স.), খোলাফায়ে রাশেদীন শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন, ইল্‌মচর্চা করেছেন। আবার পারিবারিক, সামাজিক জীবনযাপনও করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী। সাহাবা (রা.)দের বাণী ও তাবেয়ীদের রচনায় তাঁদের তত্ত্বজ্ঞানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে এটা হতে পারে যে, ইমাম গাযালির হয়ত বিপথগামী দার্শনিক ও ব্যক্তিবর্গকে বোঝাতে চেয়েছেন।

আবার প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ, আত্মা প্রভৃতি সত্তাকে কি মরমি অভিজ্ঞতায় স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়? মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহর জাত ও সিফাতকে স্বরূপে জানা যায় না। আল্লাহ নিরাকার এবং অসীম। তিনি প্রত্যক্ষের আওতায় আসলে সসীম ও সাকার হয়ে যান। বস্তু হয়ে যান। বস্তুর মতো কোন না কোন উপাদান ও বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে একটি সমগ্র হয়ে যান। এ সবই আল কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর জাত ও সিফাতের বিরোধী। আর আত্মা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর আদেশের কোন অবয়ব নেই। আল্লাহর সত্তার সাথে এর সাদৃশ্য। তাই এটিও

অদৃশ্য ও অস্পর্শ। তাই এর স্বরূপও উদঘাটন করা যায় না। আল্লাহও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এসব সম্পর্কে অত্যাল্প জ্ঞানই মানুষকে দান করা হয়েছে।[৪৫] ইমাম গাযালি (র.)ও এটি দাবি করেননি যে, আল্লাহর জাত, সিফাত, আত্মা ইত্যাদির স্বরূপ মরমি অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হওয়া যায়। মরমি অভিজ্ঞতায় কেবল সত্তাসমূহের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের। প্রেমের গভীর মহাসাগরের অতল গহবরে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের লীলাখেলা চলে। প্রেমিক সসীম, প্রেমাস্পদ অসীম। অসীম প্রেমাস্পদকে কাছে পাওয়া যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, আদর-যত্ন করা যায় না। কেবল তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও মহিমা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর গুণ–বৈশিষ্ট্য ও মহান দীপ্তির সান্নিধ্য উপভোগ করা যায়।[৪৬] এতেই প্রেমিকের মহানন্দ, মহা শান্তি। এ ভাবাবেগই তাকে প্রেমাস্পদের দীদার ও মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল রাখে, উন্মাদবৎ রাখে। প্রেমাস্পদকে প্রাপ্তির ব্যাগ্রতায় সে জগৎ-সংসার, দুনিয়া এমনকি নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যায়, কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, অভিজাত্য, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন এবং তা বহাল রাখার কঠোর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে অহর্নিশ। আর এর মধ্যেই সে 'সা'আদা আল হাকীকিয়াহ' তথা পরম সৌভাগ্য খুঁজে পেতে চায়।

এবার গাযালির 'জ্ঞান'-এর সংজ্ঞাটি বিচার করা যাক। ইমাম গাযালির (র.) মতে, "যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমন জানাকেই বলা হয় ইলম বা জ্ঞান।" আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহ, আত্মা ইত্যাদিকে স্বরূপে জানা যায় না। তাহলে যথার্থ অর্থে তত্ত্বজ্ঞানকে কী জ্ঞান বলা যায়? বাহ্যবস্তুর স্বরূপ আর অধ্যাত্ম বিষয়ের স্বরূপ অভিন্ন নয়। বাহ্যবস্তুকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়, পক্ষান্তরে অধ্যাত্ম বিষয়ের মাহাত্ম্য-মহিমা কলব তথা হৃদয়বৃত্তি দিয়ে উপলব্ধি করা হয়। অধ্যাত্ম বিষয়ের স্বরূপ এমন যে, তা কেবল উপলব্ধির বিষয়, তা ধরা ছোঁয়া বা গবেষণাগারের আধেয় নয়। যেমন–পানির স্বরূপই এমন যে, তাকে দা-বটি, তলোয়ার দিয়ে কেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আগুনের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তা থলে করে বহন করা যায় না বা পকেটস্থ করা যায় না। মানব শরীরে জ্বর হলে তা বাটখারা দিয়ে মাপা যায় না। কত কেজি বা কত মিটার জ্বর তা নিরুপণ করা যায় না। তা পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার নামক পারদখণ্ডটি ব্যবহার করতে হয়। অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের যন্ত্রটির নাম হচ্ছে কলব বা অন্তঃকরণ। তত্ত্বজ্ঞান কেবলই হৃদয়জাত। তাই তত্ত্বজ্ঞান কেজি, মিটার ডিগ্রি কিংবা তরল বা কঠিন পদার্থের মত নয়। এ কেবলই আত্মায় উপলব্ধ হওয়া ঐশী জ্যোতির ঝলক মাত্র।

এ ঝলকের ফলে অন্তরাত্মায় লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত তথ্যাদির অংশ বিশেষের উন্মোচন ঘটে মাত্র। এ জ্ঞান স্থায়ী হয় না। স্থায়ী হলে সালিক (আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমায় ভ্রমণকারী) উন্মাদবৎ হয়ে যায়, যেমনটি ঘটে ছিল মনসুর হাল্লাজের ক্ষেত্রে। যার প্রভাবে তিনি সদা নিজেকে 'আনাল হক' বলে জাহির করতেন। তবে তত্ত্বজ্ঞানের কিছু মাধ্যম এ বাহ্য জগৎ ও জীবন তথা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে তাফাক্কুরের মাধ্যমে অধ্যাত্ম জগতের মহিমা ও মাহাত্ম্য উন্মোচিত হয়। এ কথা আল্লাহ আল কুরআনে বলছেন এভাবে: "আমি তাদেরকে (মানুষদেরকে) বাহ্যিক জগতে এবং তাদের দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার (ক্ষমতার) নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে থাকি, যার ফলে গূঢ়তত্ত্বের বাস্তবতা তাদের নিকট উন্মোচিত হয়।"[৪৭]

'যথার্থ জ্ঞান'-এর বিষয়টিও বিচার করা যাক। ইমাম গাযালির মতে, যথার্থ জ্ঞান এমন কিছু যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কোন ভ্রান্তি বা অলীক অনুমানের অবকাশ থাকে না।" মরমি অভিজ্ঞতায় লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান নিতান্তই ব্যক্তি সাধকের হৃদয়জাত উপলব্ধি। তার সাধনার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তিনি অধ্যাত্মভাবে এ জ্ঞান লাভ করেন। এ জ্ঞান এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে পরিবহন করা যায় না। বর্ণনা দিয়ে অথবা আচার-আচরণ দিয়ে এর মর্মার্থ অন্যকে বোঝানো যায় না। তাই একজন অমরমি অথবা এক মরমি সাধক অন্য মরমি সাধকের মরমি অভিজ্ঞতাকে সন্দেহ করতে পারে। তাহলে তত্ত্বজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় কি? এছাড়া এ জ্ঞানের সত্যতা পরিমাপের কোন মানদণ্ড নেই। এখন পর্যন্ত মরমি অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার কোন পদ্ধতি প্রদান করা হয়নি, যা দিয়ে সত্যানুগ (veridical) মরমি অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্তি উৎপাদক ও অলীক মরমি অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করা যায়। অসংখ্য লোকের অভিজ্ঞতা, বারবার একই অভিজ্ঞতা, তীব্রতা, স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি বলে মরমি অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না।[৪৮] মরমি অভিজ্ঞতা নিতান্তই আত্মগত। এ অভিজ্ঞতা বিনিময় যোগ্য নয়। তাই এটি যাচাইযোগ্যও নয়। আল্লামা ইকবালের মতে – এ অভিজ্ঞতার মর্মার্থ কেবল অভিমত হিসেবে অন্যদের মধ্যে প্রকাশ করা যায়।[৪৯] অভিমতকে কিন্তু যাচাই করা যায়। অভিমত যদি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের স্পৃহার অনুরূপ হয়, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী না হয় এবং তত্ত্বান্বেষী যদি পরিপূর্ণরূপে শরী'আতের অনুসারী হয়, তবে এর সত্যতার সম্ভাবনার মাত্রা অত্যধিক বলে মনে করা যেতে পারে।

মরমি অভিজ্ঞতা ও তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের বেশ কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের তাড়নায় কেউ কেউ দুনিয়া ও সংসার বিমুখ হয়ে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করতে পারে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈধ দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে পারে। অথচ বৈরাগ্য জীবনের কোন অবকাশ ইসলামে নেই। দ্বিতীয়ত, তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণের নাম করে কেউ নিজের মনে একটা ভাবের জগৎ তৈরি করতে পারে। স্বীয় মনে কাল্পনিক ও মিথ্যা (factitious) ধারণার ভাবাবিষ্টতা সৃষ্টি করতে পারে। এ রকম অভিজ্ঞতার জগৎকে সে সঠিক মনে করে পথভ্রষ্ট হতে পারে। ইমাম গাযালিও এ রকম কিছু ভণ্ড সূফী ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তবে এ ভবঘুরে বৈরাগী এবং মরমি ভাবাবিষ্টতার ছদ্মবেশি ভণ্ড সূফীদের সহজেই শনাক্ত করা যায়। তাদের পথ-পদ্ধতি, সাধন-পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালি কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী এবং শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তাদেরকে ভূয়া তত্ত্বান্বেষী বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

উপসংহার

ইমাম গাযালি (র.) যেভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য, পথ-পদ্ধতি, মানুষের স্বভাব-চরিত্র চিত্রায়ন করেছেন তা মানব চিন্তন ও মরমি সাধনার ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ প্রসঙ্গে তাঁর তত্ত্বালোচনা, দিকনির্দেশনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যুক্তিশীলতা ইত্যাদির জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য অপরিসীম।

জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে তিনি এমন এক জগতের জ্ঞানান্বেষণের সম্ভাব্যতা ও সক্ষমতা দেখিয়েছেন, যে জগৎ এবং জগতের জ্ঞানান্বেষণ পাশ্চাত্যের ধীমান দার্শনিকদের কেউ কেউ অসম্ভব বলেছেন অথবা পুরো জগৎটাই অস্বীকার করেছেন। জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে তিনি হৃদয়বৃত্তি বা আত্মাকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় সবাই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এ আত্মা সাধনার মাধ্যমে বিকাশ ও উৎকর্ষের উঁচু স্তরে উপনীত হলে আধ্যাত্মিক জগৎ সরাসরি প্রত্যক্ষীভূত হয় আত্মার দর্পণে। নিঃসন্দেহে ইমাম গাযালির এ তত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্বে এক সুবিশাল দ্বার উন্মোচন করেছে।

মানবের স্বভাব-চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইমাম গাযালি এটি সুস্পষ্ট করেছেন যে, মানব স্বভাবের সাথে তাঁর নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মানবাত্মায় মন্দ স্বভাব নির্মূল না হলে তা অপরাধ ও অনৈতিক কর্মের কারণ হয়। কাম-ক্রোধ, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ নিঃসন্দেহে অন্যায়-অপকর্মের উদ্ভব ঘটায়।

বিপরীতক্রমে সাধনার দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমন এবং সৎস্বভাবের পরিপোষণের মাধ্যমে মানুষ সৎ, ন্যায় ও ভাল কাজ উৎপাদন করে। ফলে সমাজে নৈতিকতার বিস্তার ঘটে। আবার কুপ্রবৃত্তির দমন ও সৎস্বভাবের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতিত আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি সম্ভব নয়। আত্মার পরিশুদ্ধি না হলে মা'রিফাত তথা তত্ত্বজ্ঞান লাভও সম্ভব হয় না। এভাবে গাযালির তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, নৈতিকতা, আত্মপরিশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত।

আল কুরআন ও হাদীসে কুপ্রবৃত্তির বর্জন ও সৎস্বভাব অর্জনের যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে একজন মরমি কঠোর সাধনার মাধ্যমে এ বর্জন ও অর্জন একনিষ্ঠ চিত্তে আয়ত্ত করে। আবার কুরআন ও সুন্নাহয় তত্ত্বজ্ঞানের যে তত্ত্বালোচনা রয়েছে একজন মরমি তা মরমি অভিজ্ঞতায় চাক্ষুষ করার প্রয়াস পায়। এ চাক্ষুষ জ্ঞান তথা তত্ত্বজ্ঞানের বাস্তবতা উপলব্ধির মধ্যেই মানবের 'আস সা'আদা আল হাকিকিয়াহ' তথা পরম সৌভাগ্য নিহিত। ইমাম গাযালির তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা এখানে যে, তিনি এ আস সা'আদা আল হাকীকিয়াহর পথ-পদ্ধতি নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন দৃঢ় প্রতীতি ও যুক্তিশীলতার সাথে।

তথ্যসূত্র

১। Ghazali, Imam, *Ihya Ulumiddin,* trans. Maulana Fazulul Karim, Vol.3, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1982), pp.2-4.

২। আল কুরআন, ১৭:৮৫।

৩। ঐ, ৭:১৭২; ৩২:৯।

৪। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, অনু: নূরুর রহমান (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ২০১১), পৃ. ৩২।

৫। M. Umaruddin, *The Ethical Philosophy of al Ghazali,* (India: Aligarh; The Aligarh Muslim University press, 1962), p.88.

৬। গাযালি, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

৭। Ghazali, Imam, *Ihya Ulumiddin*, vol. 3, Op.cit, p. 11.

৮। Ibid, p. 57-58.

৯। আল কুরআন ২:২৬৯।

১০। ঐ, ৯১:৯-১০।

১১। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, অনু: মুহিউদ্দীন খান, ৩য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০১৮), পৃ. ২৩২।

১২। আল কুরআন: ৮৩:১৪।

১৩। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩–৩৪।

১৪। আল কুরআন, ৩৬:৬০; ৩৫:৬।

১৫। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৯–১৪।

১৬। গাযালি, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ৪র্থ খণ্ড, অনু: নূরুর রহমান (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ২০১৩, পৃ.১।

১৭। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

১৮। Ghazali, Imam, *al Munquid min ad-Dalal,* Eng. trans. Montgomery Watt (London : George Allen & Unwin Ltd. 1953), pp. 21-22, Quoted in *al Ghazali's Theory of Knowledge,* by Kawthar Mustafa (Dhaka : Ramon Publishers, 2003), p. 42.

১৯। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

২০। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩-২৭।

২১। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Mustafa, Kawthar, *al Ghazali's Theory of Knowledge,* op.cit, pp. 42 - 70.

২২। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৩। ঐ, পৃ, ৪৭।

২৪। ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।

২৫। আল কুরআন, ৯:২৪।

২৬। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

২৭। ঐ, পৃ. ৪২।

২৮। আল-কুরআন, ৫০ : ২২।

২৯। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৫।

৩০। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

৩১। ঐ, পৃ. ১৭৮-৮০।

৩২। আল কুরআন, ২২:৪৬।

৩৩। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৩৪। আল-কুরআন, ৩৯:২২।

৩৫। Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religions Thought in Islam* (Pakistan: Lahore; Ashraf Press, 1965 reprint), p. 5.

৩৬। Ibid.,

৩৭। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৩৮। গাযালী, ইমাম, *কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৩৯। ঐ,

৪০। Russell, Bertrand, *Relligion and Science*, (New York: Oxford University press), pp.187-88.

৪১। Rowe, William L., *Philosophy of Religion*. (California: Wadsworth Publishing company, Inc., 1978), p.73.

৪২। Broad, C.D., *Religion, Philosophy, and physical Research* (New York: Humanities Press, 1969), pp. 164.

৪৩। James, William, *The varieties of Religious Experience* (Collins Fountain Books, reprinted in 1977), p. 407.

৪৪। Iqbal, op. cit., p. 16.

৪৫। আল কুরআন, ১৭:৮৫।

৪৬। গাযালি, ইমাম, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৪৭। আল কুরআন, ৪১:৫৩।

৪৮। Hospers, John, An Introduction to Philosophical Analysis (New Delli: Allied Publishers Private Ltd., reprint-1983), p. 447.

৪৯। Iqbal, op.cit., p. 26.

নিবন্ধমালা: এয়োবিংশ খণ্ড, ডিসেম্বর ২০২২
উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লৌকিক উপাদান : 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এ

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী *

সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির ছাপ থাকবে–– এটা প্রায় ধ্রুব সত্য। আবার এরকমটা হওয়াও একভাবে অসম্ভব নয় যে প্রাচীন সাহিত্যেরই বিশেষ কোন বর্ণনীয় বিষয়, বাক্য বা বাক্যাংশ পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতিতে আত্মভূত হয়ে পড়েছে। 'মিথ' হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়। কালের ব্যবধান যদি বেশি হয়, সে-রকমটা হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আজ থেকে দু-হাজার বা ততোধিক বছরের প্রাচীন কোন গ্রন্থে (আলোচ্য ক্ষেত্রে কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'); লোকসংস্কৃতির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা তাই যথেষ্ট সাবধানতার অবকাশ রাখে।

সংস্কৃত নাটকের 'প্রস্তাবনা'র ভিতরেই, আমার ধারণা, লোকসংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যাবে। যেন চণ্ডীমন্ডপে সবাই জড়ো হয়েছে, একটু ঢিলেঢালা ভাব, হচ্ছে-হবে এইরকম পরিবেশ। তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হল–– এইরে, আর দেরী করলেতো রাত ভোর হয়ে যাবে। অতঃপর শুরু–– 'এই যে বাবু মশায়েরা! শুনুন' .... ইত্যাদি। কোর্ট-কালচার বলতে যা বুঝি এ তা নয়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' দেখুন। সূত্রধার হাঁক পাড়লেন–– 'এই যে গিন্নী, সাজগোজ হল? ভাবখানা এই–– 'তোমাদেরতো আবার সাজতে আড়াই ঘন্টা! আর কতক্ষণ? আমাকে দেখেও তো শিখতে পারো! টেরি কেটে, পাট ধুতি পরে, বাবুটি হয়ে বসে আছি ঘন্টাখানেক হল।' ––এইরকম পরিবেশ এবং বাচনভঙ্গী এবং অতঃপর সূত্রধার-পত্নীর প্রশ্ন–– 'এবার তাহলে কী করি' এবং তার উত্তরে সূত্রধার' একটা জমিয়ে গান হোক্–– এসবই 'লোক-কালচার'

* ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

('ফোক' কালচার)-এর ছবি তুলে ধরে। গানের বিষয়টাও দেখুন। মেয়েরা কানে শিরীষ ফুল গুঁজছে।[১] এটা কোন' 'কোর্ট কালচার' থেকে আসেনি। বর্ণনার ভেতরেই গ্রাম্য সোঁদা গন্ধ-- অঙ্গীকারের উপায় নেই। গান তো হল। সূত্রধার (গ্রাম্য মোড়ল গোছের লোক? কি ঝিমুচ্ছিলেন? গরমের দিন, বিকেলবেলায় ফুরফুরে হাওয়া। ঝিমুনির দোষ কী?[২] তা নাহলে তিনি বলবেন কেন-- হ্যাঁ, আজ কোন্ নাটক করব গো'? এক মিনিট আগে বলা কথা তিনি ভূলে যাবেন কেন? কালিদাস অবশ্য 'গীতরাগ'-এর আকর্ষণের কথা বলেছেন। তা তিনি বলুন।

রাজা মঞ্চে এলেন হরিণকে তাড়া করতে করতে। ঋষিরা বারণ করলেন। রাজা ধনু নামালেন। সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ-- 'তোমার একটা ছেলে হোক, যে সে ছেলে নয়-- রাজার বেটা রাজা-ছেলে'।[৩] এ-রকমটা হবার কথা নয়। 'যশস্বী হোন' 'দীর্ঘায়ু হোন'-- এইরকম আশীর্বাদে বিক্ষত রাজা। রূপকথার গল্পের পটভূমি না থাকলে এরকম আশীর্বাদ হয় না। এ যেন সেই গল্প-- এক রাজা ছিল, ঘরে ঘরে রাণী, ক্ষেত ভরা ধান, রাজকোষ মোহর-জহরত হীরেতে ঠাসাঠাসি। তবু রাজার মনে সুখ নেই। কেননা, তাঁর কোন ছেলে নেই। শেষকালে রাজা এলেন তপোবনে। ঋষি আশীর্বাদ দিলেন-- 'তোমার পুত্র হবে' ইত্যাদি। সুতরাং আমরা অনায়াসেই দুষ্যন্তের আশীর্বাদ--প্রাপ্তির পটভূটিতে লোকবিশ্বাসকে, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোকপ্রচলিত গল্পকে দেখতে পারি। আরো বলি-- ঋষিরা রাজাকে 'যশস্বী হোন', 'দীর্ঘায়ু হোন' ইত্যাদি না বলে হঠাৎই পুত্র প্রপ্তির আশীর্বাদ করতে গেলেন কেন? এমন তো হতে পারত, রাজার দশ-বিশটি সন্তান ঘর আলো করে আছে-- সেক্ষেত্রে ঐ আশীর্বাদের কোন মূল্যই থাকতো না। এমতাবস্থায় আমাদের ধরতেই হবে রাজার অপুত্রক থাকাটা এবং তার জন্য রাজার মনোব্যথার কথাটা রাজ্যে মুখে মুখে ফিরতো। সুতরাং রূপকথার সঙ্গে তা পুরো মিলে যায়।

শকুন্তলার সঙ্গে রাজার দেখা হল। দেখামাত্রই ভালোবাসা। অতঃপর রাজার কাছে-- 'কাম আমায় পোড়াচ্ছে' এই ধরনের প্রণয়পত্র পাঠানো[৪]-- সবই যেন রূপকথার পক্ষিরাজের গতিতে দ্রুত এগোচ্ছে। 'ক্লাসিকাল টাচ্' এতে বিশেষ নেই। বিয়ের আগেই দুষ্যন্তকে দিয়ে কথা আদায় করিয়ে নেওয়া (হোক না তা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মাধ্যমে) যে তাকেই রাজরাণী করা হবে এবং তার ছেলেকেই পরবর্তী রাজা মনোনীত করা হবে[৫]-- তাও যুগযুগান্ত প্রচলিত গল্পগাথার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ক্লাসিকাল বর্ণনার বিলাস এখানেও নেই।

শরীরের বিশেষ অঙ্গের স্পন্দন, বিশেষ বিষয় অবলোকন প্রভৃতি ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জ্ঞাপক-- এই লোকবিশ্বাসের বেশ কিছু নমুনা 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে ছড়িয়ে আছে। আশ্রমে রাজা ঢুকছেন; এমন সময় তাঁর দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন। রাজা বললেন-- এটা কী করে সম্ভব। আশ্রমে বরস্ত্রীলাভ কী ভাবে হতে পারে? ('শান্তমিদমাশ্রমেপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।')[৬] প্রশ্ন উঠতে পারে -- রাজারতো সম্ভাবনা নেই-- বললেন; তাহলে বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে কোথা থেকে? না তা নয়। রাজা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 'এখানে' অর্থাৎ 'এই তপোবনে' সুন্দরী জুটবে কোথা থেকে? জায়গা সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিস্ময়[৭]; দক্ষিণবাহু স্পন্দন থেকে সুন্দরী লাভ হবে কি হবে না-- এই বিষয়ে নয়। দৃঢ়মূল সংস্কার, লোকবিশ্বাস-- এসবের জন্ম দেয়। পঞ্চম অঙ্কেও শকুন্তলার-- (নিমিত্তং সূচয়িতা) 'অম্মহে, কিং মে বামেদরং ণঅনং বিপ্ফুরদি?' (অহো, কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি?)[৮] 'আমার ডান চোখ কাঁপছে কেন?'-- এই বেল ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার ছবি আছে। সপ্তম অঙ্কেও রাজা দুষ্যন্ত তাঁর বাহুস্পন্দনে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা পোষণ করেছেন-- যদিও ততটা সৌভাগ্য তাঁর জীবনে আবার ঘটবে-- একথা তাঁর বিশ্বাস হতে চাইছিল না। 'রাজা (নিমিত্তং সূচয়িত্বা)-- 'মনোরথায় নাশংসে কিং বাহো স্পন্দসে বৃথা। পূর্বাবধীরিতং শ্রেয়ো দুঃখং হি পরিবর্ততে।।'[৯] (দক্ষিণ বাহুতে স্পন্দন অনুভব করে ভাবী মঙ্গলের ইঙ্গিত লক্ষ করে) আমি আমার অভিলাষ পূরণের কোন আশা আর পোষণ করি না। সুতরাং হে বাহু, তুমি অকারণে স্পন্দিত হচ্ছ। ....' ইত্যাদি। রাজা দুষ্যন্ত বা শকুন্তলা নিমিত্তে (শুভাশুভ লক্ষণে) বিশ্বাস করেছেন-- শুধুমাত্র এটুকু বলেই মহাকবি কালিদাস ক্ষান্ত হননি। কালিদাস ঐসব নিমিত্তকে ভাবী শুভাশুভে পরিণত করিয়ে তবে বিশ্রাম নিয়েছেন। তার ফলে এই নাটকে লোকবিশ্বাসের বর্ণনাই নয়, তার অংশীদার যে স্বয়ং কবিও (কেবল তাঁর কল্পিত চরিত্ররাই নয়)-- তারও প্রমাণ মিলছে। এই জিনিসটাই বিশেষ করে লক্ষণীয়। রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল-- অথচ শকুন্তলা মিলল না কিংবা শকুন্তলার ডান চোখ কাঁপল-- অথচ রাজা তাকে সাদরে বরণ করলেন, এরকমটা ঘটলে লোকসংস্কারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও দৃঢ়মূল ভিত্তি থাকতো না সবকটিকে সবার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে কালিদাস লোকসংস্কারকে প্রায় কার্যকারণ সম্পর্কে রূপায়িত করে দিলেন। বর্তমান লেখকের ধারণা-- ক্লাসিকাল সাহিত্য এইভাবেই অনেক ক্ষেত্রে লোকসংস্কারকে বা বীজাকারে স্থিত লোকবিশ্বাসকে, সর্বজনীন এবং সার্বকালীন প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। কবিরা লোকসংস্কারের আশ্রয় করেন, আবার কবির কাব্যে লোকসংস্কার আশ্রয় দেয়। এ যেন পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। যে পুত্র বাল্যে পিতার কোলে স্নেহ পায়, পিতার বার্ধক্যে সে-ই আবার পিতার আশ্রয় হয়।

এবারে আসি অন্য প্রসঙ্গে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে তরুলতার নামকরণগুলি লক্ষ করলেও এর ভিতরে লোকসংস্কৃতির ছাপ মিলবে। গাছের নাম 'বনজ্যোৎস্না'।[১০] কিংবা, কোন এক সহকার বৃক্ষকে লতায় বেষ্টিত অবস্থায় দেখে এবং শকুন্তলাকে বারবার তার দিকে তাকাতে দেখে সখীদের মন্তব্য–– 'শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নার মত সুন্দর বর চায়' ('জহ বণজোসিণী অনুরূবেণ পাঅবেণ সংগদা অবি ণাম এব্বং অহং বি অত্তণো অণুরূবং বরং লহেঅং ত্তি।')[১১] ––এগুলি অবশ্যই গাছের সঙ্গে মানুষের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার (যা 'লোক-কালচার'[১২]-এর অন্যতম বহিঃপ্রকাশ) পরিচায়ক। প্রথম অঙ্কেই, উল্লিখিত অংশের একটু আগেই দেখছি প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলছে–– 'হল সউন্দলে, এথ এব্ব দাব মুহূত্তঅং চিট্ঠ। জাব তুএ উবগদাএ লদাসণাহো বিঅ অঅং কেসররূক্খও পডিভাদি।'[১৩] (এই যে শকুন্তলা, তুই একটুখানি ঐখানে দাঁড়া। বকুল গাছটার পাশে তুই দাঁড়ালে মনে হয় গাছটা তার প্রেয়সী লতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে)–– এইসব কথাবার্তায় তো আগেকার দিনের গাছের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার স্মৃতি ভেসে ওঠে। নাগর সভ্যতায় এ ধরনের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা (শহুরে লোকেরা অনেক সময় যাকে 'আদেখলেপনা' বলে থাকেন) থাকে না।

শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তকে পেতে চায়–– একথাটা রাজাকে জানতে হবে। কীভাবে জানানো যায়? সখীরা বুদ্ধি জোগায়–– শকুন্তলা একখানা প্রেমপত্র লিখে দিলে তারা তা দেবতার প্রসাদের ছলে রাজার হাতে পৌঁছে দেবে। সেই সিদ্ধান্তই গৃহীত হল। তা শকুন্তলা লিখবে কী দিয়ে? কীসের উপর লিখবে? 'ণ ক্খু সন্নিহিদাণি উণ লেহনসাহণাদি।'[১৪] প্রিয়ংবদা বলে–– 'ইমস্সিং সুওদরসুউমারে ণলিনীপত্তেনহেহিং ণিক্খিত্তবণ্ণং করেছি।'[১৫] (এতস্মিন্ শুকোদরসুকুমারে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্তবর্ণং কুরু।) ––'শুকপাখির পেটের মত কোমল এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে অক্ষরগুলো বসাও।' কোমলতা বা মৃদুতার (softness) উপমা দিতে শহুরে কবিদের বলুন : উত্তর আসবে–– 'মাখনের মত নরম', 'সিল্কের কাপড়ের মত নরম', 'স্পঞ্জের মত মৃদু' কিংবা বেশি হ'লে বিড়ালের মত নরম'। শুকপাখির পেটের তলার দিকে যে পালকগুলো থাকে, সেগুলো সব চাইতে কোমল। তার সঙ্গে পদ্মপাতার মৃদুতার উপমা তারাই বলে থাকে, যাদের হাতে শুকপাখি এসে বসে, সেই শুকপাখির কোমল স্পর্শের অনুভূতি যাদের আছে সেই লোকই এরকম উপমা দেবে। এরকম উদাহরণ আরো বহু আছে। প্রেমপত্র গোপনে পাঠানোর কায়দাতেও লোককাহিনীর ছায়া অবশ্যই চোখে পড়বে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে ভূত-প্রেত-রাক্ষসের উপদ্রব বারংবার এসেছে। লোকবিশ্বাসের, লোক-সংস্কৃতির অন্যতম পরিচয় বহন করে ঐসব কাহিনি। তৃতীয় অঙ্কের শেষদিকে আমরা দেখছি আকাশবাণীতে ধ্বনিত হচ্ছে–– 'সায়ন্তনে সবনকর্মণি সংপ্রবৃত্তে/বোদিং হুতাশনবতীং পরিতঃ প্রযন্তাঃ। ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ/ সন্ধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম্ ।।'[১৬] (সন্ধ্যাবেলার যজ্ঞ শুরু হতেই হোমাগ্নি জ্বলছে এবং যজ্ঞবেদির চারপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ভয়-জাগানো সন্ধ্যাকালের মেঘের মত পিঙ্গলবর্ণ রাক্ষসদের ছায়া নানাভাবে বিচরণ করছে।)–– এতো একেবারে রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনি ক্লাসিকাল নাটকে ঢুকল। রাজা দুষ্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ধনু হাতে তাদের বধ করতে ছুটলেন। রূপকথা আর রূপকথা–– রঙে-ঢঙে, বর্ণে-গন্ধে। আর একটা উদারহণ : রাজা দুষ্যন্ত অপুত্রক। বংশলোপ পাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর পিতৃ পুরুষদের শ্রাদ্ধান্ন কে দেবে–– এই চিন্তায় তিনি আকুল। তিনি প্রত্যক্ষ দেখছেন, তাঁর দেওয়া পিন্ডজল তাঁর পিতৃপুরুষেরা গ্রহণ করার আগে ভবিষ্যতে আর তাঁরা এসব পাবেন না ভেবে দুঃখে পিন্ডজল দিয়েই তাঁদের চোখ মুছে তারপর তা পান করছেন ('অস্মাৎ পরং বত যথাশ্রুতি সংভৃতানি/কোনঃ কুলে নিবপনানি নিযচ্ছতীতি। নূনং প্রসূতিবিকলেন ময়া প্রসিক্তং/ধৌতশ্রুশেষমুদকং পিতরঃ পিবন্তি।')[১৭] লক্ষণীয় যে, এই বিশ্বাস এমনই দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যে, রাজা দুষ্যন্ত মূর্চ্ছা গেলেন। (বর্তমান লেখক তার সম্পাদিত আলোচ্য নাটকের এই অংশে মন্তব্য করেছেন : 'রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার জন্য অনেক কেঁদেছেন .... কিন্তু মূর্চ্ছা যাননি; মূর্চ্ছা গেলেন পিন্ডলোপের ভয়ে, শকুন্তলার দুঃখে নয়। শকুন্তলাকে হারানোর কারণে .... রাজার এই দশার বর্ণনা হলে দুষ্যন্তের প্রেমের অবনমন হত বলে মনে হয় না)[১৮]। এই ষষ্ঠ অঙ্কেই মাতলির অদৃশ্য থেকে বিদূষককে আক্রমণ করে রাজাকে উত্তেজিত করার চেষ্টায়[১৯] কিংবা সানুমতীর অদৃশ্যভাবে রাজাকে অনুসরণ করার বর্ণনায়[২০] লোকগাঁথার পরিচয় অবশ্যই মিলবে।

সপ্তম অঙ্কের আকাশপথে রথে চড়ে স্বর্গ থেকে ফেরার বর্ণনাতেও[২১] রূপকথারই প্রতিবিম্ব।

এবারে আর এক দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই নাটকের নাম 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'। অনেকেই বলে থাকেন–– অভিজ্ঞানের দ্বারা স্মৃতা শকুন্তলা=অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। তারপর অন্যান্য ব্যাকরণের প্রক্রিয়ায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।' তা 'অভিজ্ঞান' কথার অর্থেতো স্মারক। দুর্বাসা কিন্তু অভিশাপের অবসান হবে স্মারক দেখালে '(অভিজ্ঞান' দেখালে) এমন কথা বলে নি (একথা কিন্তু অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়)। তিনি বলেছেন 'অভিজ্ঞান-আভরণ' দেখালে রাজার স্মৃতি উদিত হবে। ("অহিণ্ণাণাভরণ-

দংসণেণ সাবো নিবত্তিস্সদি।[২২] ––অভিজ্ঞানাভরণ-দর্শনেন শাপো নিবর্ত্তিষ্যতি–– অর্থাৎ অভিজ্ঞান আভরণ বা স্মারক-অলংকার দেখালে তবে শাপমুক্তি ঘটবে)। শকুন্তলা যখন রাজার কাছে এলেন তখন স্বয়ং শকুন্তলাই 'অভিজ্ঞান'। তার প্রতিটি পদক্ষেপ রাজার পরিচিত। শুধু পদক্ষেপ কেন! শকুন্তলার পায়ের ছাপের বৈশিষ্ট্য দেখে পর্যন্ত রাজা বলে দিতে পারতেন–– ওটা শকুন্তলার চরণচিহ্ন।[২৩] সেই 'পদচিহ্নকুশলী' রাজা সাবয়ব শকুন্তলাকে দেখেও চিনতে পারবেন না, তার বলা নিভৃত বেতসকুঞ্জের গোপন প্রণয়ের সুখস্মৃতি-জড়ানো ঘটনার বর্ণনায়ও[২৪] – তাঁর স্মৃতি জাগরিত হবে না–– কেবল আভরণ আংটি দেখে তবেই রাজার স্মৃতি ফিরে আসবে[২৫]–– এই যে ঘটনাটা, এটাতো পুরোপুরি একটা রূপকথার গল্প। আরো দেখুন–– আংটি ছিল শকুন্তলার হাতে। শচীতীর্থে স্নান করতে গিয়ে সেই আংটিটাই শকুন্তলা হারালেন, অতঃপর একটা রুই মাছ সেই আংটিটাকে আহার্য ভেবে খেয়ে ফেলল, অতঃপর সেই রুই মাছ জেলের জালে ধরা পড়ল, অতঃপর জেলে সেই আংটি বাজারে বিক্রি করতে গেল, অতঃপর জেলে সেটাকে কাটলো (বাজারে নিয়ে), ––অতঃপর তা পুলিশের চোখে পড়ল। (সোনারী অত্যন্ত দ্রুততায় পুলিশকে খবর দেওয়ায়, বুঝতে হবে)–– ইত্যাদি অসংখ্য অনিশ্চয়তার বন্ধন পেরিয়ে রাজার হাতে আংটি পৌঁছানো রূপকথা গল্পেই সম্ভব। যেখানে যুক্তিনিষ্ঠ হতে গেলে রসে বঞ্চিত হতে হবে–– পদে পদে। দুটো শামুককে একবার হ্যান্ডশেক (?) করিয়ে বিপরীতে মুখ করে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা সারা পৃথিবী পাক দিয়ে (থাকুক না মাঝখানে সাত সমুদ্র-তেরো নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল) আবার একদিন ঠিক একই জায়গায় এসে হাত মেলাবে–– এই রকম অনিশ্চয় অবাস্তবতার সঙ্গে এই আংটি পুনরুদ্ধারের বিশেষ তফাৎ আছে বলে মনে হয় না। যা স্বাভাবিক ছিল তা হল এইরকম–– আংটি হাত থেকে পড়ল। পাঁকের উপর খানিকক্ষণ রইল। তারপর পাঁকের আরো গভীরে, ব্যস্। দুষ্যন্তের শকুন্তলা পাওয়ার আশা শেষ (কিংবা বলা ভালো, শকুন্তলার দুষ্যন্তকে পাওয়ার সম্ভাবনা শেষ।) ঠিক আছে, মাছে না হয় খেল–– ওর 'রত্নগর্ভা' হবার শখ হয়েছিল। এটাও মেনে নিলাম–– জেলের জালেই সে ধরা পড়বে (মানুষের জন্য বলিপ্রদত্ত প্রাণী তো!)। বাড়িতে এনে মাছটাকে কেটে (এমনকী বাজারে নিয়ে কাটলেও) আংটিটাকে পেয়ে সে তার মেছুনী বৌয়ের কথাই প্রথম ভাববে–– এরকমটাই ভাবা সঙ্গত। তাও হল না। জেলেটা আবার এমনই গরীব যে সেদিনই তার আংটি বেচতে হবে–– এটাও না হয় মেনে নিলুম। মেয়েরা গয়না দেখলে জীবন থাকতে তা ছাড়বে না–– এই ভয়ে জেলে হয়ত ঘরের বৌকে আংটিটা দেখানো নিরাপদ মনে করেনি। কিন্তু আংটিটা বেচতে যখন গেল, তখন দোকানি জেলেকে দেখেই বুঝতে পেরেছে ওটা

জেলের আংটি নয়। এখন সে যা করবে, তা হল-- জেলেকে ভয় দেখিয়ে যত কমে পারে সেটাকে কিনবে (তবেই না ব্যবসায়ী!) এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য তৎক্ষণাৎ আগুনে গলিয়ে নেবে। এই ব্যাপারে বর্তমান লেখক একশ ভাগ নিশ্চিত আছে। দোকানি তা করল না। এই রকম 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' (কিংবা জাতক গল্পের 'সেরিবান') ব্যবসায়ী কোন যুগেই ছিল কি? (কোন কটাক্ষপাত নয়-- প্রচলিত প্রবাদ এই যে, সোনারীর লোভ এমনই যে, সে যখন নিজের আত্মীয়ের জন্যও গহনা প্রস্তুত করে, তখনও তাতে যতটা পারে বেশি খাদ মেশায়, ওজনে কম দেয়)। প্রশ্ন উঠতে পারে, জেলে সোনারীর কাছে আংটি বিক্রি করতে গেছে-- তার প্রমাণ আছে কি? উত্তর-- এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। সোনার আংটি সোনারীর কাছেই বিক্রি করতে যাবে, মুদির কাছে নয় (দোকানের সব মাল বেচলেও রাজার রত্নভাম্বর, 'লদনভান্ডলং'[২৬] আংটির দাম হবে না)-- এটাই স্বাভাবিক। যাই হোক, সোনারী ছিল 'সোনার চরিত্র', Golden Character-- এটা ধরে নিলেও পুলিশ কর্মচারিরা সেই আংটি গায়েব করে দেবে না-- এটাই বা কী রকম অন্যায় কথা! রুই মাছ আংটি না খেলেও খেতে পারে, তা'বলে পুলিশ খাবে না!! থাক এসব কথা-- যেটা প্রতিপাদ্য তা হল এই যে-- রাজার হাতে আংটি আসার ব্যাপারটা সম্পূর্ণই লোকগল্পের প্রবহমান ধারায় আগত। আর আংটি দেখা মাত্রই রাজার মনে শকুন্তলার স্মৃতি উদয়ের ব্যাপারে তুক-তাক করে 'নখদর্পণে' অতীত ঘটনা দেখার সঙ্গে কিংবা আয়নায় সময়কে পিছিয়ে নিয়ে Flash Back এ অতীতের দৃশ্য দেখার সঙ্গেই মেলে।[২৭] লোক বিশ্বাস মনের গভীরে দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে দর্শক-পাঠক-লেখক কারুরই এসব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না, গোটা গল্পটাই তরল শিশুপাঠ্য রূপকথা বলে মনে হত, নাটক হত না।

স্বর্গ থেকে স্বর্গীয় বিমানে ফেরার পথে মারীচের আশ্রমে নামা এবং ঠিক সেই সময়েই ভারতের সিংহ-শাবকের সঙ্গে খেলা, রাজার দেখা, ভারতের 'শকুন্ত' বা মাটির ময়ূরবর চাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সবই বেশ কিছু কল্পিত (পূর্ব নির্ধারিত-- টাইমিং সেট করা) অনিশ্চয়তার সমাহারমাত্র। ভারতের হাতের কবচ, যা মাটিতে পড়লে মা-বাবা কিংবা নিজে ছাড়া অন্য কেউ মাটি থেকে তুললে সাপ হয়ে দংশন করবে-- এই ব্যাপারটাও লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় কি?[২৮]

পাদটীকা

১. তু. 'ঈসীসিচুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।

ওদংসঅন্তি দঅমাণা পমদাও সিরীসসুসুমাইং।'

––অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, কালিদাস বিরচিত, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক রাঘবভট্টের 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকা এবং স্বরচিত 'সুষমা' ও 'অধ্যাপনা' ব্যাখ্যা সহ সম্পাদিত, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, (১৯৯৪) প্রস্তাবনাংশের চতুর্থ শ্লোক, দ্রষ্টব্য : পৃ. ২৪

২. তু. 'সুভগসলিলাবগাহাঃ পাটলসংর্গসুরভিবনবাতাঃ।
প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।।'
....তত্রৈত, শ্লোক ৩. পৃ. ২২

৩. তু. 'পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপ্নুহি।' তত্রৈব, প্রথম অঙ্ক, শ্লোক, ১২ গঘ, পৃ. ৪৭

৪. তু. 'মম উণ কামো দিবারি রত্তিম্মি। / নিগ্‌ঘিণ তবই বলীয়ং/
তুই বুত্তমনোরদাইং অঙ্গাইং।।' (প্রাগুক্ত), ৩/১৩ খগঘ. পৃ. ২১৬

৫. তু. 'পরিগ্রহবহুত্বে হপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।।'–– প্রাগুক্ত, ৩/১৭. পৃ. ২২৫

৬. দ্রঃ প্রাগুক্ত, ১/১৫, পৃ. ৫৭

৭. তু. কুতঃ (ফলম্ + ইহ + অস্য) কুতঃ ফলমিহাস্য। ইহ = এখানে

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

৯. প্রাগুক্ত, ৭। ১৩, পৃ. ৫২২

১০. প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৭১

১১. তত্রৈব, পৃ. ৭২

১২. 'লোক-কালচার'–– জোড়কলম শব্দ হিসেবে চলতে পারে। 'কালচার' শব্দতো আজকাল 'বাংলা'ই হয়ে গিয়েছে। তু. 'এদের কোন কালচার নেই' 'কালচার না থাকলে এই রকম ব্যবহার করবে' ইত্যাদি। হাজারে একজনও 'এদের কোন সংস্কৃতি নেই' এরকম বলেন না। 'লোক'-এর বাংলা 'ফোক' এখনও বাংলায় আসেনি। তাই 'লোকসংস্কৃতি (এই নিয়েও অনেক কথা হয়েছে .... যেমন 'লোকযান, ইত্যাদি) বোঝাতে 'লোক-কালচার' শিগ্‌গিরই চালু হয়ে যেতে পারে।

১৩. প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৬৯

১৪. প্রাগুক্ত, তৃতীয় অঙ্ক, পৃ. ২১৫

১৫. তত্রৈব, পৃ. ২১৫

১৬. তত্রৈব, ৩ । ২৫, পৃ. ২৪২

১৭. . প্রাগুক্ত, ৬ । ২৫, পৃ. ৪৭৯

১৮. তত্রৈব, অধ্যাপনা, পৃ. ৪৮১

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩-৪৯০

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০ অঅ (pp. 410 ff বোঝাতে ব্যবহৃত

২১. প্রাগুক্ত, সপ্তম অঙ্ক, পৃ. ৪৮৯ অ

২২. চতূর্থ অংঙ্কের বিষ্কম্ভক, পৃ. ২৫০

২৩. তু. 'অস্মিন্ বেতসপরিক্ষিপ্তে লতামন্ডপে সিন্নিহিতয়া তয়া ভবিতব্যম্।

তথাহি ....

'অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।

দ্বারে হস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতে হভিনবা।।'

––প্রাগুক্ত, ৩।৫, পৃ. ১৮৫ (অনুবাদ : বেতসল তায় তৈরি এই কুঞ্জের কাছেই সে থাকতে পারে। কেননা––

এই লতামন্ডপের প্রবেশ পথে সাদা বালুর উপর নতুন পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এই পায়ের ছাপগুলির সামনের দিকে হাল্কাভাবে ছাপ পড়েছে, কিন্তু নিতম্বের ভারে গোড়ালির দিকে গভীর ছাপ দেখা যাচ্ছে। (সুতরাং তা অবশ্যই শকুন্তলারই পদচিহ্ন হবে।)

২৪. পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলা-বর্ণিত দীর্ঘাপাঙ্গ নামক মৃগপোতকের (মৃগশাবকের) বৃত্তান্ত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

২৫. ষষ্ঠ অঙ্কে শ্যালের উক্তি : 'তস্স দংসণেন ভট্রিণো অভিমদো জানো সুমরাবিদো।' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

২৬. তত্রৈব, পৃ. ৪০২

২৭. এই কারণেই 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্', নামকরণের ব্যাখ্যান্তর প্রয়োজন, যাতে কিনা 'আভরণ' ব্যাপারটাকেও জড়িয়ে দেওয়া যায়। অভিজ্ঞানঞ্চ ইদম্ আভরণঞ্চ অভিজ্ঞানাভরণম্ (কর্মধারয়)। অভিজ্ঞানাভরণম্ এব স্মৃতং (স্মরণম্) অভিজ্ঞানস্মৃতম্ (উত্তরপদলোপী কর্মধারয়)। অভিজ্ঞানস্মৃতম্ অস্যা অস্তি অভিজ্ঞানস্মৃতা (অর্শআদিভ্যো অচ্, স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্)। অভিজ্ঞানস্মৃতা শকুন্তলা অভিজ্ঞান-শকুন্তলা উত্তরপদলোপী কর্মধারয়)। অত্যঃপ নাটকের সঙ্গে অভেদোপচারে ক্লীবলিঙ্গ এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' সূত্রে হ্রস্বত্বে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

২৮. তু, 'এদং কিল মাদাপিদরো অপ্পাণং চ বজ্জিঅ অবরো ভূমিপড়িদং ণ গেণহদি। .... তদো তং সপ্গো ভবিঅং দংসদি।" .... সপ্তম অঙ্ক, পৃ. ৫৪২